বাংলার পূর্বপাকিস্তানের প্রবন্ধসংগ্রহ

সূচীপত্র

সূচীপত্র

ভূমিকা

অবশেষে পূর্বপাকিস্তানের প্রবন্ধ সংগ্রহ প্রকাশ করা গেল।

১৯৪৪ সালে যখন কলকাতায় দাঙ্গা বাঁধে তখন এদিকের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ও গাল গল্প গুজবে পাকিস্তানের যে চিত্র ফুটে উঠছিল তা ভয়াবহ। যেন সমস্ত পূর্বপাকিস্তান একটি দানব অধ্যুষিত দেশ ও সেখানে ইতর ভদ্র সকল ব্যক্তি ছুরি হাতে 'কাফেরের' জীবন নাশের আগ্রহে ও নারী ধর্ষণের পৈশাচিক উল্লাসে প্রমত্ত— যেন সেখানে কোনো হিন্দুর প্রাণ নিরাপদ নয়। নিরাপদ নয় কোনো নারী—এবং ধর্মীয় গোঁড়ামীর শৃঙ্খলে ধর্মরাষ্ট্রের সকল নাগরিক আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা।

সেই সময়ে আমরা সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির যে প্রমত্ততা এই বাঙলা দেশের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে দেখেছিলাম তাতে স্তম্ভিত হয়েছিলাম। যে দেশে এত ঘটা করে রবীন্দ্রজয়ন্তী হয়, সেই দেশেও যদি সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প এমন ভাবে বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করতে পারে, তবে তার বিপদ কতখানি তা সহসা উপলব্ধি করলাম। সেই সময় থেকে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার জন্য 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পরিষদ' নামে একটি প্রতিষ্ঠানে আমরা সমচিন্তা সম্পন্ন কয়েকজন একত্র হয়েছি। নানাভাবে সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিকে পরিষ্কার করার কাজে নেমে সহসা পূর্ব-পাকিস্তানের পত্র পত্রিকা হাতে পেয়ে সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ১৯৫২ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারীর 'ভাষা আন্দোলনের' সংবাদ সামান্য সামান্য এদেশের পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও তার যথার্থ রূপটি এবং তার ভিতরের অর্থটি আমার কাছে এবং

আমার মত বহু ভারতীয় বাঙালীর কাছেই অজ্ঞাত ছিল। যদিও তখন 'পূর্বপাকিস্তানের সংবাদ পত্র কলকাতায় নিয়মিত আসত, তবু দুচার জন ছাড়া হিন্দু বাঙালীর কাছে এবং বেশীর ভাগ এদিকের মুসলমান বাঙালীর কাছেও তা অজ্ঞাত ছিল। এদেশের পত্র পত্রিকায় আজ ২১ শে ফেব্রুয়ারী সম্বন্ধে বড় বড় প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে কিন্তু পূর্ব বাঙ্গলার নবজাগরণের সমস্ত সংবাদ ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত একেবারেই অনুচ্চারিত ছিল। গোপন করা হয়েছিলই বলব, কারণ যাঁরা সংবাদ সরবরাহ ও সংগ্রহ করেন তাঁরা জানতেন না এ কথা বিশ্বাস হয় না পূর্ববঙ্গের অগ্রসর সমাজের চিন্তার বিবর্তন অবশ্যই ওয়াকিবহাল মহলে জানা ছিল কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক সেটা এদেশের জনসাধারণের কাছে প্রকাশ হয়নি। ফলে এদেশের অধিকাংশ লোকের মনে বিশবছর আগের পাকিস্তান আন্দোলনের চিত্রটিই স্থির ছিল এবং পাকিস্তান সরকার ও তার জনগণের মধ্যে যে পার্থক্য ক্রমেই প্রসারিত হয়ে দুই পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গী বিপরীতমুখী হচ্ছে সে সত্য একেবারেই আবৃত ছিল। কাশ্মীরে হজরতবালের মসজিদ থেকে হজরতের চুলটি খোয়া গিয়েছে এই গুজব ছড়ানো ও কোনো স্বার্থান্বেষী মুসলিম মন্ত্রী খুলনাতে মিল মজুরদের উস্কানী দেওয়ার ফলে সেখানে দাঙ্গা ঘটে ও দলে দলে ভীত আর্ত মানুষ ভারতে আসতে থাকে সেই সময়ে বদলা নেবার উৎসাহে ৮।৯।১০।১১ জানুয়ারীতে কলকাতায় আগুন জ্বলছিল তখন হঠাৎ পূর্বপাকিস্তানের সংবাদপত্রের ভূমিকা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কি উদার নির্ভীক কণ্ঠে সমস্ত বাঙালী মুসলমান শুভবুদ্ধির আহ্বান জানিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন ধিক্কার সরকারী নিস্ক্রিয়তাকে।

প্রাণ দিলেন অনেকে আক্রান্ত হিন্দু প্রতিবেশীকে রক্ষা করতে গিয়ে, গুণ্ডার হাতে।

সেই দাঙ্গার সময় পূর্বপাকিস্তানের বাঙালী সমাজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ

হল যে আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটতে পারবে না এবং তার সূত্রপাত হলে দাঙ্গাকারীদের সঙ্গে লড়তে হবে অর্থাৎ দাঙ্গাকারী মুসলমান-দের সঙ্গে বাঙালী মুসলমানের লড়াই হবে। এরই ফলে কলকাতার দাঙ্গার বদলা হিসাবে নারাণগঞ্জে আদমজীমিলে যে দাঙ্গা সুরু হয় তা দুদিনে বন্ধ হয়ে গেল ও রূঢ়কেল্লার ভীষণ দাঙ্গার কোনো বদলা পাকিস্তানে হতে পারল না। জনসাধারণের এই সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সংকল্পবদ্ধ অভিযান সম্ভব হয়েছে সেখান-কার লেখক সাহিত্যিক সংবাদ পত্র পত্রিকার দ্ব্যর্থহীন নিন্দাবাণী গুণ্ডাবাজ স্বধর্মীদের প্রতি ক্রমাগত ঘোষিত হয়েছে বলেই।

ধর্মরাষ্ট্রের মধ্যে কখন ধীরে ধীরে সেকুলার চরিত্র গড়ে উঠল এ দেশে বসে আমরা তার কিছুই সংবাদ রাখিনি—লজ্জার ও বেদনার সঙ্গে এই সত্যের মুখোমুখী হবার পরই 'নবজাতক' পত্রিকা প্রকাশ করে আজ ছয় বছর হল ক্রমাগত পূর্বপাকিস্তানের লেখকদের রচনা প্রকাশ করে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছি। এ সমস্ত ক্ষুদ্র ম্যাগাজিনের বহুল প্রচার নানা কারণে হয় না তাই 'নবজাতক' অনেক লোকের কাছে না পৌঁছলেও আমাদের কাজ সফল হয়েছে। রেডিয়োতে 'নবজাতক' থেকে বহুবার পড়া হয়েছে বহু লিট্‌ল ম্যাগাজিনে এ বিষয়ে লেখা হচ্ছে—এবং যে সব বৃহৎ পত্র পত্রিকা ১৯৫২ শাল থেকে ১৯৬৪ শাল পর্যন্ত পূর্বপাকিস্তানের ২১শে ফেব্রুয়ারীর ভাষা আন্দোলন সম্বন্ধে কোনো খবরই দেয় নাই তারাও সে বিষয়ে বড় বড় প্রবন্ধ প্রকাশ করছে। যে কারণেই হোক এই যে চিন্তাধারার গতি পরিবর্তন তা উভয় দেশের পক্ষেই কিছুটা মঙ্গল জনক হবে বলে মনে করি।

দুঃখের কথা এই যে দুই দেশের মধ্যে পত্র পত্রিকার আদান প্রদান এখন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। পাকিস্তান সরকারের উদ্যত ভ্রূকুটি সর্বদা সজাগ পাছে সৌহার্দ্যের সূত্রটি দুই দেশের মানুষকে রাখী বন্ধনে বাঁধে।

ভূমিকা

যখন দ্বিজাতি তত্ত্বকে কায়েম করার চেষ্টা হয় তখন ধর্মীয় পার্থক্য যে যথেষ্ট হবে না তা তখনকার পাকিস্তান আন্দোলনকারী রাজনীতিবিদরা বুঝেছিলেন এবং কৃত্রিম উপায়ে মুসলমানী বাংলা সৃষ্টির একটা চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু দেখা যাচ্ছে পাকিস্তান হবার পর সে চেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল হয়েছে। সত্য স্বপ্রকাশ। পদ্মার পারে ভিন্ন-ধর্মাবলম্বী হলেও বাঙালী যে একই জাতি সে সত্য ধীরে ধীরে রাজনীতির চক্রান্ত জাল ভেদ করে প্রকাশ হয়েছে।

বর্তমান প্রবন্ধ সংকলনে আমরা যে সব লেখা সংগ্রহ করেছি তাতে এই কথা স্পষ্ট হয়েছে যে বঙ্গসংস্কৃতির একটি অন্তর্নিহিত ঐক্য আজ পূর্বপাকিস্তানের বাঙালী খুব দৃঢ় ভাবে অনুভব করছেন, অনুভব করছেন যে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই এই একই মাটির সন্তান। মুসলমানরা ধর্মের কারণে আরব ঐতিহ্যর কিছুটা উত্তরাধিকারী হলেও তাঁরা সে দেশের মানুষ নন। তাদের পূর্বপুরুষ ও হিন্দুদের পূর্বপুরুষ একই। এবং হিন্দু ঐতিহ্যের মধ্যে যা কিছু গ্রহণ যোগ্য তা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হতে রাজি নন। বাঙ্গালীর সব চেয়ে গৌরবের বস্তু তার ভাষা ও সাহিত্য, সেই গৌরবের অংশীদার তাঁরাও।

পূর্বপাকিস্তানের নব রাজনৈতিক চেতনা ভাষা ও সাহিত্যকে অবলম্বন করেই স্ফূর্ত হয়েছে। তাই সাহিত্য তাঁদের অবসর বিনোদনের বস্তু নয় বা সাহিত্যিকের আর্থিক উন্নতির উপায় মাত্র নয়। সাহিত্যর দ্বারাই তাঁরা যুগবাণীকে জীবনে উপলব্ধি করছেন। একটি ধর্মরাষ্ট্র আপন অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশে সেকুলার দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করছে সাহিত্য ও সংস্কৃতির সহায়তায়, এ একটি আশ্চর্য দৃষ্টান্ত, অভূতপূর্ব না হলেও।

বর্তমান সংকলনে আমরা যথেষ্ট বাছাই করবার সুযোগ পাইনি হাতের কাছে যা এসে পড়েছে তার থেকেই নির্বাচন করতে হয়েছে—কিন্তু প্রত্যেকটি প্রবন্ধেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অসাম্প্রদায়িক

যুক্তিবহ মুক্ত চিন্তার প্রকাশ। আরো অনেকগুলি প্রবন্ধ সংগ্রহ করবার লোভ ছিল কিন্তু সে সব গুলিই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে! একটি সংকলনে তবুও আমরা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনটি প্রবন্ধ চয়ন করতে বাধ্য হয়েছি। এর বেশি আর চলে না বলেই করা গেল না, না হলে রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করে আরো অনেক গভীর জীবন-স্পর্শিত চিন্তা এখানে দেওয়া যেত। তবু একটি সংকলনে তিনটি প্রবন্ধ রবীন্দ্র বিষয়ে কেন দেওয়া হল তার কৈফিয়ৎ প্রয়োজন।

ভারত পাকিস্তানের সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা সাম্প্রদায়িক সমস্যা, এর বিষক্রিয়া সমাজের সর্বস্তরে নানা ভাবে ছড়িয়ে আছে এবং যতদিন না সম্পূর্ণভাবে এই গ্লানি মোচন হয় ততদিন জাতীয় উন্নতি ক্রমাগতই বাধাগ্রস্ত হবে। রাজনৈতিক কূটকৌশলের জন্য সাম্প্রদায়িকতাকে উভয় দেশেই হাতিয়ার করা হয়ে থাকে বটে' কিন্তু সে রাজনীতি মুষ্টিমেয় লোকের আপাত সুবিধা ঘটালেও দেশের সর্বনাশ ডেকে আনে। ভারতে আমরা এ বিষয়ে তত সচেতন নই, কারণ আমরা আত্মসন্তুষ্টি রোগে ভুগছি। আমরা ধরে নিয়েছি যেহেতু আমাদের রাষ্ট্রকে সেক্যুলার বলে ঘোষণা করা হয়েছে, যেহেতু সংবিধানে সকলের সমান অধিকার স্বীকার করা হয়েছে, যেহেতু আমাদের দু'চারজন সংখ্যালঘু মন্ত্রী আছে, (যা পাকিস্তানে নেই) সেহেতু আমরা অবশ্যই অসাম্প্রদায়িক। এদেশে সংখ্যাগুরুদের বেশির ভাগেরই অনুচ্চারিত ধারণা যে এদেশে সাম্প্রদায়িকতার কথা উল্লেখ করাই অন্যায়—তার প্রথম কারণ এদেশে সংখ্যালঘুরা সমান অধিকার পাচ্ছে, সাদা বাংলায় 'রাজার হালে আছে।' দ্বিতীয় কারণ এ দেশে দাঙ্গা বাধায় সংখ্যালঘুরা কারণ তাদের মন পাকিস্তানে পড়ে আছে। তৃতীয় কারণ এ দেশে সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে আলোচনা ও নিন্দা করলে পাকিস্তান সরকারকে সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু এর উত্তরগুলি কখনো মনে পড়ে না যে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণা করা সত্ত্বেও এ দেশে

ধর্মান্ধতা এক বিন্দু কমে নি। কি হিন্দু, কি মুসলমান ভারতে এখনও যুক্তি দিয়ে ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থাকে বিচার ও পরিবর্তন করতে রাজী নয়। সরকারী প্রতিষ্ঠান গুলোতেও ধর্মানুষ্ঠান চলে অবাধে। দিন দিন ধর্মহীন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের হুল্লোড় বেড়েই চলেছে। গরুর চামড়ার জুতো পরতে আপত্তি নেই গোহত্যার ছুতো করে নরহত্যার প্রবণতা বেড়েই চলেছে।

সংখ্যালঘুরা রাজার হালে আছে কিনা সেটা যে সংখ্যালঘুর কাছেই জানতে হবে একথা কারু সহজে মনে পড়ে না। এদেশে যথেষ্ট স্বীকৃতি পেলে স্বাভাবিক ভাবেই অন্য দেশে মন পড়ে থাকবার যে কথা নয় সে কথাও কেউ স্বীকার করে না। তৃতীয়ত পাকিস্তান সরকারকে সুযোগ না দিতে হলে এদেশে সম্প্রীতির কাজকে বাড়িয়ে তোলাই একমাত্র উপায়। সত্য গোপন করে নয়।

অপর দিকে এদেশের মুসলমানও সংখ্যালঘুত্ব বশতই সদা শঙ্কিত, পাছে তাদের নিজত্ব খোয়া যায়—তাই কোনো আধুনিক মত বা কালোপযোগী সমাজ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তারা পরাঙ্মুখ। এখনও পর্দা প্রথা দূর করা বা বহু বিবাহ নিষিদ্ধ করার চিন্তাও মনে স্থান দিতে পারে না। বর্তমান যুগের চিন্তাধারাকে অগ্রাহ্য করে তারা স্বাধীনতা পূর্বের যুগেই অনেকাংশে বাস করছে। এমত অবস্থায় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটা বিরুদ্ধ ভাব এখনও প্রায় তেমনি আছে, স্বাধীনতার পূর্বে যেমন ছিল।

কিন্তু পাকিস্তানে শিক্ষার ও বিবিধ কর্মের সুযোগ পেয়ে বাঙালী মুসলমানের মধ্যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী নূতন করে সৃষ্টি হল—। একদা ইংরেজি শিক্ষার ফলে হিন্দু বাঙালীর জীবনে যে মুক্ত চিন্তার প্রবাহ প্রথা সংস্কারের অচলায়তন ভাঙ্গতে ও সমাজের আমূল পরিবর্তন করতে তাকে উদ্যোগী করেছিল, ঠিক তেমনি প্রবাহ এল পাকিস্তানের শিক্ষিত জনগণের মধ্যে। হিন্দুর দ্বারা প্রভাবিত হবার ভয়টা দূর হবার সঙ্গে সঙ্গেই যথার্থ ভাবে বঙ্গ

সংস্কৃতির যুগ্ম সাধনার ফল তাঁরাও পেলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাঙালীর জীবনে রামমোহনের যে স্থান, ধর্মরাষ্ট্র পাকিস্তানে মোল্লাতন্ত্রের বদলে রবীন্দ্রনাথ সেই স্থান নিলেন। অদৃষ্টের এই পরিহাস।

পাকিস্তানের মুসলমান রবীন্দ্রনাথের কাব্যে গানে চিন্তায় সম্প্রদায়ের বেষ্টন থেকে, মোল্লা শাসনের বন্ধন থেকে, মুক্তির পথ দেখতে পেলেন। ধর্মরাষ্ট্রের গোঁড়ামী তাঁদের কাছে অর্থহীন হয়ে গেল।

মুক্তির জোয়ার এল রবীন্দ্রনাথের পদচিহ্ন ধরে। মেয়েরা পঁচিশে বৈশাখে শান্তিনিকেতনের অনুসরণে মঞ্চে গান গাইতে লাগল—নৃত্য করতে লাগল আনন্দে—এ সব ইসলামীয় নির্দেশের বিপরীত হলেও বাঁধভাঙ্গা এ মুক্তির জোয়ার তেমন করেই ভাসিয়ে নিয়ে গেল যেমন করে একদা অবিভক্ত ভারতে রামমোহনের ও ইংরাজি শিক্ষার অভিঘাতে নূতন জীবন রূপ জেগে উঠেছিল, ভেসে গিয়েছিল মনুশাসিত হিন্দুর বিধি নিষেধে ঘেরা জীবন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তেমনি মানুষ, যিনি ঈশ্বর ও নাস্তিকতার সমন্বয় করতে পারেন। যিনি যুক্তি ও আবেগকে একই নৃত্যচ্ছন্দে রূপ দেন। যিনি অতীতের রূপরেখাকে নূতন অর্থে পূর্ণ করতে পারেন। তাঁর সঙ্গীতে প্রকৃতি ঈশ্বর একাকার হয়ে যায়। আকাশ ভরা সূর্য তারার মধ্যে তাঁর আপন অস্তিত্ব যে সঙ্গীতের মাধুর্যে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল তা জীবনে সঞ্চারিত হলে ঈশ্বরকে মন্দিরে মস্জিদে খুঁজতে যাবার দরকার থাকে না। ঈশ্বরের অস্তিত্বহীন ঈশ্বরোপম উপলব্ধির এক সৌন্দর্যোল্লাস মানুষের মনে সত্য হয়ে ওঠে। জানা জগতের সঙ্গে অজানার এই মেশামেশির ভিতর দিয়ে তাঁর কাব্যও সঙ্গীত আমাদের এমন কিছু দেয় যা কোনো ধর্মানুষ্ঠান দিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত আশ্চর্য ভাবে অতীতকে ধ্বংস না করে তাকে রক্ষা করেও তার মূল্য পরিবর্তন করতে পারেন। মনে আছে শান্তিনিকেতনে নানা উৎসবের আয়োজনের সময় আলপনা, বরণ

ডালা ইত্যাদিতে শস্য ফুল ফলের সজ্জা দেখে পৌত্তলিকতা বিরোধী অনেকে ভ্রূকুটি করেছিলেন কিন্তু সেই বরণ ডালা শাস্ত্রীয় নির্দেশ বহন করত না। কি উপাচার বিধিসম্মত বা সম্মত নয় সে দিকটা সম্পূর্ণ তুচ্ছ করে কেমনটি হলে সুন্দর হয় তাই দিয়ে সাজাতেন। পুরাতন অলঙ্করণ থাকলেও তার অর্থ যেত বদলে—অনুষ্ঠান থেকে সংস্কারের মূল্য হরণ করে তাকে সৌন্দর্যের মূল্যে মূল্যবান করতেন। প্রাচীনকে ধ্বংস না করে তার মূল্য পরিবর্তন, তার শক্তির পরিবর্তন রবীন্দ্রনাথের এক আশ্চর্য কীর্তি। জাতীয় উৎসবগুলি থেকে তিনি পুরাতন জীর্ণ মূল্যবোধকে হরণ করে আজ নূতন রূপ দিয়েছেন। শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসবে দোল খেলা তাই ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, সেক্যুলার উৎসব, যাতে সব ধর্মাবলম্বীর যোগ দিতে বাধা নেই। বৃক্ষরোপণও তেমনি একটা উৎসব সেখানে পঞ্চভূত সেজে বালক বালিকারা সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করে বৃক্ষ রোপণ করলেও—তার আনুষ্ঠানিক সৌন্দর্যরূপ একটা উৎসবের অঙ্গ মাত্র তা যথার্থ সনাতন পূজা পদ্ধতির অনুসরণ নয়, তা কাজ ও খেলা। তাতে কোনো সংস্কারের বন্ধন নেই অথচ সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য আছে। মূর্তিপূজার অবসান ঘটাতে কালাপাহাড়কে মূর্তি ভাঙতে হয়েছিল কারণ দেবমূর্তির অঙ্গ সৌষ্ঠব নষ্ট না করেও যে তার দেবত্ব হরণ করা যায় তা তিনি জানতেন না।

প্রথাবদ্ধ অনুশাসনের দাসত্ব মোচন বর্তমান যুগের মানুষের কাছে একান্ত কাম্য—এই মুক্তির সূত্র ধরেই অন্য মুক্তির সাধনা সম্ভব। মানুষ যেখানে নিজেই বদ্ধ সেখানে শাসন ক্ষমতা হাতে পেলেই সে স্বাধীন হবে না—তার বন্ধন শৃঙ্খল তার আপন মনের কারখানাতে তৈরী হতেই থাকবে। রবীন্দ্রনাথ কোনো ধ্বংসের উপক্রমণিকা সম্পূর্ণ বাদ দিয়েই নূতন সৃষ্টির মুক্তির আস্বাদ এনে দিলেন। তিনি হিন্দু হয়েও হিন্দু নন, ব্রাহ্ম হয়েও ব্রাহ্ম নন, যে ধর্ম বিশ্বাসের, ঈশ্বর অস্তিত্বের, চিন্তার আবেষ্টনে তিনি জন্মেছিলেন,

ক্রমে ক্রমে তার থেকে মুক্ত হয়ে তিনি মানব ধর্মের ইহলোকমুখী ভাবনায় ভাবিত হলেন। মানুষ ও প্রকৃতি তার বিচিত্র রূপ সম্ভার নিয়ে তাঁকে অতীন্দ্রিয়ের ইঙ্গিত দিয়েছে, তিনি সুরে সুরে আমাদের জিজ্ঞাসু হৃদয়ে নিরুত্তর বাণীতে সেই অতীন্দ্রিয়ের স্পর্শকে বাস্তব করে তুলতে পেরেছেন, ধর্মহীন ঈশ্বরহীন সেই ধর্ম ভাবনা আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ে গ্রথিত এই চেতনাকে ইন্দ্রিয়াতীত ভাবনায় ঊর্দ্ধ থেকে ঊর্দ্ধে অলোকধামের আভাসে ভাসিত করতে পেরেছে। এই লৌকিক বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতার সঙ্গে কোনো বিরোধ না বাধিয়ে—ধর্মমতের গণ্ডি ভেঙ্গে বন্ধনহীন মুক্ত জীবনস্বাদে পূর্ণ করেছে।

আজ পাকিস্তানে 'যখন প্রাচীন বরেন্দ্রীর মা ও শিশুমূর্তি' নিয়ে প্রবন্ধ লেখা হয়—যখন মন্দির নিয়ে আলোচনা হয়—(যা ভারতে চিন্তা করাও অসম্ভব—কারণ সকলেই জানেন মূর্তি সম্বন্ধে বড়ই স্পর্শ-কাতর মুসলমান সমাজ) তখন দেখতে পাই সংস্কার মুক্ত মনের প্রকাশ নানা দিকেই হচ্ছে। এই সংস্কার মুক্তির পক্ষে রবীন্দ্রনাথ একটি বড় আশ্রয়। পাকিস্তানের রাজনৈতিক জবরদস্তির দ্বারা নির্যাতিত মানুষ রবীন্দ্র সঙ্গীতে রবীন্দ্রকাব্যে যে মুক্তির আস্বাদ পাচ্ছে সেই আস্বাদই যে তাকে সর্বাঙ্গীন মুক্তির জন্য ব্যকুল করে তুলছে ও তুলবে এ বিষয়ে সেখানকার সরকারেরও কোনো সন্দেহ নেই। এই বিষম দূরদর্শীতা তাঁদের থাকায় তাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীত বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা বার বার করেছেন। কারণ রবীন্দ্র সঙ্গীতে শৃঙ্খল মোচনের যে আহ্বান মানুষকে উদ্বেলিত করে তোলে। যুক্তি ও আবেগের সুন্দর সংযোগে যে সুস্থ জীবনবোধ তাকে শক্তি দেয়, তার চেতনাকে বুদ্ধিকে শাণিত, তার প্রেমকে উন্মুখ করে তোলে সেই সামগ্রিক মানব সত্ত্বার উদ্বোধিত রূপের সামনে রাজনৈতিক ভাঁওতা চলেনা। ধর্মের উস্কানী জীর্ণ মৃত হয়ে উড়ে যায়।

আজ রবীন্দ্রনাথ পূর্বপাকিস্তানের বিপ্লবী সত্ত্বার সঙ্গে প্রাণের জীবন্ত বন্ধনে যুক্ত, তাঁরই চিন্তার আশ্রয়ে ধর্মরাষ্ট্রের সমস্ত ভ্রূকুটি

তুচ্ছ করে সেকুল্যার জাতি তৈরী হয়ে উঠছে। শতবর্ষ পরে তাঁর কবিতা শুধু অবসর বিনোদন বা কেবল কাব্যালোচনা না হয়ে জীবন-চর্যায় সার্থক হচ্ছে।

এদিকে ভারতে যুব মানস রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া কবি বলে ত্যাগ করেছে তাঁর রচনায় বিপ্লবের দামামা বাজেনি। অবশ্য যদিও তাঁরা প্রচুর প্রগতি ও বিপ্লবের বাণী ও বিদেশের আমদানী রাজনীতির বুলি বলছেন তা সত্বেও ধর্মমূঢ়তা নূতন করে বেড়ে উঠছে—নূতন করে মানুষ রাজনৈতিক মতের খোঁদলকাটা পথে বাঁধা পড়ে যাচ্ছে, ঠিক যেমন একদা পড়েছিল ধর্মীয় অনুশাসনের বন্ধনে। রবীন্দ্র বিষয়ে উৎসব অনেক হচ্ছে, চর্চাও যে কিছু কিছু হচ্ছে না তা নয়—কিন্তু সে সবই ফাঁকি যতক্ষণ না জীবনে তার উজ্জীবন হয়। প্রত্যেক ভাবই অতনু—সে 'বীরের তনুতে তনু' লাভ করলে তবেই জীবন্ত হয়। আশা হচ্ছে পূর্বপাকিস্তানের নবীন জীবনবোধে রবীন্দ্র-বোধনার সংযোগ তাঁর অমরত্বের আর একটি নিসংশয় প্রমাণ রাখবে।

বর্তমান সংকলনে আমরা নানা বিষয়ে প্রবন্ধ সংগ্রহের চেষ্টা করেছি কিন্তু কেবল মাত্র রাজনীতি বিষয়ে কোনো প্রবন্ধ পাইনি যদিও সব প্রবন্ধেই রাজনীতির সংস্পর্শ আছে। মনে হয় ওদেশের লেখকরা বিশুদ্ধ তার্কিক বুলিকপচানোতে আগ্রহী নন। অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে তত্ত্বকে দেখতে চান। কিংবা আমাদের হাতে তেমনতর প্রবন্ধ এসে পৌঁছয়নি।

এই প্রবন্ধ সংকলনে সর্বাংশে সহায়তা করেছেন শ্রীমতী গৌরী আয়ুব ও পূর্বপাকিস্তানের দু'জন অধ্যাপক ও সাহিত্য রসিক, পাছে তাঁরা বিপন্ন হন সেজন্য তাঁদের নাম উল্লেখ করতে সাহসী হলাম না। কারণ সদ্‌বুদ্ধি সদ্‌বিচার ও মানুষে মানুষে সদ্‌ভাব প্রচারের চেষ্টাও রাজনীতির বিকারগ্রস্থর কাছে দুষ্য মনে হতে পারে।

মৈত্রেয়ী দেবী—

ভূমিকা

বাংলাদেশের মুসলিম সুলতান ও নবাবরা পাঁচশোবছর সময় হাতে পেয়েও বাংলার মুসলমানদের জন্যে উর্দু প্রবর্তন করেননি। অথবা সৃষ্টি করেননি নতুন একটি ভাষা যার লিপি আরবী, বিশেষ্য বিশেষণ আরবী ফারসী তুর্কি, ক্রিয়াপদ বাংলা।

সুলতানী ও নবাবী আমলে যা হলো না, ইংরেজ আমলের দু'শো বছরেও যার জন্যে মানুষের মন তৈরি হলো না, হঠাৎ পাকিস্তান হাসিল হওয়ার পর তারই তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। তোমার ধর্ম যখন ইসলাম তখন তোমার ভাষাও হবে আরবী ফারসীর মতো উর্দু, নয়তো উর্দুর ছাঁচে ঢালাই বাংলা, যার কোনো ইতিহাস বা ভূগোল নেই। ইসলাম যেমন ইতিহাস ভূগোলের ঊর্ধ্বে, মুসলমানও তেমনি ইতিহাস ভূগোল নিরপেক্ষ। তার সংস্কৃতি? সেটা তো মরক্কো ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত এক ছাঁচে ঢালা। স্বকীয়তার দাবী ওঠে কেন? পূর্ব পাকিস্তান যখন মুসলমানদের দেশ তখন তার সংস্কৃতিও সার্বভৌম ইসলামী সংস্কৃতি।

কৌতুকের কথা হচ্ছে এসব যুক্তি মধ্যযুগে বা আধুনিক যুগের গোড়ার দিকে শোনা যায়নি। শোনা যাচ্ছে স্বাধীনতা উত্তর যুগে। যে যুগে তুরস্ক ইরান প্রভৃতি বিশুদ্ধ মুসলিম দেশগুলিও সার্বভৌম ইসলামী সংস্কৃতির আওতার বাইরে গিয়ে যে-যার জাতীয় সংস্কৃতির প্রাক-ইসলামী উৎসের সংযোগ সাধন করতে যত্নবান। চার হাজার বছরের পুরোনো সভ্যতা ইরানের। কেন যে সে ইসলামের খাতিরে কেবল সপ্তম শতাব্দীর পর থেকে তার সংস্কৃতির রেখা টানবে, তার পূর্ববর্তী আড়াই হাজার বছরকে বাতিল করবে এর কোনো ন্যায়

সঙ্গত কারণ নেই। তেমনি পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতা মিশরের। সেই বা তার সংস্কৃতির সাড়ে তিন হাজার বছরকে বিসর্জন দিয়ে তেরশো বছরকেই সম্বল করবে কেন? সীরিয়া সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে।

পাকিস্তানের মুসলমানদের মধ্যে এই নিয়ে এখন দু'মত। ইসলামের আগমনের পূর্বে থেকে যা আছে তাকে যাঁরা আমল দিতে চান না তাঁরা একদিকে। তেমনি অন্য দিকে যাঁরা সমগ্র ইতিহাসকে তথা ভূগোলকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে ইসলামের পুনর্মূল্যায়ন করতে চান। ইউরোপেও এর নজির মেলে। পাঁচশো বছর আগে প্রাক্-খ্রীস্টান সম্বন্ধেও অনুরূপ দ্বিমত দেখা দেয়। একদল খ্রীস্টের পূর্ববর্তী গ্রীক ও রোমক উত্তরাধিকারকে আপনার বলে স্বীকার করবেন না। আরেকদল তাকেও আপনার বলে মহামূল্য মনে করবেন। খ্রীস্টীয় ঐতিহ্যকে পূর্ববর্তী ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে তার পুনর্মূল্যায়ন করবেন। এতদিনে এই দ্বিতীয় দলটিই জিতেছেন। কিন্তু একদিনে জেতেননি। খ্রীস্টশিষ্যরা বাধা দিয়েছেন।

পাকিস্তানের যাঁরা প্রবর্তক তাঁরা প্রাক্ ঐসলামিক সংস্কৃতিকে বিধর্মীর সংস্কৃতি বলে বিজাতীয় জ্ঞান করেছিলেন। তাঁদের কাছে আরবজাতির প্রাক্ ঐসলামিক হাতেমতাই বরঞ্চ স্বজাতীয়। সেই ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ বিভাগপূর্ব বঙ্গীয় সংস্কৃতিকেও হিন্দু সংস্কৃতি বলে অনাত্মীয় মনে করেছিল। গালিব, হালী, ইকবালের মতো কবিরাই ছিলেন আপনার। মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পর।

ধর্মভিত্তিক সংস্কৃতির মোহ যদিও কারো কারো মন জুড়ে রয়েছে তবু তার সেই একছত্র দাপট আর নেই। দেশভিত্তিক ভাষাভিত্তিক লোকভিত্তিক সংস্কৃতির দিকেও সাধারণের দৃষ্টি পড়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের সব চেয়ে জনপ্রিয় পালার নাম 'রূপটান'। রেকর্ডে ও ফিল্মে ওর সমকক্ষ নেই। অথচ ওর কথাবস্তু আরব পারস্য

থেকে আসেনি, আসেনি উর্দু থেকে। ওটা মুঘল দরবারেরও কিস্‌সা নয়। আমাদেরই চিরপরিচিত 'মালঞ্চ মালা'। শুনলুম 'ঠাকুমা'র ঝুলি'র সব ক'টা কাহিনীই রূপান্তরিত হয়ে গেছে। রেডিও পাকিস্তানেও আমরা এন্তার লোকগীতি শুনতে পাই। সবই পূব বাংলার মাটির ফসল।

পূর্ব পাকিস্তানে এই যে ব্যাপারটা চলেছে এটাও একপ্রকার রেনেসাঁস। এর থেকেই আসবে একপ্রকার রেফরমেশন। ইসলামের তথা ইসলামী শাস্ত্রাদির পুনর্মূল্যায়ন। ওই স্টেজটা এখনো আসেনি, তবে ওর ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে কোরান শরিফের তর্জমা দিয়ে। যেমন জার্মানীতে হয়েছিল বাইবেলের অনুবাদ দিয়ে। পবিত্র ভাষা আরবী সম্বন্ধে মোহভঙ্গ হয়েছে। বাংলার উপর টান এখন তার চেয়েও বেশী। লোকে বাংলার জন্যে জান দিতে পেরেছে ও পারে। আরবীর জন্যে একটি মানুষও মৃত্যুবরণ করবে না।

ওদিকে বিজ্ঞানের প্রেষ্টিজ বেড়ে যাওয়ায় ইংরেজীর প্রেষ্টিজও কমতে চায় না। বাংলা ও ইংরেজী এই দুই ভাষার চাপে আরবী ফারসী আর উর্দু গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। সেইজন্যে ওখানকার শিক্ষিতদের এখন এখানকার শিক্ষিতদের মতোই চেহারা। মনের ভিতরটা একই রকম। সেখানে যে বাস করছে সে ধর্মনির্বিশেষে বাঙালী। ইংরেজীশিক্ষিত বাঙালী।

কিন্তু পাকিস্তান কি একটি মুসলিম দেশ? পূর্ব পাকিস্তান বলে যার পরিচয় দেওয়া হচ্ছে তার পূর্ব পরিচয় ছিল পূর্ব বাংলা। অখণ্ড বাংলাদেশের সেটি একটি অংশ। একটি একক নয়। অখণ্ড বাংলাদেশের লোকগণনায় মুসলমানের সংখ্যা একশো বছর আগেও হিন্দুর চেয়ে কম ছিল। আরো আগে আরো কম ছিল। নবাবী আমলে অখণ্ড বাংলা ছিল হিন্দুপ্রধান। সুলতানী আমলে হিন্দু দিয়ে ভরা। লোকগণনায় এক সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা শতকরা পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেলেই সেটা তাদের একার দেশ হয়ে যায় না।

ভূমিকা

এই সঙ্কলনের প্রবন্ধগুলি যাঁদের রচনা তাঁরা কারো চেয়ে কম মুসলমান নন, কম পাকিস্তানী নন। অথচ শাশ্বত বঙ্গের মিশ্র সংস্কৃতির ধারাবাহী। যেমন এপারের কাজী আবদুল ওদুদ বা কাজী নজরুল ইসলাম তেমনি ওপারের মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বা কাজী মোতাহার হোসেন। ন্যাশনালিটির নিরিখে ওদুদ একজন ভারতীয়, মোতাহার হোসেন একজন পাকিস্তানী। কিন্তু বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে উভয়েরই স্থান পাশাপাশি। দু'জনেই 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের নেতা। সেইসূত্রে এই সঙ্কলনের প্রবন্ধকারদের পূর্বসূরী। শহীদুল্লাহ বাদে।

বুদ্ধির মুক্তি এতদিনে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। এটা সুলক্ষণ। কিন্তু পশ্চাৎমুখী চিন্তার এখনো অবসান হয়নি। সে চিন্তা এখনো মধ্যযুগের ইসলামী ইতিহাসের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের মূল অন্বেষণ করেছে। পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবী মহল এখনো দ্বিধাবিভক্ত। আমরা এ গ্রন্থে একভাগের বক্তব্যই শুনতে পাচ্ছি। অবিমিশ্র ইসলামী গোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর অনুপস্থিত বলে কিছু কম সত্য নয়। পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্কট এখনো কাটেনি। দাঙ্গা বাধানো হচ্ছে না বলে কেউ যেন সিদ্ধান্ত না করেন যে রাষ্ট্র কিংবা দেশ কিংবা জনগণ সেকুলার হয়ে গেছে। বদরুদ্দীন উমরের বই ইতিমধ্যেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বাংলাদেশকে ও তার সংস্কৃতিকে যাঁরা চেনেন ও ভালোবাসেন তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন ও মানেন যে পদ্মার তীরের জেলাগুলিই বাংলার হার্টল্যাণ্ড বা হৃদ্‌ভূমি। একটি কি দুটি বাদে সব ক'টিই পড়ে গেছে সীমান্তের ওপারে। হৃদ্‌ভূমির হৃৎ স্পন্দন আজকাল শুনতে পাওয়া যায় না। পথঘাট বন্ধ, যোগাযোগ ছিন্ন। সেইজন্যে ওপার বাংলার চিন্তাশীল লেখকদের রচনা এপার বাংলায় পুনঃপ্রকাশ করা একটি অত্যাবশ্যক সৎকাজ। এর জন্যে মৈত্রেয়ী দেবীকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতে হয়।

অন্নদাশঙ্কর রায়—

আমাদের বাংলা উচ্চারণ

মুহম্মদ আবদুল হাই

একটি দেশের সমগ্র অঞ্চল জুড়ে নিতান্ত স্বাভাবিক কারণেই সে-দেশের ভাষার এক রকম উচ্চারণ হয় না। এক একটি অঞ্চল বিশেষের উচ্চারণ এক এক রকম। অঞ্চল বিশেষের উচ্চারণ উপভাষাগত বা dialectal উচ্চারণ নামে পরিচিত।

এক উপভাষাভাষী অঞ্চলের লোক পরস্পরের মধ্যে কিংবা তাদের পার্শ্ববর্তী উপভাষা অঞ্চলের লোকদের সংগে হয়তো নিজেদের উপভাষায় কথাবার্তা বলতে পারে, কিন্তু একটি প্রান্তবর্তী উপভাষা অঞ্চলের অধিবাসীরা সুদূরস্থ কিংবা অন্য প্রান্তে অবস্থিত অঞ্চলের অধিবাসীদের সংগে নিজেদের উপভাষায় হয় কথাবার্তা বলতে পারে না নয়তো কথা বলতে গিয়ে অসুবিধে বোধ করে। এজন্য একটি দেশের কোনো এক বিশেষ অঞ্চলের উপভাষা রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সংস্কৃতিগত কারণে প্রাধান্য লাভ করে এবং সমগ্র দেশের মধ্যে ভাব আদান প্রদানের বাহন রূপে চালু হয়ে যায়। এমনি ভাবে গত দুশো বছরে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ ও শান্তিপুর অঞ্চলের উপভাষাই সমগ্র বাংলা দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির একটি সর্বজন বোধগম্য বাহন হিসেবে গড়ে ওঠে এবং সকলের কাছেই তা মোটামুটি সাধারণ ভাষারূপে গৃহীত হয়। এর উচ্চারণকে standard বা আদর্শ না-বললেও শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের কাছেই তা আদর্শ উচ্চারণ রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। তার কারণ এর উচ্চারণ সুস্পষ্ট; ধ্বনির পরিবর্তনশীলতা এর অগ্রগতির পরিচায়ক এবং ব্যঞ্জনা আজও পর্যন্ত মধুর শ্রুতি-ব্যঞ্জক।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আমাদের সংস্কৃতির কেন্দ্র কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়েছে; কিন্তু যে পরিবেশে কলকাতা

ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উপভাষা আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিকশিত হয়েছিল, আজ আর তা নেই। কলকাতা কেন্দ্রিক উপভাষা যে-সময় আদর্শ ভাষা হিসেবে গড়ে উঠেছিল সে-সময় অন্য কোনো আদর্শ ভাষা দেশে ছিল না। তা ছাড়া এ ভাষা সমগ্র দেশে একদিনে প্রতিষ্ঠা পায় নি—পেয়েছে এবং পেয়ে আসছে বিগত দুশো বছর ধরেই।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আমাদের কলকাতা-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভংগি ঢাকা-মুখো হয়েছে। এতে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন স্বতন্ত্র ভাবে বিকশিত হবার সুযোগ পাবে তা সত্য, কিন্তু ঢাকা বা ঢাকার পার্শ্ব-বর্তী অঞ্চলের উপভাষা কি আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহন হিসেবে একটি আদর্শ ভাষায় রূপ নেবে? আমাদের শিক্ষিত লোকেরা যদি প্রচলিত ও গৃহীত ভাষার উত্তরাধিকারী না-হতেন, স্কুল কলেজে কি কোর্ট কাছারিতে যদি সে ভাষার প্রচলন না-থাকতো এবং আমাদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনের যদি এখানেই সূচনা হতো, তা হলে অবশ্য এখানকার কোনো একটি উপভাষা ধীরে ধীরে সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতো।

আজাদি-উত্তর যুগে আমাদের বুদ্ধিজীবি মহলে এ সম্পর্কে নানা দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে! এ দ্বিধা এসেছে এক দিকে নিজেদের উপভাষাগত উচ্চারণ ব্যবহার করার তাগিদে আর অন্য দিকে এতকালের প্রচলিত আদর্শ উচ্চারণ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করার অক্ষমতায়। এর ফলে স্কুল কলেজ, কোর্ট কাছারিতে, বিভিন্ন বক্তৃতামঞ্চে এবং খবরের কাগজগুলোর আপিসে আমাদের উচ্চারণে এক জগাখিচুড়ি অবস্থা দেখা দিয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যেকটি অঞ্চলের লোকই এ প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগে জীবিকার্জনের জন্য নানা ভাবে জড়িত। এক অঞ্চলের লোক একই কর্মক্ষেত্রে অন্য অঞ্চলের লোকের সংগে কথা বলার জন্য সম্পূর্ণভাবে তার নিজস্ব উপভাষার ওপরে নির্ভর না-করলেও তার উপভাষার নিজস্ব ধ্বনি

পদ্ধতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হচ্ছে। প্রাক্-আজাদি যুগে এ রকম ক্ষেত্রে নিজস্ব উচ্চারণ করলে হাস্যাস্পদ হবার ভয় ছিল; ফলে চলতি উচ্চারণ আয়ত্ত করার জন্য তার দিক থেকে একটা সযত্ন প্রয়াসও ছিল। আজকে উপহাসের ভয় নেই বরং আছে তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে প্রতিষ্ঠিত করার সজোর প্রয়াস।

এর ফলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও আমরা বাংলা স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলোর আঞ্চলিক উচ্চারণ হুবহু শুনতে পাচ্ছি। গৃহীত উপভাষা অনুসারে বাংলার "এ" স্বরধ্বনিটির উচ্চারণ অর্ধসংবৃত, কিন্তু শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামে "এ" স্বরধ্বনিটির উচ্চারণ উন্মুক্ততর। প্রচলিত 'লেন দেন' শব্দ দুটো এ অঞ্চলের অনেকের মুখেই উচ্চারিত হয় 'ল্যান দ্যান' রূপে। তাঁরা 'বেল'; 'তেল'; 'ফেল', প্রভৃতি শব্দের 'এ' ধ্বনিটিকেও অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত ভাবে উচ্চারণ করেন। তাঁদের 'head' 'bed' 'sell' 'bell' প্রভৃতি ইংরেজী শব্দের 'e' স্বরধ্বনি উচ্চারণ থেকে এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করা যাবে। এ শব্দগুলোকে তাঁদের অনেক শিক্ষিত লোকেও 'হ্যাড, 'ব্যাড', 'স্যাল্', 'ব্যাল্' রূপে উচ্চারণ করে থাকেন।

চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট অঞ্চলে 'খ' ধ্বনিটি স্পর্শধ্বনি নয়, আরবি 'خ' এর মতো শিস্ বা ঘর্ষণজাত। 'খাও', 'খাওয়া' প্রভৃতি শব্দ তাঁদের মুখে হয়ে যায় (خ-াও, (خ-াওয়া)। চট্টগ্রামে 'কাপড়' শব্দের উচ্চারণ আমি (خ)-াওড়' শুনেছি। 'কাপড়' যে' খাওড়' হয়েছে তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু কাপড়ের উচ্চারণ যখন (خ)-াপড় শুনি তখনই কানে লাগে।

পূর্ব-পাকিস্তানের অধিকাংশ জায়গায় 'ড়' ধ্বনি নেই; এর পরিবর্তে 'র' ধ্বনি ব্যবহৃত হয়। আমরা 'গাছ থেকে পড়া', 'পড়া তৈরী করা' আর' 'কাপড় পরা' প্রভৃতিস্থানে 'ড়' ও-'র'-এর মধ্যে কোন তফাৎ দেখিনে, সর্বত্রই শুধু 'র' হয়ে যেতে দেখি; ফলে শুধু 'গাছ থেকে পরা' 'পরা তৈরী করা' 'কাপর পরা'ই শোনা

যায় এমন নয়, বানানেও 'ড়' ও 'র'-এর গোলযোগ দেখা দেয়। এঁদের উচ্চারণে 'ড়' প্রায়ই 'র' হয়ে যায় দেখে অনেকে দৈন্য ঢাকবার জন্য 'র' স্থানে 'ড়' ব্যবহার করেই ক্ষান্ত হন না, বরঞ্চ 'র' ও 'ড়' এর গোলযোগ সৃষ্টি করেন। তাই 'নিবিড় হয় 'নিবির', 'তিমির' হয়' তিমিড়', 'ওরে' হয় 'ওড়ে', 'অম্বর' হয় 'অম্বড়', হার> হাড়, হাড়> হার, বারি> বাড়ি, গাড়ি> গারি। আর সব চেয়ে বড় বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয় 'নারী' কে নাড়ি' আর 'নাড়ি' কে 'নারী' উচ্চারণে।

বাংলার দন্তমূলীয় শিস্‌জাত ধ্বনি 'শ' ঢাকা ও পূর্ব বাংলার অন্যত্র 'হ' হয়ে গেছে। সেজন্য 'এসো' 'বসো' 'শালা' প্রভৃতি স্থানে আমরা 'আহো', 'বহো' 'হালা', শুনি। 'শ' স্থানে 'হ' এঁরা যদিও চলতি উচ্চারণে সর্বত্র ব্যবহার করেন না তবু অসতর্ক মুহূর্তে কোনো কোনো সময়ে অনেকের মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়। তা ছাড়া পূর্ব বাংলার গ্রামাঞ্চলে 'হ'-এর বিশুদ্ধ উচ্চারণও করা হয় না। স্বরযন্ত্রের মধ্যস্থিত শ্বাসপথ হঠাৎ রুদ্ধ করার পরক্ষণেই মুক্ত করে দিয়ে আরবি হামযার (') মতো glottal stop জাতীয় এক রকম স্পর্শধ্বনি পাওয়া যায়। 'হাত' সেখানে হয় 'আত', হয়> 'অয়', হিন্দু> 'ইন্দু' ইত্যাদি।

পূর্ববাংলার বহু স্থানে 'ঘ', 'ঝ', 'ঢ', 'ধ', 'ভ' প্রভৃতি মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলোর মহাপ্রাণতা লোপ পেয়ে গেছে। এর ফলে এ সব অঞ্চলে সংশ্লিষ্ট শব্দের শুধু-যে মহাপ্রাণহীন বানান দেখি, তা নয়, তাঁদের মুখে 'ঘোড়ার' উচ্চারণ 'গোরা' শোনা যায়; ঘাস—গাস; ভোঁতা—বোতা; ভীষণ—বীষণ; ধৌত—দৌত; ঢাকা—ডাকা; ঢোকা—ডুকা, কঠোর—কটর, বিধবা—বিদবা, ভাত—বাত, আরম্ভ—আরম্ব ইত্যাদি।

চলতি বাংলায় 'খ' ও 'গ' এবং 'ভ' ও 'ব' এর মধ্যে মহাপ্রাণতা ও স্বল্পপ্রাণতা জনিত বৈপরীত্য আছে। আমরা পর পর 'ঘা' ও 'গা

এবং 'ভাত' ও 'বাত' উচ্চারণ করে স্বতন্ত্র অর্থবোধক দুটো করে শব্দ পাই। ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে 'ঘ' ও 'ভ' প্রভৃতির মহাপ্রাণতা লুপ্ত হয়ে implosive তথা recursive রূপ ধরেছে। এ সব জায়গায় ধ্বনিগুলো 'ধ' ও নয়, 'গ' ও নয় 'ভ' ও নয়, 'ব' ও নয়, 'ঘ' ও 'গ' এবং 'ভ' ও 'ব' এর মাঝামাঝি ধ্বনি—নিঃশ্বাস ছাড়ার সংগে নয় বরঞ্চ শ্বাস গ্রহণের সংগে উচ্চারিত হয়। তাই এ সব অঞ্চলে গা' ও গা, বা'ত ও বাত-এর মধ্যে ধ্বনিগত বৈপরীত্যজনিত শব্দের অর্থগত পার্থক্য শুনি।

প্রচলিত বাংলায় 'চ' 'ছ', 'জ', 'ঝ', দন্তমূলীয় তালব্যধ্বনি কয়টি মূলত স্পর্শধ্বনিই। ঘৃষ্টতা গুণ কিছু থাকলে থাকতে পারে, কিন্তু এদের মধ্যে স্পৃষ্টতা গুণই প্রধান। পূর্ববাংলায় এ ধ্বনিগুলো নানাভাবে সমস্যার সৃষ্টি করছে। এগুলো ঢাকার আদিম অধিবাসীদের কাছে ঘৃষ্ট-স্পৃষ্ট (affricate) কিন্তু খাস পূর্ব-বাংলার নোয়াখালি প্রভৃতি অঞ্চলে উষ্ম তথা শিস্‌ধ্বনিই। এ সব অঞ্চলে এ ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয় স (S), য (Z), ঝ (Zh) রূপে। এ সব অঞ্চলের লোকের মুখে চল্‌তি বাংলারও যথার্থ উচ্চারণ আমরা শুনতে পাইনে, শুনি আঞ্চলিক উচ্চারণ। এর ফলে 'মুসলমান' 'ইসলাম' প্রভৃতি শব্দ এঁরা যেমনই উচ্চারণ করুণ না কেন লিখতে চান' 'স'-এর বদলে 'ছ' দিয়ে; কিন্তু চলিত উচ্চারণে 'ছ' একটি নির্ধারিত ধ্বনির প্রতীক বলেই এ সব শব্দে এঁদের 'ছ' ব্যবহার সকলের কাছেই সমস্যার সৃষ্টি করে।

পূর্ববাংলার নোয়াখালি অঞ্চলে 'প' ধ্বনিটি নেই। ওষ্ঠ্যবর্গীয় স্পৃষ্ট 'প' ও 'ফ'-এর জায়গায় এঁরা ব্যবহার করেন ঘর্ষণজাত 'ফ' (ইংরেজী f)-এর সমতুল্য ধ্বনি। একারণে তাঁদের মুখে 'পানি' হয়ে যায় 'ফানি', পাওয়া>ফাওয়া, ফুল>ful; 'ভ' (bh)ও স্পৃষ্ট থাকে না, তাঁদের মুখে ইংরেজীর মতো 'V' ভাবে উচ্চারিত হয়। 'ভালো' ভারি', 'ভয়', প্রভৃতি শব্দ তাঁদের মুখে আমরা 'Valo'

'Vari' 'Vay'-এর মতো উচ্চারিত হতে শুনি।

উত্তর-বংগের মালদহ অঞ্চলের দন্তমূলীয় 'শ' ধ্বনির উচ্চারণ দন্ত্য কিংবা দন্তমূলীয় না হয়ে দুটোর মাঝামাঝি জায়গা থেকে উচ্চারিত হয়। 'এসো' 'বসো', 'আশা' প্রভৃতি শব্দ আমরা এ অঞ্চলে 'এসো' (eso), 'বসো' (báso), 'আসা' (asa), রূপে উচ্চারিত হতে শুনি।

চলিত বাংলার পশ্চাত্তালুজাত অর্ধসংবৃত স্বরধ্বনি 'ও' মৈমনসিংহের অঞ্চল বিশেষে সংবৃত স্বরধ্বনি 'উ'র মতো উচ্চারিত হয়। তাই সেখানে 'লোক' শব্দটি উচ্চারিত হয়' 'লুক' রূপে ; 'দোষ'-এর উচ্চারণ শুনি 'দুষ'। 'বোকা' হয় 'বুকা', বিধবা—বিদুবা আমোদ—আমুদ, গোপনীয়—গুপনীয়, ভোঁতা—ভুতা, চোর—চুর, কোনমতে—কুনমতে, ঢোকা—ডুকা, খোকা—খুকা, আলোক—আলুক ইত্যাদি। এ শব্দগুলোর সাদৃশ্যে এ অঞ্চলে 'আলো'—'আলু' আর গরু'-গুরু' হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

পূর্ববাংলায় চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ নেই বললেই চলে। চলিত বাংলায় একই স্বরধ্বনির মৌখিক রূপ ও অনুনাসিক রূপ শুধু অনুরণন ও ব্যঞ্জনাগত দিক থেকেই যে স্বতন্ত্র তা নয়, তার phoneme বা মূলধ্বনি হিসেবেই স্বতন্ত্র। সেজন্য 'কাদা' এবং 'কাঁদা', 'কাচা এবং 'কাঁচা', কাটা' এবং কাঁটা', 'খাটি', এবং 'খাঁটি' ; বাস (উচ্চারণ বাশ এবং বাঁশ) এবং বাঁশ প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ অর্থের দিক থেকেও পরস্পর পৃথক। পূর্ববাংলায় এ-ভেদ করা হয় না ; তাই 'কাদা', কাঁদা', 'কাচা', 'কাঁচা' প্রভৃতি শব্দ সর্বত্রই একাকার হয়ে যায়। পূর্ববাংলায় এখানেই চন্দ্র বিন্দুর দুর্গতির শেষ নয়, শব্দের উৎপত্তিগত দিক থেকে যেখানে চন্দ্রবিন্দুর একান্ত প্রয়োজন যেমন কণ্টক>কণ্টঅ>কাঁটা প্রভৃতি শব্দে, সেখানেও চন্দ্রবিন্দু ব্যবহৃত হয় না। অথচ এখানে এমন সব শব্দে চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার

হয় যেখানে অর্থগত কিংবা ইতিহাসগত কোন দিক থেকেই এর প্রয়োজন নেই।

এতক্ষণ আমি আমাদের উচ্চারণের স্থূল দিক নিয়ে আলোচনা করলাম। চলতি বাংলা উচ্চারণের অনেক সূক্ষ্ম ও সুন্দর দিকও আছে। তার সৌন্দর্য ও মাধুর্যের সৃষ্টি হয়েছে স্থান বিশেষে 'এ' ও 'অ' প্রভৃতি স্বরধ্বনির যথার্থ উচ্চারণে। 'এ'-র উচ্চারণ কোথাও সরল কোথাও তির্যক 'এ্যা'-র মতো, ঠিক তেমনি 'অ'-র উচ্চারণও কোথাও অবিকৃত যথার্থ 'অ' আর কোথাও বিকৃত—অর্থাৎ 'ও'-কারের মতো। একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে, আমরা যে সব জায়গায় লিখি 'এ' অথচ পড়ি 'এ্যা' কিংবা 'অ' পড়ি 'ও', সেগুলো আমাদের নেহাৎ খেয়াল-খুশি চরিতার্থ করার জন্য নয়, সেগুলো স্বরসংগতি-জনিত উচ্চারণ। চলিত বাংলায় স্বরধ্বনির সমন্বয়জনিত এ ধরনের উচ্চারণ এ উপভাষার গতিশীলতারই পরিচয় দেয়, কিন্তু পূর্ববাংলায় এ-সব ক্ষেত্রে হয় প্রাক্‌-পরিবর্তন যুগের আদিম উচ্চারণই রয়ে গেছে, নয়তো যথারীতি অনুকরণ করা হয়নি বলে নানা গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রথমত অর্ধ-সংবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি 'এ'-র কথাই ধরি। শব্দে ব্যবহৃত হলে 'এ' হরফটির দুটো উচ্চারণ দেখি—একটি 'এ' এবং অন্যটি 'এ্যা'। 'এ' হরফটির সাধারণত 'এ' উচ্চারণ হয়ঃ

(১) শব্দের মধ্যে ও শব্দের শেষে; যেমন—অনেক, এসেছে, করেছে, করে, ধরে, মারে, কাছে, দূরে ইত্যাদি।

(২) আ-কার এবং ই-কার থেকে জাত অভিশ্রুতি (umlaut)-তে বা সন্ধিস্বর হলে; যেমন—হেটো, ধেনো, লেখা, লেখো, লেখে, রেখো, রেখে, জেলে, বেলে, কেনা, ছেঁড়া ইত্যাদি।

(৩) 'ই' এবং 'উ' স্বরধ্বনির আগে; যেমন—দেশী, দেখি, ঢেঁকি, নেবু, জেবু, গেছু, হেঁছু, ইত্যাদি।

(৪) পরে 'য়া', 'হা' ইত্যাদি থাকলে কিংবা নেতিবাচক 'বে'

উপসর্গ-রূপে ব্যবহৃত হলে ; যেমন—কেয়া, খেয়া, দেয়া, বেহায়া, বেহেড্, বেলেল্লা ইত্যাদি।

(৫) সংযুক্ত ধ্বনির আগে যেমন—চেষ্টা, কেষ্টা, এক্কা, টেক্কা, ইত্যাদি।

(৬) তেল, বেল, কেবল, বেতন, বেদনা, দেবতা ইত্যাদি শব্দে। আর 'এ'-র সাধারণত 'এ্যা' উচ্চারণ হয় ঃ

(১) 'অ' এবং 'আ' পরে থাকলে পূর্বের 'এ'-কার অনেক সময় 'এ্যা' হয়ে যায়, যেমন—কেন—ক্যান, হেন—হ্যান, একা—এ্যাকা, এত—এ্যাত, খেলা—খ্যালা, মেলা—ম্যালা, পেঁচা—প্যাঁচা, ফেলা—ফ্যালা, এগার—এ্যাগার ইত্যাদি।

(২) হলন্ত একাক্ষরিক (mono-syllabic) ক্রিয়ামূলের আদিতে 'এ' থাকলে ; যেমন—ফেল্— ফ্যাল, দেখ্—দ্যাখ, বেচ্—ব্যাচ, দেয়্—দ্যায়, নেয়্—ন্যায় ইত্যাদি।

এ-সব স্থলে আমাদের পূর্ববাংলায় আমরা কী উচ্চারণ শুনি? 'এ্যাক' হয় 'য়েক', 'এ্যাকটা' হয় 'য়েকটা', 'একটি' হয় 'এ্যাকটি', 'এ্যাখন' হয় 'য়েখন', এক্ষুনি আর এখনি হয় এ্যাখনি ; দ্যাখা—দেখা, এ্যাকা—য়েকা, লেখা—ল্যাখা, লেখ্য—ল্যাখ্য, লেখক—ল্যাখক, লেখাপড়া—ল্যাখাপড়া, লেখনী—ল্যাখনী, কেবল—ক্যাবল, তেল—ত্যাল, বেল—ব্যাল, দেশ—দ্যাশ, লেজ—ল্যাজ, বেলা—ব্যালা, ব্যালা—বেলা, স্নেহ—স্ন্যাহ, এবং—এ্যাবং ইত্যাদি। এর পর 'অ' হরফটির উচ্চারণ বিচার করা যাক। এটি যদিও 'অ' স্বরধ্বনির প্রতীক, তবু শব্দের মধ্যে কোথাও 'অ' এবং কোথাও 'ও' হিসেবে উচ্চারিত হয়। সাধারণত যে সব জায়গায় 'অ' এর 'ও' উচ্চারণ হয় ঃ

(১) ই, উ, এবং ঋ-কারে পূর্বে স্বরসংগতিজনিত অবস্থায় যেমন—অতি, মতি, গতি, নতি, অগ্নি, অগ্রিম, কপি, গরু, জরু, সরু, মরু, পটু, অংগুলি, অধু, হনু, যকৃত, কর্তৃক, ভর্তৃ, মসৃণ, বক্তৃতা ইত্যাদি।

(২) য-ফলা' যুক্ত ধ্বনির পূর্বে, যেমন—গদ্য, পদ্য, সদ্য, মদ্য, সভ্য, লভ্য, দন্ত্য, গব্য যোগ্য হত্যা সত্যতা সত্যাগ্রহ ইত্যাদি।

(৩) ব-ফলা' যুক্ত ধ্বনির পূর্বের 'অ' কারও প্রায় 'ও' হয়ে যায়, যেমন : অন্বেষণ—ওন্বেষণ, ধন্বন্তরী—ধোন্বন্তরী, মন্বন্তর—মোন্বন্তর, ইত্যাদি।

(৪) 'ক্ষ'-এর পূর্বে ; যেমন—বক্ষ, লক্ষ, যক্ষ, রক্ষা, ইত্যাদি।

(৫) ক্রিয়াপদে স্থান বিশেষে অ-কারের উচ্চারণ 'ও' হয়ে যায়, যেমন—হ'লে, ক'রলে, ব'লে, ব'লো, প'লো, ম'লো, ইত্যাদি।

(৬) দ্ব্যক্ষর (দুই সিলেবল) বিশিষ্ট শব্দের শেষের সিলেবলটি closed তথা বদ্ধাক্ষর হলে তার অন্তর্নিহিত অ—ওতে পরিণত হয়, যেমন—বালক>বালোক, পালক>পালোক, সবক>সবোক, ডবল>ডবোল, মোরগ>মোরোগ, বেদন>বেদোন, যতন>যতোন আপন>আপোন, মরণ>মরোণ, ধরণ>ধরোণ, (কণক ও গণক শব্দ দু'টিতে এ নিয়ম বোধ হয় এখনও খাটে না অর্থাৎ এদের দ্বিতীয় অক্ষরের 'অ' এখনও 'ওতে' পরিণত হয়নি)। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সৌরভ, কৌরব, গৌরব, ভৈরব প্রভৃতি শব্দের দ্বিতীয় অক্ষরের 'অ' সম্পূর্ণ 'ও' না হয়ে ঈষৎ ও-কারবৎ উচ্চারণ লাভ করে।

(৭) ন ও ণ-র সাহায্যে বদ্ধাক্ষর (closed) বিশিষ্ট একাক্ষরিক শব্দের অন্তর্নিহিত 'অ'—'ও'রূপে উচ্চারিত হয় ; যেমন : বন>বোন, মন>মোন, মণ>মোণ, ধন>ধোন, জন>জোন, পণ>পোণ ক্ষণ>ক্ষোণ ইত্যাদি ; কিন্তু 'গণ' এবং 'রণ' এ শব্দ দুটি এ নিয়মের মধ্যে পড়ে না অর্থাৎ এদের অন্তর্নিহিত 'অ' উচ্চারণে রক্ষিত হয় 'ও'তে পরিবর্তিত হয় না।

(৮) র-ফলা সংশ্লিষ্ট ধ্বনিতে অ-কার থাকলে তাও 'ও'তে পরিণত হয়, যেমন : শ্রবণ>শ্রোবণ, ভ্রম>ভ্রোম, ভ্রমণ>ভ্রোমণ, ব্রহ্ম>ব্রোহ্ম, ব্রজ>ব্রোজ, গ্রহ>গ্রোহ, ত্রস্ত>ত্রোস্ত, প্রতাপ>

প্রোতাপ, প্রমাণ>প্রোমাণ, ইত্যাদি ; কিন্তু '্র' ফলা সংশ্লিষ্ট ধ্বনির 'অ' কারের পরে 'য়' থাকলে সে 'অ' এর বিকার হয় না, যেমন ক্রয়, বিক্রয়, ত্রয়, আশ্রয় ইত্যাদি।

(৯) মন্দ, মন্ত্র, মংগল, নখ এ ক'টি শব্দে কোনো নিয়ম ছাড়াই প্রথম অক্ষরের অন্তর্নিহিত 'অ' এর উচ্চারণ 'ও' হয়, অর্থাৎ মন্দ, মন্ত্র, মংগল, নখ যথাক্রমে মোন্দ, মোন্ত্র, মোংগল, নোখ রূপে উচ্চারিত হয়।

(১০) অ-স্বরান্তিক শব্দের অন্ত্যস্বরের উচ্চারণে ; 'অ' 'ও' রূপে উচ্চারিত হয় যেমন—কর (করো), ধর (ধরো), মার, পাড়, গাঢ়, দঢ়, পড়, অনন্ত, তরতম, ধরধর, মরমর, পড়পড়, ভরভর ইত্যাদি।

নিম্ন তালিকাভুক্ত শব্দে অন্ত্য 'অ' প্রায়ই 'অ' রূপে উচ্চারিত হতো, কিন্তু এ সব জায়গারও 'অ'-র উচ্চারণের ঝোঁক (tendency) বর্তমানে 'ও'র দিকে :

(১) ঋ-কারের পরে ; যেমন—তৃণ, বৃষ, মৃত, কৃত, অমৃত ইত্যাদি।

(২) ঐ-কারের পরে ; যেমন—শৈল, হৈম, নৈশ ইত্যাদি।

(৩) কতকগুলো যুক্তধ্বনির পরে এবং অনুস্বার ও বিসর্গের পরে ; যেমন—রক্ত, ভক্ত, শক্ত, দন্ত, হংস, মাংস, দুঃখ ইত্যাদি।

(৪) শব্দ শেষের 'হ'-এর সংগে ; যেমন—দেহ, স্নেহ, কটাহ, প্রমেহ ইত্যাদি। কিন্তু স্কুল কলেজে,গণ্যমান্য লোকের কথাবার্তায় ও বেতার বক্তৃতায় আমরা কি নিত্য পদ্য (পোদ্দ) পঅদ্দ, গদ্য (গোদ্য) গঅদ্য, চোদ্দ চঅদ্দ, সদ্য (সোদ্দ) সঅদ্দ, অদ্য (ওদ্দ) অদ্দ, সব্যসাচী (সোব্ব্যসাচী) সঅব্ব্যসাচী, সন্ধ্যা (সোন্ধা) সঅন্ধা, কন্যা (কোন্না) কঅন্না, বন্যা (বোন্না) বঅন্না, বক্ষ (বোক্ষ) বঅক্ষ, লক্ষ লক্ষ (লোক্ষ-লোক্ষ) লোক—লঅক্ষ লঅক্ষ লুক, অন্য (ওন্য) অন্ন রূপে উচ্চারিত হতে শুনেছিনে? এখানে কি নিত্য 'সত্য' (সোত্ত) আর 'সত্ত' দুটোই 'সত্ত' হয়ে দাঁড়াচ্ছেনা? এ তো আছেই, তা ছাড়া সন্ধিস্বরজনিত 'ও'

যেমন ওতি, গোত্তি, গোভীর, জোপিছে ইত্যাদি হচ্ছে অঅতি, গঅতি, গঅম্ভীর, জঅপিছে। গোরু, জোরু, সরু>গঅরু, জঅরু, সঅরু; কোর্তৃক>কঅর্তৃক। আর অধীর, অসীম, অশেষ, অজিত প্রভৃতি নঞতৎপুরুষ সমাসজাত নেতিবোধক শব্দগুলো ওধীর, ওসীম, ওজিত হয়ে যাচ্ছে। করো, ধরো, মারো, কালো, ধলো, জলো প্রভৃতি শব্দগুলো হচ্ছে করঅ, ধরঅ, মারঅ, কালঅ, ধলঅ, জলঅ। মরোমরো, ভরোভরো, ধরোধরো, পড়োপড়ো হচ্ছে মরঅ মরঅ, ভরঅ ভরঅ, ধরঅ ধরঅ, পড়অ পড়অ। করো এবং কো'রো—কঅরঅ, আর কোরোনা হচ্ছে কঅরঅনা। কোরতাম কঅরতাম, কোরলাম—কঅরলাম, হোলাম—হঅলাম, মোরলাম—মঅরলাম, বন্ধ—বোন্ধ; মন (মোন) (mind)>মঅন, বন (forest) >বঅন; নখ (নোখ)>নঅখ। এছাড়া রাজ্য, বাল্য, কাব্য, খাদ্য প্রভৃতি শব্দে আমরা এখানে আকারের তির্যক উচ্চারণ তথা এ ধরনের য-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির পূর্বে অপিনিহিতিজাত আ+ই'-র মিশ্র উচ্চারণ রাইজ্য, বাইল্য, কাইব্য, খাইদ্য শুনতে পাচ্ছি।

কিছু দিন হলো কুমিল্লার কয়েকটি ছেলের মুখে রবীন্দ্রনাথের 'দুঃসময়' কবিতার আবৃত্তি শুনছিলাম। তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই 'মহা আশংকা জপিছে মৌন অন্তরে' পংক্তিটি পড়ল "মহা আশংক্ষা জঅপিছে মৌন অন্তরে'। পরে জানতে পারলাম এ অঞ্চলে আকাঙ্ক্ষার সাদৃশ্যে আশংকা হয়েছে আশংক্ষা।

পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের উচ্চারণে এত বেশি তারতম্য রয়েছে বলেই এ সম্পর্কে আজ আমাদের অবহিত হবার এবং কর্তব্য নির্ধারণ করার সময় এসেছে। একটা standard বা আদর্শ উচ্চারণ যদি আমাদের না-থাকে তা হলে প্রত্যেকে নিজের উচ্চারণ-কেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহন হিসেবে চালু করতে চেষ্টা করবে। পূর্ব-পাকিস্তানের প্রত্যেকটি অঞ্চলের অধিবাসী এবং প্রত্যেকটি দায়িত্বশীল মানুষই যদি নিজেদের উপভাষাগত উচ্চারণটিকে আদর্শ

মনে করেন এবং তাঁরা যা উচ্চারণ করবেন সেটাকেই যদি যথার্থ উচ্চারণ বলে চালু করতে চান তাহলে পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উচ্চারণে একটি অরাজকতা দেখা দেবে।

পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের ভাষাতেই নানা উপভাষাগত উচ্চারণ রয়েছে, তবু একটি বিশেষ অঞ্চলের উপভাষাই উচ্চারণের দিক থেকে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বাহন হয়েছে। ইংলন্‌ডে লন্‌ডনের ভাষা, জার্মানিতে বার্লিনের, ফ্রান্সে প্যারিসের, চীনে পিকিং-এর, ভারতে প্রাদেশিক ভাষাগুলোর মধ্যে তাদের রাজধানী কেন্দ্রিক রূপের ; প্রাক্-আজাদি যুগের বাংলা দেশেও তাই কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উপভাষাই ছিল এ ব্যাপারে মুখ্য। বিংশ শতাব্দীর এ গণতান্ত্রিক যুগে কোনো একটি অঞ্চলের উচ্চারণকে অন্য অঞ্চলের লোকেরা আদর্শ বলে হয়তো মানতে চাইবে না ; তাই বলে ভাষার ব্যাপারে দেশব্যাপী অরাজকতার হাত থেকে বাঁচবার জন্য কি কোনো উপায় নেই ? বর্তমান বিশ্বের সেরা গণতান্ত্রিক দেশ সমগ্র ইংলন্‌ডে যে উচ্চারণ শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহন হিসেবে চলে তাকে ইংরেজেরা তাই standard বলেন না, বলেন received। প্রত্যেক অঞ্চলের অধিবাসীরা নিজেদের মধ্যে আঞ্চলিক উচ্চারণই ব্যবহার করেন। অথচ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোতে, সভা-সমিতিতে সাংস্কৃতিক আলাপ-আলোচনায় সর্বত্রই দক্ষিণ ইংল্‌নড অর্থাৎ লন্‌ডনের উপভাষাভিত্তিক received pronunciation বা সর্ববাদী স্বীকৃত উচ্চারণই ব্যবহৃত হয়। বি—বি—সি থেকেও এ ভাষায় সংবাদ ও কথিকা ইত্যাদি প্রচার করা হয়। সমগ্র ইংলন্‌ডে এ উচ্চারণ দেশব্যাপী সকলকে শেখানোর ব্যবস্থাও রয়েছে।

পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীরা নিজেদের মধ্যে নিজেদের আঞ্চলিক উচ্চারণ ব্যবহার করুন তাতে কারও কোনো আপত্তি থাকার কারণ নেই ; কিন্তু সমগ্র শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহন হিসেবে received pronunciation-এর মতো একটা কিছু গ্রহণ

না-করলে এমন দিন আসবে যে-দিন পরস্পরের সংগে ভাবের আদান প্রদান করার মধ্যে-যে ভাষার সবচেয়ে বড়ো উদ্দেশ্য নিহিত আছে, তা ব্যাহত হবার সম্ভাবনা দেখা দেবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কোন্ উচ্চারণটি গ্রহণ করবো? আমাদের শিক্ষিত লোকেরা যদি চলিত বাংলার উচ্চারণের সংগে পরিচিত না-থাকতেন এবং স্কুল কলেজে এর ব্যাপক প্রয়োগ না-করতেন তাহলে পূর্ব-পাকিস্তানের বিশেষ কোনো অঞ্চলের হয়ত বা ঢাকা অঞ্চলের উচ্চারণই ধীরে ধীরে আদর্শ উচ্চারণ হিসেবে চালু হয়ে যেতো; কিন্তু দীর্ঘ দুশো বছরে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা একটি চলিত উচ্চারণের ঐতিহ্য আমাদের সামনে থাকায় এবং আমরাও তার উত্তরাধিকারী হওয়ায় তা সম্ভব হচ্ছে না। আবার আজাদি-উত্তর যুগে কলকাতা-ভিত্তিক এ উচ্চারণকে হুবহু গ্রহণ করতে আমাদের আত্মসম্মানে বাধছে বলে আমরা আমাদের উচ্চারণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছি এবং যে যারটা চালাতে চেষ্টা করছি।

এ থেকে মুক্তির পথ আছে। এ পথ বেছে নিতে হলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন চাই। চলতি উচ্চারণকে যাঁরা কলকাতা, শান্তিনিকেতন তথা পশ্চিমবাংলা-ভিত্তিক বলে বর্জন করতে চান, আমি তাঁদের সংগে একমত নই। এ উচ্চারণ পশ্চিমবাংলা ভিত্তিক হলেও প্রাক্-আজাদি যুগের বহু জিনিসের মতো আমরা এর উত্তরাধিকারী। এই উচ্চারণই হবে আমাদের ভবিষ্যৎ আদর্শ উচ্চারণ গড়ে তোলার ভিত্তি। এ উচ্চারণ পশ্চিম বাংলার হলেও সুদূর ভবিষ্যতে পশ্চিম বাংলাতেও যেমন অবিকৃত থাকবে না, বলা বাহুল্য তিরিশ চল্লিশ বছর পরে পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিম বাংলার আদর্শ উচ্চারণও স্বতন্ত্র পথ ধরে একে অন্য থেকে পৃথক হয়ে দাঁড়াবে।

পূর্ব-পাকিস্তানের ঢাকা নগরীতে দেশের বৃহত্তম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের সন্তান সন্ততিরা ঢাকায় আসবে লেখাপড়া তথা শিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চা করতে। ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকার অন্যান্য কলেজগুলোতে (অবশ্য প্রদেশের অন্যান্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়েও) বর্তমানে যাঁরা শিক্ষকতা করেন তাঁদের অনেকেরই উচ্চারণ বর্তমানের চলিত উচ্চারণের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাঁদের কাছে লেখাপড়া করে, তাঁদের উচ্চারণের রদবদল করে নানা প্রকার গ্রহণ-বর্জনের ভেতর দিয়ে কালক্রমে এখানকার একটি আদর্শ উচ্চারণ গড়ে উঠবে। যত দিন তা না হয়ে উঠছে তত দিন যথাসম্ভব বর্তমান উচ্চারণের বিশুদ্ধতা রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল কলেজ-গুলোর শিক্ষকদের। তাঁরা তাঁদের ছাত্রছাত্রীদের যে-উচ্চারণ শিক্ষা দেবেন তার উপরেই ভবিষ্যতের গতিপথ নির্ধারিত হবে ; কিন্তু আমরা যখন দেখি অঞ্চল বিশেষের স্কুল কলেজগুলোতে আমাদের অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী তাঁদের আঞ্চলিক ভাষাতেই পড়াচ্ছেন এবং কথা-বার্তাবলছেন তখন আমরা ব্যথিত হই। এ রকম হলে অদূর ভবিষ্যতে কেন সুদূর ভবিষ্যতেও দেশব্যাপী একটি আদর্শ উচ্চারণ গড়ে উঠবে না। এ উদ্দেশ্যে এবং যতদূর সম্ভব বর্তমানের উচ্চারণের শালীনতা ও মাধুর্য রক্ষার্থে প্রথমত আমাদের শিক্ষকদের উচ্চারণ পরিশোধনের অভিযানই চালাতে হবে। এ ব্যাপারে আমাদের ট্রেনিংকলেজগুলো এবং বিশ্ববিদ্যালয় দুটোকেই বিশেষভাবে উদ্‌যোগী হতে হবে। এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-গুলোতে বর্তমানে যে সব ছাত্রছাত্রী রয়েছে তাদেরকে উচ্চারণের গুরুত্ব সম্পর্কে নানাভাবে অবহিত করতে হবে ; আর যে-সব শিক্ষক এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে কোনো দিনই আসেননি, গ্রীষ্ম কি হেমন্তকালীন অবকাশে তাঁদের নিয়ে সভা সমিতি করে কিংবা প্রয়োজন হলে 'refresher course'-এর ব্যবস্থা করে তাঁদেরকেও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সজাগ করে তুলতে হবে। এ ভাবে এগুলে অদূর ভবিষ্যতে পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য একটি standard pronunciation বা আদর্শ উচ্চারণ না-হোক অন্তত received pronunciation বা সকলের গ্রহণযোগ্য একটি উচ্চারণ গড়ে তোলা সহজসাধ্য হয়ে উঠবে।

বাঙালী সংস্কৃতির সংকট

বদরুদ্দিন উমর

বাঙালীত্ব এবং মুসলমানত্বের মধ্যে বিরোধের কল্পনা সম্পূর্ণভাবে সাম্প্রদায়িকতাসৃষ্ট। উনিশ ও বিশ শতকে সমগ্র ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাংলাদেশে, সম্প্রদায়গত বিরোধ যত তিক্ত এবং তীব্র হলো, মুসলমানরা অর্থাৎ মধ্যবিত্ত মুসলমানেরা ততই সরে আসার চেষ্টা করলো বাংলার সংস্কৃতি থেকে। তাদের কাছে বাংলার সংস্কৃতি মনে হলো বিধর্মী, কাজেই বিজাতীয়। বাংলা দেশের হিন্দুরা যেহেতু নিঃসন্দেহে বাঙালী এবং মুসলমানেরা যেহেতু হিন্দুর থেকে পৃথক কাজেই তারা বাঙালী হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিতে পারে না। সে পরিচয় দিতে সক্ষম হলে বাংলা দেশে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ কখনও খুব বেশী তীব্র আকার ধারণ করতো না। হিন্দু-মুসলমান সকলেই নিজেদেরকে সমভাবে বাঙালী মনে করলে ধর্মীয় বিরোধের গুরুত্ব অনেকখানি কমে আসতো। কিন্তু সেটা না হয়ে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে হিন্দু-মুসলমানদের বিরোধ গুরুতর আকার ধারণ করলো এবং তার ফলে মুসলমানেরা বাঙালী বলে নিজেদের পরিচয় দিতে শুধু দ্বিধা এবং সঙ্কোচই নয়, অনেকক্ষেত্রে ঘৃণাও বোধ করলো। কারণ তাদের মতে বাঙালী সংস্কৃতির মধ্যে হিন্দু ধর্মের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল, কাজেই বাঙালী সংস্কৃতির দ্বারা তাদের মুসলমানত্ব খর্ব হওয়ার সম্ভাবনা।

বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে এ চিন্তাধারা আজ নোতুন নয়। এর উৎপত্তি মোটামুটিভাবে উনিশ শতকের ইংরেজ রাজত্বকালে। এ সময় তিনটি সংস্কৃতির ধারা বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্তের সংস্কৃতিকে গঠন করতে শুরু করে। এদের প্রথমটি দেশজ, দ্বিতীয়টি ইসলাম ধর্ম ও সামন্ততান্ত্রিক প্রভাবে মধ্যপ্রাচ্য-উদ্ভূত এবং তৃতীয়টি পাশ্চাত্য

সংস্কৃতি। উনিশ শতকে হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে দেশজ এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির যোগাযোগ স্থাপনের ফলে সৃষ্টি হয় অনেক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের, যেগুলির দ্বারা বাংলার সংস্কৃতি হয়ে ওঠে অনেক সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময়।

মুসলমানদের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য প্রভাব কিন্তু তাদের সাংস্কৃতিক চেতনার ক্ষেত্রে তেমন কার্যকরী অথবা সুফলপ্রসূ হলো না। এর প্রধান কারণ একদিকে তাদের ইংরেজ বিদ্বেষ এবং অন্যদিকে হিন্দু-দের প্রতি বিরূপতা। মুসলমান নবাব বাদশা এবং আমীর ওমরাহ-দের পতনের পর অভিজাত এবং উচ্চবিত্ত বাঙালী মুসলমান সমাজের মধ্যে এ সময় ক্ষয়িষ্ণুতার লক্ষণ দেখা দেয়। এর ফলে তারা হয়ে ওঠে একদিকে ইংরেজ এবং অন্যদিকে হিন্দু বিদ্বেষী। ইংরেজ বিদ্বেষের ফলে তারা পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার প্রতি অনেক ক্ষেত্রে হয় বিরূপ মনোভাবসম্পন্ন। আবার হিন্দু বিদ্বেষের ফলে তারা ভারতীয় সংস্কৃতি এবং বাংলার সংস্কৃতি থেকেও নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে। পাশ্চাত্য এবং বাঙালী সংস্কৃতিকে প্রায় অস্বীকার করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা গঠন করতে উদ্যত হয় তাদের স্বতন্ত্র ধর্মীয় এবং সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি। এ প্রচেষ্টা যে কৃত্রিম এবং অস্বা-ভাবিক সেটা তার ব্যর্থতার দ্বারাই অনেকাংশে প্রমাণিত হয়।

অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কারণে হিন্দুদের থেকে নিজে-দেরকে পৃথক করে দেখার চেষ্টার মধ্যেই 'আমরা বাঙালী না মুসলমান?' এ প্রশ্নের উদ্ভব এবং সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার মধ্যেই এ চিন্তাধারার বিকাশ।

দুই

'আমরা বাঙালী না মুসলমান?' এ প্রশ্ন বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত মুসলমানদের মনকে কিছুদিন থেকে আলোড়িত করে এলেও আজ

সেটা আবার অল্পসংখ্যক পূর্বপাকিস্তানবাসীর মনে নোতুন করে দেখা দিয়েছে। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে আমরা বাঙালী, না মুসলমান, না পাকিস্তানী ?—এ প্রশ্ন তত্ত্বগতভাবে মোটেই অর্থপূর্ণ নয়। অর্থাৎ সোজা কথায় এটা নিতান্তই একটা অর্থহীন প্রশ্ন।

প্রশ্নটির যথার্থ চরিত্রকে বোঝার জন্য অন্য কতকগুলি প্রশ্নের সাথে তার তুলনা এবং সাদৃশ্য বিচার করা প্রয়োজন। কেউ যদি প্রশ্ন করেন, 'আমরা কি বাঙালী, না মৎসভোজী, না সঙ্গীতামোদী, না বিশ্বশান্তিকামী ?' তাহলে প্রশ্নকারীকে অনেকেই অস্বচ্ছ চিন্তা করার দায়ে অভিযুক্ত করবেন। এবং সে অভিযোগ ন্যায়সঙ্গতই হবে। কারণ এটা বোঝার কোন অসুবিধা নেই যে একজন বাঙালীর পক্ষে মৎস্যভোজী, সঙ্গীতামোদী এবং বিশ্বশান্তিকামী হওয়ার পথে কোন বাধা বিপত্তি নেই। এজন্য অর্থপূর্ণভাবে একজনকে মৎস্য-ভোজী, সঙ্গীতামোদী, বিশ্বশান্তিকামী বাঙালী হিসাবে বর্ণনা করা সম্ভব। অর্থাৎ মৎস্যভোজন, সঙ্গীত-শ্রবণ এবং বিশ্বশান্তি-কামনার দ্বারা তাঁর বাঙালীত্ব খর্ব হয় না। এটা হয় না তার কারণ এ কাজ-গুলির মধ্যে কোন অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব অথবা বিরোধ নেই। এদের একটির জন্য অন্যটিকে তাই বর্জনকরার প্রয়োজন হয় না। 'আমরা বাঙালী, না মুসলমান, না পাকিস্তানী ?' এই প্রশ্নের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা বলা যেতে পারে।

অপর এক জাতীয় প্রশ্নের সাথে এ প্রশ্নটির তুলনা করলে এ বিষয়ে বক্তব্য আরও কিছু স্পষ্ট হবে। কোন ব্যক্তি যদি প্রশ্ন করেন, 'আমরা কি হিন্দু, না মুসলমান, না খৃষ্টান, না অন্য কিছু ?' তাহলে সে প্রশ্নের জবাব হবে একটি : হিন্দু অথবা মুসলমান অথবা খৃষ্টান অথবা অন্য কিছু। কিন্তু এর জবাবে একথা বলা চলে না যে আমরা হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান। কেউ সে রকম জবাব দিলে সেটা অর্থবোধক হয় না। কারণ কোন ব্যক্তি একই সাথে হিন্দু, মুসলমান,

খৃষ্টান ইত্যাদি হতে পারেন না। তিনি হিন্দু হলে তাঁর পক্ষে মুসলমান অথবা খৃষ্টান হওয়া সম্ভব নয়। আবার মুসলমান হলে তিনি হিন্দু অথবা খৃষ্টান হতে পারেন না। এগুলি বিভিন্ন ধর্মমত, কাজেই এক্ষেত্রে একমত পোষণ করলে অন্য মতকে বর্জন এবং পরিত্যাগ করতেই হবে। কাজেই 'আমরা হিন্দু, না মুসলমান, না খৃষ্টান?' এ প্রশ্নের একটা সোজাসুজি উত্তর পাওয়া সম্ভব। এবং সে উত্তর দান কালে একটিকে বেছে নিয়ে অন্যগুলিকে বর্জন না করলে প্রশ্নটির কোন যথার্থ উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

উপরের প্রশ্ন বিচার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে 'আমরা কি বাঙালী, না মুসলমান, না পাকিস্তানী?' এ প্রশ্নটির সাথে 'আমরা কি মুসলমান, না হিন্দু, না খৃষ্টান?' এ প্রশ্নের চরিত্রগত প্রভেদ আছে। প্রথমোক্ত প্রশ্নটি সত্যঅর্থে প্রশ্নই নয়। কারণ তার মধ্যে 'বাঙালী, 'মুসলমান', এবং 'পাকিস্তানী' এই তিনটি শব্দকে পরস্পরবিরোধী হিসাবে ব্যবহার করা হলেও আসলে সেগুলি মোটেই পরস্পরবিরোধী নয়। বাঙালী, মুসলমান এবং পাকিস্তানীর মধ্যে কোন অন্তর্নিহিত বিরোধ অথবা দ্বন্দ্ব নেই অর্থাৎ একই ব্যক্তি পাকিস্তানী বাঙালী মুসলমান হিসাবে নিজের পরিচয় স্বচ্ছন্দে এবং অর্থপূর্ণভাবে দিতে পারেন। এটা পারেন বলেই 'আমরা বাঙালী, না মুসলমান, না পাকিস্তানী?' এ-প্রশ্ন অর্থহীন যেমন অর্থহীন 'আমরা কি বাঙালী, না মৎস্যভোজী, না সঙ্গীতামোদী, না বিশ্বশান্তিকামী?' এ প্রশ্ন।

উপরে দুই জাতীয় প্রশ্নের মধ্যে মৌলিক চরিত্রগত প্রভেদ থাকলেও 'আমরা বাঙালী, না মুসলমান, না পাকিস্তানী?' এ প্রশ্নটি করার সময় প্রশ্নকারীরা ধরে নেন যে তাঁদের প্রশ্নের অন্তর্গত শব্দগুলির অর্থ পরস্পরবিরোধী, কাজেই একটিকে গ্রহণ করলে অন্যগুলিকে বর্জন না করে সেটা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ তাঁরা মনে করেন বাঙালী হলে মুসলমান অথবা পাকিস্তানী হওয়া চলে না। এই ভুল

ধারণা নিয়ে শুরু করার ফলে তাঁদের সমস্ত চিন্তা এবং যুক্তিই ভুল পথে চালিত হয়।

তিন

কিন্তু বাঙালী বলতে কাদেরকে বোঝায়? এর উত্তর খুবই সহজ। বাংলা দেশের যে কোন অংশে যারা মোটামুটি স্থায়িভাবে বসবাস করে, বাংলা ভাষায় কথা বলে, বাংলা দেশের আর্থিক জীবনে অংশ-গ্রহণ করে এবং বাংলার ঐতিহ্যকে নিজেদের ঐতিহ্য বলে মনে করে, তারাই বাঙালী। কাজেই কে কোন ধর্মাবলম্বী সে প্রশ্ন এ-ক্ষেত্রে খুব বেশী প্রাসঙ্গিক নয়। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান যে কোন ধর্মাবলম্বী লোকই যদি বাংলাদেশে বসবাস করে, বাংলায় কথা বলে, বাংলার আর্থিক জীবনে অংশ গ্রহণ করে এবং বাংলার ঐতিহ্যকে সাধারণভাবে নিজেদের ঐতিহ্য বলে মনে করে তাহলে তাকে বাঙালী বলার অথবা তার নিজের পক্ষ থেকে বাঙালী হিসাবে পরিচিত হওয়ার কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু একথাও আবার অস্বীকার করার উপায় নেই যে বাংলাদেশের মুসলমানেরা অনেক-ক্ষেত্রে নিজেদেরকে বাঙালী বলে পরিচয় দিতে দ্বিধা এবং সঙ্কোচ বোধ করেন। এই দ্বিধা এবং সঙ্কোচের উৎপত্তি সাম্প্রদায়িকতায়। সাম্প্রদায়িকতার জন্যই বাংলার সাধারণ সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে মুসল-মানেরা নিজেদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য বলে স্বীকার করতে সহজে প্রস্তুত হন না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে একথা সত্য ছিল এবং এখনও পূর্ব বাংলার অনেক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমানের মনে এ সংশয় এবং প্রশ্ন রীতিমতো জাগ্রত। তাঁদের ধারণা আমরা বাঙালী বলে নিজেদের পরিচয় দিলে হয় রাষ্ট্রদ্রোহিতা নয় ইসলাম-বিরো-ধীতা করে বসবো। এ ধারণা যে কত ভ্রান্ত সেটা অন্যান্য দেশ এবং জাতির ইতিহাসের কথা স্মরণ করলে সহজেই বোঝা যাবে।

চার

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জার্মানী দ্বিধাবিভক্ত হয়। ফলে তার পূর্ব অংশ হয় কম্যুনিস্ট এবং পশ্চিম অংশ হয় পশ্চিমী গণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই জার্মানীর এই দুই অংশভুক্ত রাষ্ট্রদ্বয়ের দর্শন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শুধু তাই নয়। তারা বিশেষ অর্থে পরস্পরবিরোধী। কিন্তু পরস্পরবিরোধী জীবনদর্শনের জন্যে তাদের এক অংশ নিজেকে জার্মান এবং অপর অংশ নিজেকে অ-জার্মান বলে মনে করে না। তারা বিভিন্ন রাষ্ট্রভুক্ত হলেও জার্মানীর বিভিন্ন অংশের অধিবাসী, জার্মান ভাষায় তারা কথা বলে এবং জার্মানীর ঐতিহ্যকে নিজেদের ঐতিহ্য বলে মনে করে। এ ক্ষেত্রে উভয় অংশের আর্থিক জীবন স্বতন্ত্র হলেও তাদের পক্ষে নিজেদেরকে জার্মান বলে পরিচয় দেওয়ার কোন অসুবিধা হয় না। কম্যুনিস্ট পূর্ব জার্মানীর সরকার অথবা লোকেরা একথা ভাবে না যে পূর্ববর্তীকালে যাঁরা জার্মান সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন তাঁরা যেহেতু কম্যুনিস্ট ছিলেন না, ছিলেন বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত কাজেই তাঁদের সৃষ্টিকার্য বর্তমান পূর্ব জার্মানীর ঐতিহ্যের অন্তর্গত নয়। উপরন্তু তাঁরা পূর্ববর্তীদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত জার্মানীর ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসাৎ করে এক নতুন সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে আজ সচেষ্ট। জার্মানীর সাথে বাংলা দেশের তুলনা সেদিক দিয়ে অনেকখানি প্রাসঙ্গিক। কারণ বাংলাদেশও বিভক্ত হয়ে দুই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং এই দুই অংশের অধিকাংশ অধিবাসীদের ধর্মও স্বতন্ত্র। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর অধিবাসীরা যে ভয় কোন সময়েই করে না সেই ভয়ে আমরা অহরহ আড়ষ্ট এবং আতঙ্কিত।

পূর্ব পাকিস্তানী মধ্যবিত্ত মুসলমানদের অনেকের ধারণা যে বাঙালী হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিলে ধর্মনাশ হবে, তাদের রাষ্ট্রের

বুনিয়াদ শিথিল হবে। মুসলমানদের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে ভারসাম্যের এই অভাবই তাদের সৃষ্টিহীনতার জন্যে অনেকাংশে দায়ী। এ কারণেই তারা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হতবুদ্ধিতা উত্তীর্ণ হয়ে দিক নির্ণয় করতে আজ পর্যন্ত সমর্থ হয় নি।

পাঁচ

শুধু জার্মানী নয়, পৃথিবীর অপরাপর বহু দেশই সাম্রাজ্যবাদের মহিমায় দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে এবং তাদের দুই অংশের মধ্যে আর্থিক জীবন এবং সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য যথেষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা উভয়পক্ষই নিজেদেরকে আইরিশ, ভিয়েৎনামী, কোরীয় ইত্যাদি বলে পরিচয় দিতে কোন প্রকার দ্বিধা অথবা সঙ্কোচ বোধ করে না। শুধু তারাই নয়। বাংলা দেশের মত পাঞ্জাব প্রদেশও দেশবিভাগের সময় দুই ভাগে বিভক্ত হয় এবং তার এক অংশ হয় পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। পাকিস্তানী পাঞ্জাবের অধিবাসীরা পাঞ্জাবী বলে নিজেদের পরিচয় দিতে কোন প্রকার সঙ্কোচ অথবা দ্বিধাবোধ করে এর প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের অধিবাসীরা সকলেই দুই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পাঞ্জাবী হিসাবে পরিচিত এবং তাদের এই পরিচয়দানের ফলে তাদের ধর্মনাশ হচ্ছে আর তারা রাষ্ট্রের বুনিয়াদ ধ্বংস করেছে এ অভিযোগ কেউ করছে না। এ বাধা-নিষেধ এবং চিন্তার বিকৃতি একমাত্র বাঙালীদের মধ্যেই বিশেষভাবে দেখা যাচ্ছে। এবং এর জন্যে বাঙালীরা নিজেরাই বহুলাংশে দায়ী। শত শত বছর ধরে একই দেশে বসবাসকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকদের পক্ষে সেই দেশ এবং তার ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার প্রচেষ্টা 'বাঙালী মুসলমান' ছাড়া অন্য কেউ কখনো করেছে অথবা করার চেষ্টা পর্যন্ত করেছে তার কোন উদাহরণ নেই। এটাই অন্যতম কারণ যার জন্যে বাঙালী

মুসলমানরা আজ পর্যন্ত নিজেদের সঠিক পরিচয় নির্ধারণ করতে সক্ষম হয় নি এবং তার ফলে সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা উল্লেখযোগ্য কোন সৃষ্টি করতেও সমর্থ হয় নি।

ইংরেজী ভাষাভাষী লোকেরা—হোক তারা ইংরেজ, আমেরিকান ক্যানাডীয়ান, অষ্ট্রেলিয়ান বা অন্য কিছু—যে এক সাধারণ সাংস্কৃতিক ধারার অন্তর্গত একথা তারা অস্বীকার করে না। শুধু তাই নয়। এই স্বীকৃতির দ্বারা তারা যে নিজেদের রাষ্ট্রের ভিত্তিকে দুর্বল করেছে এ চিন্তা তাদের মনেও আসে না। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে কেউ যদি বলে যে আমরা পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলার বাংলা ভাষাভাষী লোকেরা সাধারণভাবে একই সাংস্কৃতিক ধারার এবং ঐতিহ্যের অন্তর্গত তাহলে তখনই অনেকের মনে রাষ্ট্রদ্রোহিতার প্রশ্ন ওঠে। তারা তৎক্ষণাৎ মনে করে যে এই স্বীকারোক্তি দ্বারা আমরা ইসলাম এবং পাকিস্তানকে অস্বীকার এবং ধ্বংস করার চেষ্টা করছি। কিন্তু সঙ্গীতচর্চার জন্যে মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ করার যে কোন প্রয়োজন নেই একথা তাদেরকে বোঝাবে কে?

ছয়

বাঙালী মুসলমানেরা বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র এমনকি মাইকেল, রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত নিজেদের তথাকথিত ঐতিহ্য থেকে বাদ দেওয়ার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁদের ধারণা বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্র, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ যে-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক সে সংস্কৃতি শুধুমাত্র হিন্দু সংস্কৃতি, কাজেই মুসলমানদের পক্ষে বর্জনীয়। এ উন্মত্ততার উদাহরণ অন্য কোন দেশের ইতিহাসে পাওয়া মুস্কিল। টলষ্টয় একজন বিশ্বাসী খৃষ্টান ছিলেন এবং তাঁর গল্প উপন্যাস এবং অন্যান্য লেখার মাধ্যমে তিনি খৃষ্টধর্মের বাণীই প্রচার করেছেন। বিপ্লবের পর কিন্তু তাঁর খৃষ্টধর্মপ্রীতির জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন ধর্ম-

বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মত একজন সৃষ্টিশীল লেখককে বর্জন করেনি। উপরন্তু তাঁকে উপযুক্ত সম্মানের সাথে স্বীকার করে নিয়ে তারা নোতুনভাবে নির্মান করছে তাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির ভিত্তি। টলষ্টয়কে সোভিয়েট ইউনিয়নে এই স্বীকৃতিদানের প্রধান কারণ তিনি অত্যন্ত উঁচু দরের সৃষ্টিশীল রাশিয়ান লেখক। তাঁকে এবং তাঁর মত অপরাপর শিল্পীদেরকে বাদ দিয়ে রাশিয়ান সংস্কৃতির কথা চিন্তা করলে সে চিন্তা নিতান্তই অক্ষম হতে বাধ্য। শুধু তাই নয়। বিপ্লবপূর্ব যুগের শিল্পী সাহিত্যিকেরা বিপ্লবের দর্শনে বিশ্বাসী নন এই অজুহাতে যদি তাঁদেরকে বর্জন করা হতো তাহলে রাশিয়ান সাহিত্য সংস্কৃতির মধ্যে যা কিছু সৃষ্টিশীল এবং মহৎ সেগুলিই বাদ পড়তো এবং তার ফলে সমসাময়িক রাশিয়ান সংস্কৃতির দারিদ্র্য উৎকট আকার ধারণ করতো। রাশিয়ান শিল্পী সাহিত্যিকদের অনেক সময় সরকার সমাজবিরোধী ইত্যাদি আখ্যা দিয়েছে কিন্তু রাশিয়ান হওয়ার জন্যে তাঁদেরকে কখনো শাস্তি পেতে হয় নি। আমরা পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীরা এই সত্যকে যতদিন পর্যন্ত না যথার্থভাবে উপলব্ধি করবো অর্থাৎ যতদিন না আমরা চণ্ডীদাস, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, অতুলপ্রসাদ, অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে নিজেদের সাহিত্য সংস্কৃতির ঐতিহ্যের ধারক এবং বাহক হিসাবে গণ্য এবং স্বীকার করতে শিখবো ততদিন পর্যন্ত আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে সৃষ্টির গতিবেগ সঞ্চার করতে আমরা সমর্থ হবো না। আমাদের চারিধারে নানাপ্রকার কৃত্রিম বাধার দেওয়াল তুলে আমরা নিশ্চল ডোবার পানিতেই শুধু অবগাহন করবো। এর বেশী অন্য কিছু সংস্কৃতিক্ষেত্রে আমাদের দ্বারা আর সম্ভব হবে না।

সাত

পূর্ব পাকিস্তান কৃষিপ্রধান দেশ সেজন্যে নগরবাসী মধ্যবিত্তের সংখ্যা এখানে অনুপাতে অনেক কম। কিন্তু বাঙালী সংস্কৃতি বলতে

সাধারণতঃ আমরা যা বুঝি সে সংস্কৃতি মোটামুটিভাবে এই অল্পসংখ্যক মধ্যবিত্তেরই সংস্কৃতি। দেশের অগণিত কৃষক শ্রমিকের মধ্যে যে সংস্কৃতি আজও প্রচলিত তার মধ্যে পরিবর্তনের চাঞ্চল্য কিছু কিছু এলেও তাদের সাধারণ সংস্কৃতির ধারা এবং জীবনযাত্রা পূর্বের 'নির্দিষ্ট খাতেই প্রবাহিত। একথা পশ্চিম বাংলার গ্রাম-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও প্রায় সমানভাবে প্রযোজ্য।

হিন্দু মধ্যবিত্তের সাথে মুসলমান মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংঘর্ষের প্রভাব বাংলাদেশের সাধারণ সাংস্কৃতিক জীবনে ছায়াপাত করে। এর ফলে মুসলমান মধ্যবিত্ত বাঙালী সংস্কৃতিকে হিন্দু সংস্কৃতি বলে ধরে নিয়ে চেষ্টা করে তাকে বর্জন করতে। এবং এই প্রচেষ্টার মধ্যেই বাঙালী সংস্কৃতির সংকটের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু মধ্যবিত্তের আর্থিক এবং রাজনৈতিক জীবনের সংকট তাদের সাংস্কৃতিক জীবনে এই দুর্যোগ সৃষ্টি করলেও তার সাথে সাধারণ গ্রাম্য মুসলমানদের বিশেষ কোন যোগাযোগ থাকেনি। গ্রাম বাংলার সংস্কৃতিক্ষেত্রে বহুকাল পূর্ব থেকেই হিন্দু মুসলমানের সামাজিক ও ধর্মীয় ভাবধারার সমন্বয় তুলনায় অনেকখানি সার্থক হয়েছিল। বাংলার লোকসাহিত্যই তার অন্যতম প্রধান স্বাক্ষর। মুসলমান মধ্যবিত্তের জীবনক্ষেত্রে যে সাংস্কৃতিক সংকট আমরা লক্ষ্য করি সে সংকট সাধারণ গ্রাম্য মুসলমানদের মধ্যে আজও অনুপস্থিত। রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক পরিবর্তনের অনেক ঢেউ এদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হলেও গ্রাম বাংলার মধ্যে এ জাতীয় সংকট এখনো সৃষ্টি হয়নি। কারণ এ সংকট মুখ্যতঃ সাম্প্রদায়িকতা-সৃষ্ট এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীই এই সাম্প্রদায়িকতার জনক।

মুসলমান বাঙালীর জীবনে এই সাংস্কৃতিক সমস্যা সাম্প্রদায়িকতার সমসাময়িক। সাম্প্রদায়িকতা যখনই তীব্র আকার ধারণ করেছে 'আমরা বাঙালী না মুসলমান?' এ-প্রশ্ন তখনই আনুপাতিক প্রচণ্ডতার সাথে মাথা তুলে এ সাংস্কৃতিক সংকটকে করে তুলেছে

দুরূহতর। এজন্যেই সাম্প্রদায়িকতা যে পর্যন্ত আমাদের মানসলোকে রাজত্ব করবে সে পর্যন্ত আমরা এই সাংস্কৃতিক সংকটের হাত থেকে রেহাই পাবো না। এ সংকট উত্তীর্ণ হওয়ার একমাত্র পথ সাম্প্রদায়িকতাকে সর্বস্তরে এবং সর্বভাবে খর্ব করা এবং উত্তীর্ণ হওয়া। এ প্রচেষ্টায় সফলকাম হলে 'আমরা বাঙালী, না মুসলমান, না পাকিস্তানী ?' এ ধরণের অদ্ভুত প্রশ্ন বাঙালী মুসলমানেরা আর কোনদিন নিজেদের কাছে উত্থাপন করবে না। এবং তখনই তারা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে সক্ষম হবে নিজেদের জাতীয় এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়।

সংস্কৃতি আমাদের উত্তরাধিকার

আবুল ফজল

সংস্কৃতি শব্দটি চলিতও নয়, লৌকিকও নয়, ফলে তার সংগে আছে আমাদের জনসাধারণের অপরিচয়। আমরা শিক্ষিতরা ঐ শব্দটি ইংরেজী culture শব্দের অনুবাদ হিসেবেই গ্রহণ ও ব্যবহার করছি। বলা যায় অপব্যবহার করছি সব চেয়ে বেশী। দেশ-বিদেশে এই শব্দের ব্যাপক অপব্যবহার কার-না আজ লক্ষ্যগোচর? সংস্কৃতি কী, তার অর্থের গভীরতা ও পরিধি উপলব্ধি অধিকাংশ লোক করে না বলেই তার অপব্যবহার আজ এমন অবাধ ও সহজ হয়েছে। আমাদের চোখের সামনে দু-দুটা প্রলয়ংকর মহাযুদ্ধ ঘটে গেল, এ দুই মহাযুদ্ধে দুই বিপরীত পক্ষ তাঁদের যুদ্ধনীতির সমর্থনে দোহাই পেড়েছেন সভ্যতা ও সংস্কৃতির। ব্যাপক ও বেপরওয়াভাবে শুধু যুদ্ধ ক্ষেত্র বা সৈন্যবাহিনীর উপর নয়, জনবহুল ঘুমন্ত নগরীর উপর অকাতরে বর্ষিত হয়েছে মারাত্মক শেল, বোমা ও এটমবোম্, দু'-পক্ষের মেসিনগানের গুলি থেকে রেহাই পায়নি নিরীহ শিশু ও নারী, বৃদ্ধ ও রুগ্ন। এ সবই হয়েছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির নামে। আমাদের দেশেও অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণতর ক্ষেত্রে যে নির্লজ্জ সাম্প্রদায়িক দাংগা-হাংগামা হয়েছে তারও পেছনে সক্রিয় প্রেরণা জুগিয়েছে ধর্মের নাম ও সংস্কৃতি সংকট। ইউরোপ আমেরিকা রাষ্ট্রকে সংস্কৃতি আর আমাদের দেশ সংস্কারকে সংস্কৃতি ধরে নিয়ে নিজেদের পশু-মানসের সমর্থন খুঁজেছে ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির আড়ালে। আমার মতে সংস্কৃতির, সত্যিকার সংস্কৃতির কোনো ধর্মগত বা দেশগত রূপ হতেই পারে না, নাম আরোপও তেমনি শব্দের অপব্যবহার ছাড়া কিছুই নয়। ইউরোপীয় সংস্কৃতির কথা যখন আমরা বলি তখন আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে ইউরোপের রাষ্ট্ররূপ, সেখান-

কার দেশাচার ও সংস্কার, তেমনি হিন্দু বা মুসলিম সংস্কৃতির কথা যখন বলি তখনো আমাদের চোখের সামনে তাঁদের সামাজিক আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতিও সংস্কারের ছবিই আমরা দেখতে পাই। ধুতি চাদর পরা হিন্দু সংস্কৃতি নয়, কোনো কোনো হিন্দুর দেশাচার বলা যেতে পারে—আচকান পায়জামা পরাও তেমনি মুসলিম সংস্কৃতি নয়, কোট-প্যাণ্ট-হ্যেট পরাও খৃষ্টান বা ইউরোপীয় সংস্কৃতি নয়। এ সবই আচার—ব্যক্তিগত বা দেশগত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্মগত। তেমনি দাড়ি রাখাও মুসলিম সংস্কৃতি নয়, তা যদি হত তা হলে পাকিস্তান মন্ত্রীসভার অধিকাংশকেই মুসলিম সংস্কৃতির দুশমন বলতে হতো (বলা বাহুল্য ধর্মীয় বিধান ও সংস্কৃতি এক কথা নয়)। শেভ্ করাও খৃষ্টান বা ইউরোপীয় সংস্কৃতি নয়, তা হলে রাজা পঞ্চম জর্জ ও সপ্তম এডওয়ার্ড ও খৃষ্টান পাদ্রিগণ ইউরোপীয় সভ্যতার শত্রুরূপেই গণ্য হতেন। যদি বলা হয় ক লোকটি খুব cultured বা সংস্কৃতিবান্ তা হলে কারো মনে এমন কথা কি জাগে যে ক হচ্ছে হিন্দু, বা মুসলমান বা খৃষ্টান, বা ক পরে হ্যেট-কোট্, বা আচ-কান-পাজামা বা ধুতি-চাদর? বা ক মাংসাশী কি নিরামিষভোজী? অথবা ক যায় মসজিদে, কি মন্দিরে অথবা গির্জায়? বা ক হচ্ছে বি. এ. পাশ বা এম. এ. পাশ? কখ্খনো নয়। তা হলে বুঝতে হবে যে সব দেশগত বা রাষ্ট্রগত বা ধর্মগত বা সম্প্রদায় ও দলগত আচার ব্যবহার, মতামত ও রীতিনীতিকে আমরা সংস্কৃতি বলে পরিচয় দিয়ে নিজেদের কার্যকলাপের সমর্থন খুঁজি, তা আসলে সং-স্কৃতি নয়। তা যদি হত উত্তম হ্যেট্ কোটধারী বা দামি শের-ওয়ানিপরুয়া বা মূল্যবান গরদের ধুতি পরিধানকারী কখনো বর্বরের মতো আচরণ করত না এবং এম. এ. বা পি-এইচ. ডি. ডিগ্রিধারী কখনো করত না অসভ্যের মত ব্যবহার। তাই আমাদের বক্তব্য রাষ্ট্র বা সংস্কার যেমন সংস্কৃতি নয়, তেমনি প্রচলিত ধর্মীয় আচার বা শিক্ষাও সংস্কৃতি নয়। পৃথিবীতে এমন কোনো ধর্ম নেই, যে-ধর্ম-

বিশ্বাসীদের মধ্যে অসভ্যের দেখা মিলবে না এবং অত্যন্ত উচ্চ শিক্ষিত লোককেও নেহাৎ পাষণ্ডের মতো ব্যবহার করতে কে-না দেখেছে? কাজেই ইসলাম, হিন্দু, খৃষ্টান বা অন্য যে-কোনো ধর্মগ্রহণ করেও লোক uncultured থাকতে পারে, তেমনি এম. এ. পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-কোনো উচ্চতম ডিগ্রি নিয়েও uncultured থাকা অসম্ভব নয়।

সংস্কৃতি ও সভ্যতা কী জিনিস তা না-জেনেই আমরা বিশেষ বিশেষ সভ্যতার প্রতি আগ্রহ ও পক্ষপাত দেখিয়ে থাকি। এই ভাবে আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয় বলেই আমরা সংস্কৃতির আসল স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি না। সংস্কৃতির প্রতি যাঁর সত্যিকার দরদ রয়েছে, তিনি কখনো সংস্কৃতির নামে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন না। যদি কেউ এরকম করেন তিনি কখনো cultured বা সংস্কৃতিবান নন।

ফুল ফলে পরিণত হয় তার পাপড়ি ঝরিয়ে দিয়ে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্যও এ ধরনের ত্যাগের প্রয়োজন। শুধু আর্থিক, বৈষয়িক ও আরাম আয়াসের ত্যাগ যে দরকার তা নয়, সংকীর্ণ দেশাচার ও সাম্প্রদায়িক সংস্কার ও তার মোহ ত্যাগ করতে না-পারলেও প্রকৃত সংস্কৃতিসাধক হওয়া যায় না। তা পারি না বলেই আমরা হিন্দু সংস্কৃতি ও মুসলিম সংস্কৃতির নামে উত্তেজিত হয়ে উঠি।

উৎকট বিশ্বাস ও অন্ধভাবাবেগ হচ্ছে সাংস্কৃতিক-জীবনের অন্তরায়। যে-কোনো উৎকট ভাব মানুষের বুদ্ধি ও মনকে করে রাখে সম্মোহিত আচ্ছন্ন। বিপ্লব ও আন্দোলন জাতীয়জীবনে নিয়ে আসে ঝড় ও ভূমিকম্পের প্রচণ্ডতা, তখন কারো মন থাকে না সুস্থ ও দৃষ্টি থাকে না স্বচ্ছ। ফলে তখন সংস্কৃতি থেকে সংস্কার হয়ে ওঠে বড়ো। এই সংস্কারই জাতীয়, ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যের লেবেল এঁটে বাধায় বিরোধ, ফলে সমাজ বা সম্প্রদায় হয়ে পড়ে আত্মকেন্দ্রিক, আত্মকেন্দ্রিকতার অপর নাম হচ্ছে কূপমণ্ডুকতা।

ঘরের প্রয়োজন আমাদের নিশ্চয়ই আছে এবং চিরকাল থাকবে ; কিন্তু ঘর যেন কবর হয়ে না-ওঠে অর্থাৎ ঘর যেন ঘরের থেকেও বড়ো পৃথিবী ও আকাশকে আমাদের মন ও চোখ থেকে রুদ্ধ করে না-রাখে। ঘরে বসে যেন বিশ্বের সংগে বাণী বিনিময় করতে পারি। বলেছি মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য সাধনাই সংস্কৃতি, মহত্ত্ব ও সৌন্দর্যের নেই কোনো সীমা, তা আকাশেরই মতো অসীম। মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য সাধনার উপর, এক কথায় মনুষ্যত্বের উপর যে-সংস্কৃতির ভিত্তি, একমাত্র সেই সংস্কৃতিই মানব জীবনে বিকিরণ করতে পারে আলো। যে-আলোর নেই কোনো দেশ, কোনো কাল ও কোনো জাত।

Clive Bell সাহেব তাঁর Civilization গ্রন্থে একটি চমৎকার সত্য কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, "The civilized man is made, not born" 'সংস্কৃতি কারো পৈতৃক সম্পত্তি নয়, সংস্কৃতি নিয়ে কেউই জন্মায় না, কেউ তা পেতে পারে না উত্তরাধিকার সূত্রে। প্রতিদিন সচেতন সাধনার দ্বারা সংস্কৃতিকে আয়ত্ত করতে হয়। এই সাধনার সিদ্ধিলাভ সহজলভ্য হবে তাঁর যিনি পরিচালিত হবেন যুক্তি, বিচার ও শুভবুদ্ধির দ্বারা। জীবনে বুদ্ধি ও বিচারের আসন সুদূর-প্রসারী। কিন্তু বুদ্ধি ও বিচার শক্তির প্রয়োগ করতে হবে জীবনসাধনায়, মানুষের জন্য জীবনই সব চেয়ে বড়ো। ব্যক্তি নয়, জাতি নয়—জীবন। এই জীবন সাধকই হতে পারেন প্রকৃত সংস্কৃতিবান বা Cultured, তাই সমঝদার ঐতিহাসিক হজরত মুহম্মদকে বলেছেন জীবনসাধক, আর রসগ্রাহী সমালোচক রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দিয়েছেন জীবন-শিল্পী বলে।

মোটকথা, মনুষ্যত্ব তথা মানব-ধর্মের সাধনাই সংস্কৃতি এবং একমাত্র এ সাধনাই জীবনকে করতে পারে সুন্দর ও সুস্থ।

আগে দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে এমনকি সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে

সংস্কৃতি আমাদের উত্তরাধিকার।

যে স্বাতন্ত্র্য-বোধ ছিল—যার ফলে সাংস্কৃতিক জীবনেও একটা বিশিষ্টতা ফুটে উঠতো এখন তা আর নেই। তেমন বিচ্ছিন্ন জীবন এখন আর কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞান আর তার নানা শাখা প্রশাখা আজ এমন এক সার্বিকরূপ নিয়েছে ও নিচ্ছে যার ফলে সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ অনিবার্য। কোনো সংস্কৃতি বা সংস্কৃতি চেতনার পক্ষেই আজ আর নির্ভেজাল স্বাতন্ত্র্য রক্ষা সম্ভব নয়।

ইতিহাসের সাক্ষ্য : রক্ষণশীলতার আয়ু কোনো সময়ই দীর্ঘ নয়।

শুধু ইতিহাসের দোহাই দিয়ে কোনো সংস্কৃতিই বেঁচে থাকতে পারে না। বেঁচে থাকতে হলে সংস্কৃতিকে জীবন্ত হতে হবে, হতে হবে Living. দৈনন্দিন আচার আচরণে আর বিশ্বাসে তা যদি বাস্তবায়িত না-হয় তেমন সংস্কৃতির মৃত্যু কিছুতেই ঠেকানো যাবে না।

ইতিহাসে সংস্কৃতির বহু নামই দেখতে পাওয়া যায় : আর্য, সেমিটিক, ইরানীয়, দ্রাবিড়, ভারত, মোগল, হিন্দু, মুসলমান ইত্যাদি। এ সবেরও রয়েছে আবার বহু শাখা প্রশাখা। আবার যুগ আর নদী সমুদ্রের নামেও চিহ্নিত হয়েছে সংস্কৃতি। আজকের মানুষের কাছে ইতিহাসের বেশি এসব সংস্কৃতির মূল্যই বা কতটুকু? আধুনিক মানুষ বিশেষ করে পাক-ভারতের মানুষ আজ কোন্ সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী? আমরা পূর্ব পাকিস্তানীদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার কী?

এক প্রজননের (Generation) সংস্কৃতি কি অন্য প্রজনন গ্রহণ ও অনুসরণ করতে পারে? সময়ের সংগে সংগে সব কিছুই দ্রুত বদলে যাচ্ছে। তাই এ প্রশ্নের উত্তর সন্ধানও আবশ্যক। জীবিকার চেহারা বদলের সংগে সংগে সংস্কৃতির চেহারাও বদলে যাচ্ছে যেতে বাধ্য। ধর্ম আর শাস্ত্রের যত দোহাই দিইনা কেন মুসলমান কৃষক আর মুসলমান ব্যারিস্টারের সংস্কৃতি কখনো এক নয়।

আগে তবুও ধর্মীয় পালাপরবে ও তার সংশ্লে সম্পৃক্ত অনুষ্ঠানাদিতে বিভিন্ন পেশার লোকের মধ্যে, আর্থিক আর সামাজিক বৈষম্য সত্ত্বেও সাদৃশ্য দেখা যেতো আজ তাও লুপ্ত। সংস্কৃতি আজ অনেকখানি পেশাওয়ারিরূপ নিয়েছে—ধর্ম আর ভূগোল তাতে আর এখন হালে পানি পাচ্ছে না।

রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ

আসাদ চৌধুরী

ক মধুময় পৃথিবীর ধূলি

আমরা পরাধীন ছিলাম। পরাধীনতার গ্লানি এতটা প্রবল ছিল যে, কেহ সাহেব হত্যা করিলে আমরা মনে মনে খুশী হইতাম। ফ্রান্স কিম্বা জর্মন ইংরেজকে কসিয়া শিক্ষা দিলে বৈঠকখানার আড্ডার জন্য আরেকপ্রস্থ চায়ের ব্যবস্থা করিতাম, এমন কি মোহামেডান স্পোর্টিং কেলাব বা মোহনবাগান কোন ক্রমে একটি গোল দিতে পারিলে ছাতি ভাঙ্গিয়া, জুতা উড়াইয়া, পার্শ্ববর্তী দর্শকের পৃষ্ঠে সজোরে আঘাত করিয়া সমস্ত শক্তি কণ্ঠে নিয়োগ করিয়া 'গো-অ-ল' বলিয়া গোল করিতাম এবং উল্লাস জ্ঞাপন করিতাম। এই সময় বিদেশে দিবার ধন ছিল উপনিষদ, বৌদ্ধ ধর্ম, তাজমহল মোগল আর্ট অর্থাৎ যাহা আমাদের কালের এবং আমাদের মনীষার ফসল নয় অথবা পাট, চা, তুলা এইসব অর্থাৎ যাহা আমাদের মস্তিষ্কের ফসলও নয়। সুতরাং সেই সময়ে একটি নেটিব ভাষায় রচিত কবিতা পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ, আবার সায়েবের ভুমিকা সম্বলিত; ইউরোপের হৈ হৈ বাজারে নোবেল পুরস্কার পাইয়া বসিল—তখনো ঐ গোলের মতই নিজেরাও হৈ চৈ করিয়া লইলাম। তবে ছাতিও ভাঙ্গিল না, জুতাও হারাইতে হইল না। বলিলাম 'না, টাগোর লিখেছে খাসা।' ঐ পর্যন্ত, পড়িয়াও দেখিলাম না, ঠাকুর, কি লিখিলেন।

তখন ইংরেজী রাষ্ট্র ভাষার পূর্ণ চন্দ্র, বর্তমানে 'আ-মরি বাংলা ভাষা' অর্দ্ধ চন্দ্রের সম্মান পাইতেছে। তখন পরাধীন ছিলাম— এখন, বলিয়া লাভ কি পাঠকই উত্তম জ্ঞাত। এখনও রবীন্দ্রনাথ পড়িতেছিনা, কারণ···থাক আর সঙ্কোচ করিব না, রবীন্দ্রনাথ হিন্দু

বলিয়া, বোধ করি শুনিতে বড় ভাল লাগিতেছে না। আমরা হঠাৎ এমন কি এক মহান কারণে রবীন্দ্রনাথ চর্চায় বিরত অথবা অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠি—তাহাও তলাইয়া দেখিতে হইবে। আমাদের কৃতজ্ঞতার অকৃতজ্ঞতার প্রশ্ন উঠিতেছে না। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে মধ্যযুগের অন্ধকার হইতে একালে আনিয়াছেন, সঙ্গীতনাটকাদির আদর্শ এখনো রবীন্দ্রনাথ, নবশিল্পান্দোলনের তিনিই হোতা, রাজনীতি ও দর্শনের ব্যাপারে দামী দামী কথা বলিয়াছেন, তবু রবীন্দ্রনাথে ইসলামের কথা-বার্তা খুঁজিতে হইবে (তিনি হিন্দু হইলেও মাফ করিব না); পাকিস্তানের কথাবার্তা আছে কিনা তাহাও বাহির করিতে হইবে (পাকিস্তান নাই বা হইল লাহোর রেজুলেশন তো হইয়া গিয়াছে)। ইহার পর যদি বা টিকিয়া গেল, পাসপোর্ট ভিসার দরকার হইবেনা, ঠাকুর, আপনার টুপী, যাহা বিদেশে এবং স্বদেশে ব্যবহার করিতেন, খুশী হইয়া তাহাতে আতরও মাখিব।

কিন্তু এইসবও তো এক রাউণ্ড হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে ভারতের নয়, পূর্ব পাকিস্তানেরই পত্রিকা 'সমকালে' এসব বিষয়ে বিচারক মিঃ এস. এম. মুরশেদ, বৈজ্ঞানিক কুদরতে খোদা, পণ্ডিত ডঃ শহীদুল্লাহ্, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী প্রচুর লিখিয়াছিলেন। আমরা অনেকেই পড়িয়াছি এবং পড়িয়া ভুলিয়া গিয়াছি। অথবা পড়ি নাই নিতান্ত অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়াই। যাহারা ভুলিয়া যাইতে সহজেই অভ্যস্ত এবং যাহারা পড়েনও নাই—তাহাদের জন্যই এই প্রবন্ধ—সংকলন ও বলা যাইতে পারে; আর যাহারা অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া পড়েন নাই—আমার অমৃত সমান কথা তাহাদের কানে পশিবেনা—মরমেতো নাই—ই।

অসাদ চৌধুরী

খ. আততাগোর ফালসফাতুল হিন্দ? ১

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ব্রাহ্ম সমাজকে প্রতিষ্ঠা করলেন। এই আপোষহীন একেশ্বরবাদী তীব্রভাবে মূর্তি-পূজার বিরোধিতা করেন। রবীন্দ্রনাথের একেশ্বরবাদও তাঁর পিতার পথই অনুসরণ করেছে। ঠাকুরপরিবার ও গোঁড়া হিন্দু সমাজের সম্পর্ক ছিল তীব্র ভাবে পরস্পর বিরোধী। এই পরিবার পীরালি (পীর এবং আলী) অর্থাৎ হিন্দু সমাজ বহির্ভূত ও মুসলমানদের সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে পরিচিত ছিল। সুফীবাদের ভাষায় পীর মানে হচ্ছে প্রধান ঋষি বা দরবেশ। প্রথমাবস্থায় কোন গোঁড়া ব্রাহ্মণ তাঁদের সাথে আহার বা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করত না এবং কার্যতঃ তাঁদের মুসলমান বলে গণ্য করত। ২

(ঠাকুর) বাড়ীর একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। আমি যখন প্রথম এ বাড়ী দেখতে যাই তখন দেখলাম সারা বাড়ী ঘিরে রয়েছে একটা নিস্কলঙ্ক প্রাণময় শুভ্রতা। যেন ইন্দো-পারস্যের শিল্প গৌরব নিয়ে আযোধ্যার কোন ভুস্বামীর গৃহ শিল্পরুচির পূর্ণ উৎকর্ষতায় বিরাজমান। ৩

"সুফীবাদের শুচিস্নিগ্ধ প্রেমাবিষ্ট ভাবটিই এসেছিল ঠাকুর বাড়ীর সংস্কৃতিতে।......

"বৈষ্ণব ধর্মের প্রেম ও ভক্তির আবিলতা, বা তথাকথিত রসের 'ঢলাঢলি' সম্বন্ধে ব্রাহ্মরা ছিলেন শুচি বায়ুগ্রস্ত। সুফীদের ঈশ্বর প্রেম স্বভাবতই ব্রাহ্মদের কাছে বেশ রুচিসম্মত ঠেকেছিল রাধাকৃষ্ণ এবং আনুষঙ্গিক ভাবধারার তুলনায়। ৪

"পোষাক পরিচ্ছদে দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় সাহেবীয়ানার চেয়ে নবাবীয়ানা বেশী ছিল। ফরাস, বেলোয়াড়ি, ঝাড়লণ্ঠন আলবোলা, গোলাব পাশ...আজকের দিনে ঐ বেশবাস, ঐ ভাবে ওড়না অলঙ্কারের ব্যবহার কেউ কল্পনাও করতে পারবে না।......

কেশশয্যাও লক্ষ্য করার মত। সব চেয়ে চোখে পড়ে ঠাকুর বাড়ির বধূ ও কন্যাদের পায়ে জুতো।

যে সঙ্গীত দরবারে মজলিশে সে যুগে বিলাসের আবর্ত সৃষ্টি করত এবং সাধারণের চোখে তাই দূষনীয় হয়ে উঠেছিল সেই সঙ্গীতকেই আবার ব্রহ্মনামগানের উপযোগী করে নিয়েছিল ঠাকুর বাড়ির প্রতিভা। ৫

'অবনীন্দ্রনাথের বইয়ের প্রচ্ছদ যেখানে তিনি সচেতনভাবে বাংলা অক্ষরকে আরবীরূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। ৬

'...সৌদামিনী দেবীর পিতৃস্মৃতি চারণ—পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়ির প্রশস্ত বারান্দায় আরাম কেদারায় বসে আছেন দেবেন্দ্রনাথ, হাতে ফুলের তোড়া—মাঝে মাঝে তাই শুঁকছেন এবং হাফিজের বয়েৎ আওড়াচ্ছেন আপন মনে। ৭

'পোষাক পরিচ্ছদেও তিনি সাধারণ বাঙ্গালীদের উর্দ্ধে ছিলেন। তাঁকে দেখলে মনে হ'ত এক জবরদস্ত মৌলানা বলে। ৮

আরো উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভব, কিন্তু নাবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত এবং ব্রাহ্মসমাজ বর্তমানে প্রায় হিন্দু সমাজই। কিন্তু একদা ব্রাহ্মসমাজের প্রগতিশীল চিন্তাধারা, বিশ্ব সম্পর্কে উদার দৃষ্টি ভঙ্গী অনেকেরই পছন্দ হইত না। লিবারেল শরৎচন্দ্র পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের ক্ষয়িষ্ণুধারাকে আঘাত করিয়াছিলেন। ৯ বলিতেছিলাম যে, সমাজে ও যে পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ বাস করিয়াছিলেন তাহার প্রভাব তাঁহার শিল্পে অনিবার্যভাবেই পড়িবে—কিন্তু......লক্ষ্যণীয় যে উনবিংশ শতকের শেষ দশকে (১৮৯১—১৮৯৮) রচিত...গল্পগুলিতে মুসলিম চরিত্র কোথাও হীনমানের বা হীন মর্যাদার নয়, উনিশ শতকী হিন্দুজাতীয়তাবাদী লেখকদের মত হিন্দু গৌরব বৃদ্ধির অভিলাষে মুসলমানকে হীন বর্ণে চিত্রিত করার কোন প্রয়াস নেই রবীন্দ্র-মানসে।" ১০ এমন কি রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস পর্যালোচনায় 'দিলদরাজ' মুসলমান বাদশাহের

প্রতি যে পক্ষপাতিত্ব করিয়াছিলেন তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। রবীন্দ্রনাথের ধর্মীয় চিন্তায় ইসলামের সুফীবাদের প্রভাব লক্ষণীয়। কিন্তু সব চাইতে বড় কথা ধর্ম অর্থে রবীন্দ্রনাথ নিষ্কলুষ মনুষ্যত্বকে বুঝতেন। ১১

রবীন্দ্রনাথ ধর্মের অবিবেকী আচার অনুষ্ঠানকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং উদ্যোগীদের 'বৃদ্ধশিশুদল' বলিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। ১২ বিসর্জিত প্রতিমা দেখিয়া বলিয়াছিলেন 'গেছে পাপ'। ১৩

রবীন্দ্রনাথের যা ধর্মবোধ ও ধর্মের যা ধারণা তা ত কাণ্ডজ্ঞান বর্জিত ভাবাবেগের দ্বারা লাভ হতে পারে না তাই ধর্মোন্মত্ততাকে কবি কখনো ধর্ম সাধনা বলে মনে করেননি। তাঁর ধর্ম তথা মনুষ্যত্ব সচেতন সাধনার দ্বারাই লভ্য। তাঁর লক্ষ্য শান্তি কল্যাণ ও আনন্দ। ১৪ রবীন্দ্রনাথের কাছে ধর্ম ও সভ্যতা সমার্থক

'The Sanskrit word dharma is the nearest synonym in our own language, that occurs to me, for the word civilization. In fact, we have no other word except perhaps some newly-coined one, lifeless and devoid of atmosphere. The specific meaning of dharma is that principle which holds us firm together and lands us to our best welfare. The general meaning of this word is the essential faculty of a thing. [Talks in China.] 15

ইসলামের প্রধান ভূমিই হইল ফিৎরাৎ—বা স্বভাব ধর্ম। রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল সুর ও কি তাহাই নহে। ১৬

গ হে অতীত, তুমি কথা কও

মুসলমানের আমলে হিন্দু সমাজের যে কোন ক্ষতি হয় নাই তাহার কারণ, সে আমলে ভারতবর্ষের আর্থিক পরিবর্ত্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের টাকা ভারতবর্ষেই থাকিত, বাহিরের দিকে

তাহার টান না পড়াতে আমাদের অন্নের স্বচ্ছলতা ছিল।' ১৭

'ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষের সিংহাসনে একজন বাদশাহ্ ছিলেন, তাহার পরে একটি কোম্পানী বসিয়াছিল, এখন একটি জাতি বসিয়াছে, আগে ছিল এক, এখন হইয়াছে আরেক।' ১৮

'দিলদরাজ মোগল সম্রাটদের আমলে দিল্লীতে দরবার জমিত। আজ সে দিল নাই, সে দিল্লী নাই তবু একটা নকল দরবার করিতে হইবে।...

'পূর্বেকার দরবারে সম্রাটেরা যে নিজের প্রতাপ জাহির করিতেন তাহা নহে ; সে সকল দরবার কাহারো কাছে তারস্বরে কিছু প্রমাণ করিবার জন্য ছিল না; তাহা স্বাভাবিক। সে সকল উৎসব বাদশাহ নবাবদের ঔদার্যের উদ্বেলিত প্রবাহ স্বরূপ ছিল, সে প্রবাহ বদান্যতা বহন করিত, তাহাতে প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করিত, দীনের অভাব দূর হইত, তাহাতে আশা এবং আনন্দ দূর দূরান্তরে বিকীর্ণ হইয়া যাইত।

'তাই বলিতেছিলাম আগামী দিল্লীর দরবার পাশ্চাত্য অত্যুক্তি তাহা মেকি অত্যুক্তি। এদিকে হিসাব কিতাব এবং দোকানদারি-টুকু আছে—ওদিকে প্রাচ্য সম্রাটের নকলটুকু না করিলে নয়।

এই যে সম্রাটের প্রতিনিধি রাজাদিগকে (দেশীয় রাজ্যের) সেলাম দিবার জন্য ডাকিয়াছেন ইনি নিজের দানের দ্বারা কোথায় দীঘি খনন করাইয়াছেন, কোথায় পান্থশালা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কোথায় দেশের বিদ্যা-শিক্ষা ও শিল্প-চর্চ্চাকে আশ্রয় দান করিয়াছেন? সেকালের বাদশারা নবাবরা রাজকর্ম্মচারীগণও এই সকল মঙ্গল কার্যের দ্বারা প্রজাদের হৃদয়ের সঙ্গে যোগ রাখিতেন। ১৯

'প্রথম শিক্ষাকালে ইংরাজদের গ্রন্থ আমরা বেদবাক্য স্বরূপ গ্রহণ করিতাম। তাহা আমাদিগকে যতই ব্যথিত করুক—তাহার যে প্রতিবাদ সম্ভবপর, তাহার যে প্রমাণ আলোচনা আমাদের আয়ত্বগত একথা আমাদের বিশ্বাস হইত না। নীরবে নতশিরে

আপনাদের প্রতি ধিক্কার সহকারে সমস্ত লাঞ্ছনাকে সম্পূর্ণ সত্য জ্ঞানে বহন করিতে হইত।

'এ সব অবস্থায় আমাদের দেশের যে কোন কৃতী-গুণী-ক্ষমতাশালী লেখক এই মানসিক বন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন—যিনি আমাদের অন্ধ অনুবৃত্তি হইতে মুক্তি লাভের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিয়াছেন তিনি আমাদের দেশের কৃতজ্ঞতাপাত্র।' ২০

ভারতবর্ষে মুসলমান প্রবেশের অনতিপূর্বে খৃষ্ট-শতাব্দীর আরম্ভকালে ভারত ইতিহাসে এক রোমাঞ্চকর মহাশূন্যতা দেখা যায়। দীর্ঘ দিবসের অবসানের পর একটা যেন চেতনাহীন সুষুপ্তির অন্ধকার সমস্ত দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া ছিল—সেটুকু সময়ের কোন জাগ্রত সাক্ষী, কোন প্রামাণিক নিদর্শন পাওয়া যায় না।—

এ দিকে অনতিপূর্বে ভারতবর্ষের প্রতিবেশে বহুতর খণ্ডবিচ্ছিন্ন জাতি মহাপুরুষ মহম্মদের প্রচণ্ড আকর্ষণবলে একীভূত হইয়া মুসল্‌মান নামক এক বিরাট কলেবর ধারণ করিয়া উত্থিত হইয়াছিল। তাহারা যেন ভিন্ন ভিন্ন দুর্গম মরুময় গিরিশিখরের উপরে খণ্ড তুষারের ন্যায় নিজের নিকট অপ্রবুদ্ধ এবং বাহিরের নিকটে অজ্ঞাত হইয়া বিরাজ করিতেছিল। কখন প্রচণ্ড সূর্যের উদয় হইল এবং দেখিতে দেখিতে নানা শিখর হইতে ছুটিয়া আসিয়া তুষার-স্রুত বন্যা একবার একত্রে স্ফীত হইয়া সহস্রধারায় জগৎকে চতুর্দ্দিকে আক্রমণ করিতে বাহির হইল। ২১

হযরত মহম্মদ (দঃ) এর প্রতি এবং তাঁহার অনুসারীদের প্রতি যে শ্রদ্ধা কবির ভাষায় পুষ্পিত, তেমনটি কই বাংলা ভাষায় তো আর পড়ি নাই। ২২

'কোন বিজিত জাতির লেখকের মধ্যে বিজেতা জাতির প্রতি এমনি উদার এবং শ্রদ্ধাশীল মনোভাব আর কোথাও দেখা গেছে বলে জানি না।' ২৩

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য আরো সন্নিবেশিত হইতে পারিত, কিন্তু 'আকলমন্দরা ইশারা বস্ অস্ত.।

'রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি ও সমাজতত্ত্ব ইংরেজের পলিটিকাল ফিলছফির কোটরে ঢোকে.না। সেখানে রাষ্ট্র আছে, তাই স্বাধীনতার অর্থ হল ব্যক্তি বনাম রাষ্ট্র। রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি স্বদেশী সমাজের শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ে, তাঁর সমাজতত্ত্ব নিতান্তই অর্গ্যানিক, অধিকার সর্বস্ব নয়, ত্যাগধর্ম। এই হিসেবে তিনি বহু স্বদেশী নেতার চেয়ে স্বদেশী-কারণ আমাদের সমাজটাই ঐ ধরণের—অতএব, তিনি ঢের বেশী রিয়ালিষ্টিক। লোকে তাঁকে যখন আদর্শবাদী বলে তখন তারা আইডিয়ালিষ্ট কথাটির অনুবাদই করে, তাঁর সম্বন্ধে সত্য ধারণার প্রমাণ দেয় না। ২৩

"আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনে দুটি মারাত্মক দুর্বলতা এসেছিল—ভিক্ষাবৃত্তি ও আবেদন নিবেদনের পালা; এবং সর্বসাধারণের জীবন থেকে বিচ্যুতি, পলায়ন ও বলতে পারেন।...

"শিক্ষিত সম্প্রদায় দুভাগে বিভক্ত হলেন—তাঁদের চেঁচামেচির নাম উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে সামাজিক চিন্তা। বলাবাহুল্য এটা অবাস্তব, রাজনৈতিক চিন্তা ও আন্দোলনের মতন। তবে এর কুফল বেশী—কারণ জনসাধারণকে বাদ দিয়ে তাদের তাগিদকে ব্যবহার না করে, সমাজ সংস্কার করতে যাওয়ার অর্থই হল জীবনকে প্রত্যাখান। ২৪

এখন রবীন্দ্রনাথও এ সম্বন্ধে লিখতে শুরু করেই দুটি কথা বললেন —ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়ো এবং সমাজের সঙ্গে যুক্ত হও। অবশ্য তেমন সমাজ নয়, স্বদেশী সমাজ; পল্লী সমাজ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের শাসিত সমাজ নয় সকল সৃষ্টির বীজ-ক্ষেত্র সমাজ। ভিক্ষাবৃত্তির ওপর তাঁর কষাঘাত এতই তীব্র যে তার জ্বলুনি কেবল মডারেটদের গায়েই ধরেনি, সরকার বাহাদুরেরও সর্বাঙ্গে লেগেছিল। আমাদের ছেলে-বেলায় রবীন্দ্রনাথকে সাহেবেরা extremist বলতেন। কিন্তু যারা

তাঁর কর্মজীবন লক্ষ্য করেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন যে শান্তি-নিকেতনে বসবাস, জমিদারিতে সমবায় সমিতি, পাঠশালা-হাসপাতাল খোলা, পুকুর কাটানো, গাছ বসানো, পল্লী সংস্কার, শ্রীনিকেতন স্থাপন ব্যবসা-বাণিজ্যের সাহায্য, National Coudcil of Education এ যোগদান—তাঁর প্রত্যেকটি কাজের একটি গূঢ় অর্থ ছিল। সেটি হল এই—ভিক্ষার ঝুলি ফেলে দেশ যেন নিজের পায়ে দাঁড়ায় ও জনগণের সমবেত শক্তি যেন জাগ্রত হয়, মিথ্যাভাব ত্যাগ করে কর্মীরা যেন প্রকৃত মাটির মানুষ হয়। ২৫

রবীন্দ্রনাথ গণমানসকে (২৬) বুঝিতে চাহিয়াছিলেন গভীর গহ্বর হইতেই, উপর হইতে নয়, এবং এই দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই আমরা 'বঙ্গভঙ্গ' উপলক্ষ্যে কিম্বা অন্যান্য রাজনৈতিক আন্দোলনে মুসলমান সম্পর্কে তাঁহার মূল্যবান মতামতগুলি পাইয়াছি। বলাবাহুল্য সে সময় মুহম্মদ আলী জিন্নাহ Forerunner of Hindu Muslim Unity (২৭)—অন্যান্যদের মুগ্ধতাবোধের কথাতো অবাস্তরই। এই প্রসঙ্গে সবিনয়ে আরেকটি কথা বলা আবশ্যক—তখন রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত মুসলমানের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন তাহারা সমাজে সাধারণতঃ ছিল শ্রমজীবি। খানসামা, আর্দালী, চাপরাশী, গারোয়ান দরজী ইত্যাদি (২৮) ইত্যাদি—অথবা নবাবজাদা রইস—সাধারণ মধ্যবিত্ত মুসলমানদের সম্পর্কে তাঁহার ধারণা থাকার কথা ছিলনা। বিস্ময়ের ব্যাপার নিঃসন্দেহে মীর মশারফ হোসেন, কিম্বা কাজী নজরুল ইসলাম তৎকালীন মুসলিম লীগের আন্দোলনগুলির আশেপাশেও ছিলেন না। কাজীর হিন্দু স্ত্রীর কারণটি কোন কোন পণ্ডিত উল্লেখ করিতে পারেন কিন্তু স্বতন্ত্রপন্থী লেখক ইসমাইল হোসেন সিরাজী ও তো মুসলীম লীগ সম্পর্কে সম্প্রদায়কে বড় একটা কিছু বলিয়া গেলেন না। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরই কাজী অসুস্থ হন। বলা বাহুল্য এঁরা সবাই সাধারণ মুসলমান সম্প্রদায়ের সুখ দুঃখের কথাটি বলিয়াছিলেন, এবং ইহারা সকলেই মুসলীম লীগের সবুজ পতাকা

হইতে দূরেই ছিলেন। এঁদের পাণ্ডিত্যের তারীফ করিব না—কিন্তু যাঁহাদের পাণ্ডিত্যের তারীফ সকলেই করেন, সেই ব্যারিষ্টার এ রছুল মওলানা আক্রাম খাঁ প্রচণ্ড রবীন্দ্র-বিরোধী। (খাঁ সম্পাদিত ১৯৬১-র আজাদ পত্রিকা নির্লজ্জ সাম্প্রদায়িকতার কলঙ্কময় সাংবাদিকতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন) ইঁহারা সকলেই সেদিন বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। আন্দোলনের নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী (২৯) পড়িলে এই ধারণা আরো স্পষ্ট হইয়া উঠে। অথচ কল্যাণ ও সুন্দরের কবি—সত্যসন্ধ রবীন্দ্রনাথ জানিতেন জনগণের সংহতি বাধা প্রাপ্ত, দুষ্ট ক্যানসারের মত সাম্প্রদায়িকতা স্বাধীনতা সংগ্রামকে বারবার বিপন্ন করিতেছে, এইটি দূর না হইলে স্বাধীনতাও অর্থহীন হইবে। ২৯

রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য সেই সাম্প্রদায়িকতার গতিকে অস্বীকার করিয়া রাজনৈতিক দলগুলি যখন বিভিন্ন আন্দোলনে লিপ্ত তখন সাবধানী রবীন্দ্রনাথ এই দিকটির প্রতি বারংবার অঙ্গুলি সংকেত করিয়াছিলেন, করিয়া দেশবাসীর এবং স্ব-সম্প্রদায়ের যে খুব প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন বলা যায়না—তবে সেকালের শুভবুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞান-সম্বলিত পূজনীয়দের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। ১৯৬৭ পর্যন্ত পাক-ভারতে অনুষ্ঠিত অসংখ্য সাম্প্রদায়িক দাংগাগুলির কলঙ্কময় বীভৎস রূপ (৩৩) উভয় দেশের সংখ্যালঘুর নীরব আর্তনাদ এবং উপায়হীন উদ্বাস্তু সমস্যা আমাদের কাছে যতই পীড়াদায়ক হইতেছে ততই কবি রবীন্দ্রনাথের কাছে রাজনীতি শিক্ষার আগ্রহ বাড়িতেছে। আবুল ফজল ঠিকই বলিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে, ধর্ম ও সভ্যতা সমার্থক। ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঠিকই বলিয়াছিলেন তিনি কবি এবং রাজনীতিবিদ। ১৯০০ হইতে ১৯৪৭ পর্যন্ত পাক-ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনগুলির ইতিহাসে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বিগত সেপ্টেম্বর যুদ্ধের অন্য কারণ জানিনা কেননা তাহার একদিকের বক্তব্য

আমাদের কাছে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। সত্য ইতিহাস যাহাই হোক, উহা যে আমাদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থের সহিত জড়িত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

খ শান্তির ললিত বাণী

"আমাদের আরেকটি প্রধান সমস্যা হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান এত দুঃসাধ্য তার কারণ দুই পক্ষই মুখ্যতঃ আপন আপন ধর্মের দ্বারাই অচল ভাবে আপনাদের সীমা নির্দেশ করছে। সেই ধর্মই তাদের মানব-বিশ্বকে সাদা কালো ছক কেটে দুই সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত করছে—আত্ম ও পর। ৩১

"ধর্মমত ও সমাজরীতি সম্বন্ধে হিন্দু-মুসলমানে শুধু প্রভেদ নয় বিরোধ পর্যন্ত আছে—একথা মানতেই হবে।...আমি হিন্দুর তরফ থেকেই বলছি, মুসলমানদের ত্রুটি বিচারটা থাক—আমরা মুসলমানকে কাছে টানতে যদি না পেরে থাকি তবে সেজন্য যেন লজ্জা স্বীকার করি। ৩২

"এক সময়ে ভারতবর্ষে গ্রীক পারসিক শক নানা জাতির অবাধ সমাগম ও সম্মিলন ছিল। কিন্তু মনে রেখো সে হিন্দু যুগের পূর্ববর্তী কালে। হিন্দু যুগ হচ্ছে একটা প্রতিক্রিয়ার যুগ—এই যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে সচেষ্টভাবে পাকা করে গাঁথা হয়েছিল। দুর্লঙ্ঘ্য আচারের প্রাকার তুলে একে দুষ্প্রবেশ্য করে তোলা হয়েছিল। ৩৩

"...হিন্দুর ধর্ম মুখ্যভাবে জন্মগত ও আচার—মূলক হওয়াতে তার বেড়া আরো কঠিন। মুসলমান ধর্ম স্বীকার ক'রে মুসলমানের সঙ্গে সমানভাবে মেশা যায়, হিন্দুর সে পথও অতিশয় সংকীর্ণ। আচারে ব্যবহারে মুসলমান অন্য সম্প্রদায়কে নিষেধের দ্বারা প্রত্যাখান করে না, হিন্দু সেখানেও সতর্ক। তাই খেলাফৎ

উপলক্ষেও সে নিজের মসজিদে এবং অন্যত্র হিন্দুকে যত' কাছে টেনেছে, হিন্দু মুসলমানকে তত কাছে টানতে পারেনি। আচার হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের সেতু, সেইখানেই হিন্দু পদে পদে নিজের বেড়া তুলে রেখেছে। ৩৪

"আমাদের দেশে এমন অসংখ্য লোক আছে, মুসলমান কুয়ো থেকে জল তুলতে এলে মুসলমানকে মেরে খুন করতে যারা কুণ্ঠিত হবে না। ৩৫

আমার অধিকাংশ প্রজাই মুসলমান। কোরবানী নিয়ে দেশে যখন একটা উত্তেজনা প্রবল তখন হিন্দু প্রজারা আমাদের এলাকায় সেটা সম্পূর্ণ রহিত করার জন্য আমার কাছে নালিশ করেছিল। সে নালিশ আমি সংগত বলে মনে করিনি" ৩৬

"নিজে ধর্মের নামে পশুহত্যা করব অথচ অন্যে ধর্মের নামে পশুহত্যার আয়োজন করলেই নরহত্যার আয়োজন করতে থাকব, ইহাকে অত্যাচার ছাড়া আর কোন নাম দেওয়া যায় না। ৩৭

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের দুই মোটা ভাগ, হিন্দু ও মুসলমান। যদি ভাবি, মুসলমানদের অস্বীকার করে এক পাশে সরিয়ে দিলেই দেশের সকল মঙ্গল প্রচেষ্টা সফল হবে তাহলে বড়ই ভুল করব। ছাদের পাঁচটা কড়িকে মানব, বাকী তিনটি কড়িকে মানবই না এটা বিরক্তির কথা হতে পারে কিন্তু ছাদরক্ষার ক্ষেত্রে সুবুদ্ধির কথা নয়। আমাদের সবচেয়ে বড়ো অমঙ্গল বড়ো দুর্গতি ঘটে যখন মানুষ মানুষের পাশে রয়েছে অথচ পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ নেই অথবা সেই সম্বন্ধ বিকৃত।

'এক দেশে পাশাপাশি থাকতে হবে অথচ পরস্পরের সঙ্গে হৃদ্যতা সম্বন্ধ থাকবে না, হয়তো বা প্রয়োজনের থাকতে পারে— সেইখানে যে ছিদ্র, ছিদ্র নয়, কলির সিংহদ্বার। দুই প্রতিবেশীদের মধ্যে যেখানে এতখানি ব্যবধান সেখানে আকাশ ভেদ করে ওঠে অমঙ্গলের জয়তোরণ। ৩৮

"আমরা গোড়া হইতে ইংরাজের স্কুলে বেশী মনোযোগের সঙ্গে পড়া মুখস্ত করিয়াছি বলিয়া গভর্ণমেন্টের চাকুরী ও সম্মানের ভাগ মুসলমান প্রজাদের চেয়ে আমাদের অংশে বেশী পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। এইরূপে আমাদের মধ্যে একটা পার্থক্য ঘটিয়াছে। এইটুকু কোনমতে না মিটিয়া গেলে আমাদের ঠিক মনের মিলন হইবে না। আমাদের মাঝখানে একটা অসূয়ার অন্তরাল থাকিয়া যাইবে। মুসলমানেরা যদি যথেষ্ট পরিমানে পদমান লাভ করিতে থাকেন, তবে অবস্থার অসামান্য-বশতঃ জ্ঞাতিদের মধ্যে যে মনোমালিন্য ঘটে তাহা ঘুচিয়া গিয়া আমাদের মধ্যে সমকক্ষতা স্থাপিত হইবে। যে রাজপ্রসাদ এতদিন আমরা ভোগ করিয়া আসিয়াছি আজ প্রচুর পরিমানের তাহা মুসলমানের ভাগে পড়ুক ইহা যেন আমরা সম্পূর্ণ প্রসন্ন মনে প্রার্থনা করি। ৩৯

"মুসলমানকে যে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগানো যাইতে পারে এ তথ্যটাই ভাবিবার বিষয়, কে লাগাইল সেটা তত গুরুতর বিষয় নয়। আমাদের মধ্যে যেখানে পাপ আছে শত্রু সেখানে জোর করিবেই— আজ যদি না করে তো কাল করিবে, এক শত্রু যদি না করে তো অন্য শত্রু করিবে, অতএব শত্রুকে দোষ না দিয়া পাপকে ধিক্কার দিতে হইবে। হিন্দু মুসলমানের সম্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশের একটা পাপ আছে, এ পাপ অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে ইহার যা ফল তাহা না ভোগ করিয়া আমাদের কোন মতেই নিষ্কৃতি নাই।

আর মিথ্যা কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। এবং আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানে একটা বিরোধ আছে। আমরা যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়। আমরা বিরুদ্ধ।...

"মানুষকে ঘৃণা করা যে দেশের ধর্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর হাতে জল খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করিয়া যাহাদিগকে জাতি রক্ষা করিতে হইবে পরের হাতে চিরদিন অপমানিত না হইয়া তাহাদের গতি নাই। তাহারা যাহাদিগকে

ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে সেই ম্লেচ্ছের অবজ্ঞা তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইবে।" ৪০

ভাইয়ের জন্য ভাই ক্ষতি স্বীকার করিয়া থাকে বটে কিন্তু তাই বলিয়া একজন খামাকা আসিয়া দাঁড়াইলে অমনি যে কেহ তাহাকে ঘরের অংশ ছাড়িয়া দেয় এমনতর ঘটেনা। আমরা যে দেশের সাধারণ লোকের ভাই তাহা দেশের সাধারণ লোক জানেনা এবং আমাদের মনের মধ্যেও যে তাহাদের প্রতি ভ্রাতৃভাব অত্যন্ত জাগরুক' আমাদের ব্যবহারে এখনো তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ৪১

'অল্পদিন হইল আমাদের একটি শিক্ষা হইয়া গিয়াছে। যে কারণেই হোক সেদিন স্বদেশী নিমকের প্রতি আমাদের অত্যন্ত একটা টান হইয়াছিল, সেদিন আমরা দেশের মুসলমানদের কিছু অস্বাভাবিক উচ্চস্বরে আত্মীয় বলিয়া ভাই বলিয়া ডাকডাকি সুরু করিয়াছিলাম, সেই স্নেহের ডাকে যখন তাহারা অশ্রু-গদগদ কণ্ঠে সারা দিল না তখন আমরা তাহাদের উপর ভারি রাগ করিয়াছিলাম, যেন সেটা নিতান্তই ওদের শয়তানী। একদিনের জন্য ও ভাবি নাই আমাদের ডাকের মধ্যে গরজ ছিল, কিন্তু সত্য ছিল না। ৪২

'এত বড় আবেগ শুধু হিন্দু সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ রইল, মুসলমানকে স্পর্শ করল না। সেদিনও আমাদের শিক্ষা হয়নি। পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদের ডোবাটাকে আমরা গভীর করে রেখেছি, সেটাকে রক্ষা করেও লাফ দিয়ে সেটা পার হতে হবে, এমন আবদার চলে না। ৪৩

ধর্মের অভিমান যখন উগ্র হয়ে উঠল তখন থেকে সম্প্রদায়ের কাঁটার বেড়া পরস্পরকে ঠেকাতে খোঁচাতে শুরু করল। আমরাও মসজিদের সামনে প্রতিমা নিয়ে যাবার সময়ে অতিরিক্ত জিদের সঙ্গে ঢাকে কাটি দিলুম, অপর পক্ষেও কোরবানীর উৎসাহ পূর্বের চেয়ে কোমর বেঁধে বাড়িয়ে তুললে, সেটা আপন

আপন ধর্মের দাবী মেটাবার খাতির নিয়ে নয়, পরস্পরের ধর্মের অভিমানকে আঘাত দেবার স্পর্ধা নিয়ে। ৪৪

'মুসলমান এই সন্দেহটি মনে লইয়া আমাদের ডাকে সাড়া দেয় নাই। আমরা দুই পক্ষ একত্র থাকিলে মোটের উপর লাভের অংশ বেশী হইবে বটে। কিন্তু লাভের অংশ তাহার পক্ষে বেশী হইবে কি না মুসলমানের সেইটেই বিবেচ্য। অতএব মুসলমানের একথা বলা অসংগত নহে যে আমি যদি পৃথক থাকিয়াই বড় হইতে পারি তবেই তাহাতে আমার লাভ।...একটা দিন আসিল যখন হিন্দু আপন হিন্দুত্ব লইয়া গৌরব করিতে উদ্যত হইল। তখন মুসলমান যদি হিন্দুর গৌরব মানিয়া লইয়া চুপচাপ পড়িয়া থাকিত তবে হিন্দু খুব খুশী হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু যে কারণে হিন্দুর হিন্দুত্ব উগ্র হইয়া উঠিল, সেই কারণেই মুসলমানিত্ব মাথা তুলিয়া উঠিল। এখন সে মুসলমানরূপেই প্রবল হইতে চায়, হিন্দুর সঙ্গে মিশিয়া গিয়া প্রবল হইতে চায় না।

"আজ আমাদের দেশে মুসলমান স্বতন্ত্র থাকিয়া নিজের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতেছে। তাহা আমাদের পক্ষে যতই অপ্রিয় এবং তাহাতে আপাততঃ আমাদের যতই অসুবিধা হউক, একদিন পরস্পরের যথার্থ মিলন সাধনের ইহাই প্রকৃত উপায়।

'এখন জগৎ জুড়িয়া সমস্যা এ নহে যে কি করিয়া ভেদ ঘুচাইয়া এক হইব—কিন্তু কি করিয়া ভেদ রক্ষা করিয়াই মিলন হইবে। সে কাজটা কঠিন—কারণ সেখানে কোন প্রকার ফাঁকি চলে না, সেখানে পরস্পরকে পরস্পরের যায়গা ছাড়িয়া দিতে হয়—সেটা সহজ নহে কিন্তু যেটা সহজ সেটা সাধ্য নহে; পরিণামের দিকে চাহিলেও দেখা যায় যেটা কঠিন, সেটাই সহজ। মুসলমান নিজের প্রকৃতিতেই মহৎ হইয়া উঠিবে—এই ইচ্ছাই মুসলমানের সত্য ইচ্ছা ৪৫

১৯১১তে প্রকাশিত বক্তব্যের সহিত ১৯৪০ ২৩শে মার্চের

লাহোর প্রস্তাব এবং ১৯৪২. ১১ এপ্রিলের নিখিল ভারত মুসলীম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের সমগুণময়তা দেখিয়া অবাক হই।

"নিখিলভারত মুসলিম লীগ তথা এদেশের কয়েক কোটি মুসলমান দাবী করিতেছে "যে, যেসব এলাকা একান্তভাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ যেমন উত্তর—পশ্চিম সীমান্ত এলাকা এবং ভারতের পূর্বাঞ্চল, প্রয়োজন অনুযায়ী সীমানার রদবদল করিয়া ঐ সকল এলাকাকে ভৌগলিক দিক দিয়া এরূপভাবে পুনর্গঠিত করা হউক যাহাতে উহারা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অঙ্গ রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহণ করিয়া সংশ্লিষ্ট ইউনিটদ্বয় সম্পূর্ণ স্বায়ত্বশাসিত ও সার্বভৌমত্বের মর্যাদালাভ করিতে পারে।

"নিখিলভারত মুসলিম লীগের এই অধিবেশন উপরোক্ত মূল আদর্শের ভিত্তিতে লীগ কার্যকরী সংসদকে শাসনতন্ত্রের একটি পরিকল্পনা প্রণয়ণের ক্ষমতা অর্পণ করিতেছে—উক্ত শাসনতন্ত্রের পরিকল্পনাটি এরূপভাবে প্রণীত হইতে হইবে যাহাতে সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাষ্ট্র সমূহ চূড়ান্ত পর্যায়ে দেশরক্ষা, যোগাযোগ শুল্ক এবং প্রয়োজনবোধে অন্য যে কোন দফতরের দায়িত্ব ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারে।" ৪৬

পঁচিশ বছর ধরে দু'টি প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন স্থাপন করার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টার ব্যর্থতার তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে, মুসলমানরা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে বৃটিশ সরকারের খসড়া পরিকল্পনা অনুযায়ী এই দুটি প্রধান জাতিকে এক অখণ্ড ভারত রাষ্ট্র গঠন করতে বাধ্য করা তাদের পারস্পরিক শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের অনুকূল নহে··· মুসলিমলীগের শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, ভারতকে বিভক্ত ক'রে স্বতন্ত্র অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করাই ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধানের একমাত্র উপায়। পরিকল্পনায় যে সমস্ত শর্ত রয়েছে সেগুলির যেমন একদিকে ব্যর্থ হতে বাধ্য তেমনি

অপর দিকে দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে তিক্ততা ও বিদ্বেষ সৃষ্টিতেও সহায়তা করতে পারে।” ৪৭

পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ যখন ছাত্র অথবা গোঁড়া কংগ্রেসী রবীন্দ্রনাথ সেই সময় এই প্রসঙ্গে কতই না প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি রবীন্দ্রনাথ জন শক্তির রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। (৪৮) কল্যাণ ও শান্তিকামী ভারতীয় দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় মুসলমানদের সংরক্ষণে যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছেন তেমনটি কোন বাংগালী মুসলমান দিতে পারেন নাই। এমন কি, স্বয়ং মুহম্মদ আলী জিন্নাহও নন, অন্ততঃ সে সময় তো নয়ই। সে পরিমানে কাজী নজরুল ইসলাম, যিনি এখনো ভারতীয় নাগরিক, যিনি ভারতীয় মুসলমানের রাজনৈতিক আন্দোলনে মুসলমানদের স্বার্থের ক্ষেত্রে বিস্ময়করভাবে উদাসীন তাঁহাকে লইয়া আমাদের সহৃদয় মমত্ববোধের কারণ বোধ করি তিনি মুসলমান। রবীন্দ্র বর্জ্জনের উৎসাহী সাহিত্য ও সমাজ সেবক এই বিচারে তেমন আগ্রহী নন। নজরুলের প্রতি অসম্মানজ্ঞাপন বা ভুল তথ্য পরিবেশনের দায়িত্ব না নিয়াও আমরা বলিব রবীন্দ্রনাথের প্রতি বোধ করি এতদিন সুবিচার করি নাই। বিশ বছরের জাতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও যদি আমাদের মনোভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন না হয়—সে দোষ “সাম্প্রদায়িক”, রবীন্দ্রনাথের নয়।

বর্ত্তমান প্রবন্ধ সাহিত্য বিষয়ক নহে, সঙ্গীত বিষয়কও নহে—নিতান্তই গরজের লেখা। আব্বাস উদ্দিন মোহাম্মেডানে খেলিয়া কয়টা গোল দিয়াছিলেন, কায়েদে আজম ক্রিকেট ক্যাপ্টেন ছিলেন না কেন—এ তর্কে আমরা প্রবৃত্ত হই না ; আমরা প্রবৃত্ত হই বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ গাল্পিক, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, চিন্তাবিদ—রবীন্দ্রনাথ মুসলমানের জন্য কি করিয়াছেন তাহা

লইয়া। দুইটা যে দুই দিকের রাস্তা সে প্রশ্নটা বেমালুম ভুলিয়া যাইতে আমরা এতটা অভ্যস্ত যে কেউ রবীন্দ্র-সঙ্গীত পছন্দ করিলে তাহাকে ব্যঙ্গ করিতে দ্বিধাবোধ করিনা।

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লার উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা প্রবন্ধটি শেষ করি—

বিশ্বনবী (সঃ) বলেছেন—কলিমাতুল হিকমতে দাল্লাতুল হকীমে হয়সু ওজদাহা ফাহুওয়া আহককু বিহা—জ্ঞানীর বাক্য জ্ঞানীর হারান ধন, যেখানেই কেউ তাকে পাবে সেই তার হকদার হবে। আমরা পাকিস্তানীরা রবীন্দ্রনাথের উচ্চভাবধারাকেও আমাদেরই জিনিস বলে মনে করতে পারি। আজও পৃথিবীর মুসলমান সমাজ গ্রীসের ফিসাগুরাস (Phythagoras) আফলাতুন (Plato) সুকরাত (Socrates) আরস্তু (Aristole), বুকরাত (Hypocrates জালিনুস (Galen) বতালিমুস (Ptolemy) এবং উকলিদস (Euclid) কে সসম্ভ্রমে স্মরণ করে। ···আমরাও আজ গ্রীসের প্রাচীন মণীষীদের মধ্যে পাকভারতের এই মণীষীকে উপযুক্ত সম্মানজনক স্থান দিব এবং তাঁর শ্বাশত সত্য বাণীকে আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করব। মনে রাখতে হবে, যে দেশে গুণীর সমাদর নেই সে দেশে গুণী জন্মাতে পারেনা। রবীন্দ্রনাথ অমর। মানবীয় প্রেমে তাঁর হৃদয় ছিল ভরপুর।

হাফিজ বলেছেন—

'হার গিজ ন মীরদ আঁকে
দিল্‌শ যিন্দহ্‌ শুদ ব-ইশক্‌।
সবতস্ত্‌ বর্‌ জরীদ এ 'জরীদ এ 'আলম
দওয়ামে মা।'
হিয়াটি যার প্রেম-জীবিত মরণ নাইক তাহার
ভবের খাতায় অমর কোঠায় দেখ লেখন মোদের।
রবীন্দ্রনাথ যিন্দহ্‌বাদ।
পাকিস্তান যিন্দহ্‌বাদ। ৪৯

তথ্য নির্দেশ

১। 'ভারতীয় দার্শনিক ঠাকুর'—ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ রচিত 'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধের উদ্ধৃতি হইতে' লওয়া হইয়াছে।
সমকাল, রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী, বৈশাখ ১৩৬৭ পৃঃ—৬২৮ সম্পাদক, সিকানদার আবু জাফর, ঢাকা

২। রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী কেন্দ্রিয় কমিটির অনুষ্ঠানে সভাপতি মিঃ জাষ্টিস এস, এম, মুরশেদের ভাষণ, ঐ পৃঃ ৭১১

৩। ঐ, ঐ,

৪। ঠাকুর পরিবার ও মুসলিম সংস্কৃতি, গৌরী আয়ুব, নবজাতক, দ্বিতীয়বর্ষ পঞ্চম ও ষষ্ঠ ১৩৭৩, কলিকাতা, সম্পাদিকা, মৈত্রেয়ী দেবী, পৃঃ ৮৮

৫। ঐ, পৃঃ ৮৯

৬। ঐ, পৃঃ ৯০

৭। ঐ, পৃঃ ৮৮

৮। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সমকাল, র, স পৃঃ ৬২৫

৯। দত্তা, উপন্যাস, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পৃঃ ১—৩

১০। গল্পগুচ্ছের মুসলিম চরিত্র, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান 'সমকাল র, স, পৃঃ ৬৯১

১১। রবীন্দ্রনাথ ও ধর্ম, আবুল ফজল, সমকাল র, স, পৃ ৬৩০

১২। মনুষ্যত্ব তুচ্ছকরি সারা যারা বেলা
তোমারে লইয়া শুধু করে পূজা খেলা
মুগ্ধ ভাবভোগে, সেই বৃদ্ধ শিশুদল
সমস্ত বিশ্বের আজি খেলার পুত্তল। (জৈবেছ্য ৫০)
তুলনীয়—

তোমার পথ ঢাক্যাছে মন্দিরে মসজেদে
ও তোর ডাক শুনে সাঁই চলতে না পাই
আমার গুরুতে মুরশেদে।
তোর দুয়ারেই নানান তালা পুরাণ কোরাণ তসবিসলো।
ভেক পথইতো প্রধান জ্বালা
কাইন্দা সদন মরে খেদে॥
শেখ মদন বাউল

মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য ডঃ আনিসুজ্জমান ১৯৬৪ ঢাকা, পৃঃ ২১১

১৩। বিসর্জন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৪। আবুল ফজল, ঐ, পৃঃ ৬৩১
১৫। প্রাগুক্ত প্রবন্ধে উদ্ধৃতি পৃ ৬৩০
১৬। ডঃ আহমদ শরীফের পদাবলী প্রসঙ্গে প্রবন্ধাবলী দ্রষ্টব্য, মুহম্মদ আবদুল হাই সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা
১৭। সম্পাদকীয় প্রবন্ধের, ঠা-র উদ্ধৃতি নবজাতক রবীন্দ্র-সংখ্যা ১৩৭৩
১৮। রাজা প্রজা র, ঠা, পৃঃ ১০৬
১৯। অত্যুক্তি, রাজা-প্রজা, র ঠা ১৯১২ দিল্লীর দরবার উপলক্ষে রচিত
২০। গ্রন্থ সমালোচনা, ভারতী, শ্রাবন, ১৩০৫ র, ঠা,
২১। ভারতী, শ্রাবণ ১৩০৫ র, ঠা,
২২। 'বিশ্বনবী' গোলাম মোস্তফা রচিত। গ্রন্থটি ইতিহাস নয় জীবন চরিত ও নয় ধর্মীয়গ্রন্থ।
২৩। 'রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক' মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, সমকাল পৃঃ ৬৪৩
২৩। 'রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি' ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়,

সূর্যাবর্ত, অনিল কুমার সিংহ সম্পাদিত, কলিকাতা ১৯৬১, পৃঃ ৭৭

২৪। ঐ পৃঃ ৭৬

২৫। ঐ, পৃঃ ৭৬

২৬। অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া মার্কসবাদী পণ্ডিতগণ 'পরিচয়' পত্রিকাতে নিয়মিত রবীন্দ্র সমালোচনা করিতেন। তাহাদের রবীন্দ্র সমালোচনা এখনো শেষ হয় নাই—। এখানে পণ্ডিতবর্গের মতামত তুলিয়া দিলাম —'রবীন্দ্রনাথ বর্জন করলে আজকের দিনের বাংলা 'সংস্কৃতির শুধু অঙ্গহানি হয় না—তার প্রাণ পর্যন্ত বাদ পড়ে।' অমিত সেন, সূর্যাবর্ত, সুধীর রায় চৌধুরীর "মার্কসবাদী রবীন্দ্র সমালোচনার ইতিহাস" প্রবন্ধে উদ্ধৃত—পৃঃ ১৪৯ এদেশে ধর্মগত ও সমাজগত যে সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা, রবীন্দ্রনাথ সেই সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতা থেকে প্রায় সর্বাংশে মুক্ত। …রবীন্দ্রনাথকে সাম্প্রদায়িক বলা একটা মিথ্যা প্রচার (Slander)।

গোপাল হালদার ঐ পৃঃ ১৫৩

এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য ১৯২১ জুলাই ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৯ জমিয়ত ওলামায়ে হিন্দ। রবীন্দ্রনাথ এরও অনেক আগে জাগ্রতশক্তিকে আহ্বান করেন।

২৭। Mohammed Ali Jinnah, An Ambassador of Unity. His speeches and writings, 1912—1917 with biographical appreciation by Sarojini Naidu (Ganesh-Madras).

Jinnah. H. B. P. P. 228

২৮। জমিরুদ্দিন খান, মহাবিদ্রোহের কাহিনী, সত্যেন সেন, ঢাকা ১৯৫৮ পৃঃ ১৩

২৯। *অন্য ইতিহাসের নকল করে নিজের দেশের ইতিহাস* রচনা করা যায় না।—মনের আক্ষেপ উত্তেজনা এবং হাঁক ডাক ব্যাপারটা খুব প্রচণ্ড হতে পারে কিন্তু দেশের অবস্থার সঙ্গে উদ্দেশ্যের সামঞ্জস্য সাধন সে উপায়ে সিদ্ধ হয় না। 'দেশে আগুন লেগেচে অতএব ইত্যাদি' একথা কিছুকাল থেকে শুনচি—এ আগুন বহু বহু শতাব্দী থেকেই লেগেচে—কিন্তু আড়ি আড়ি, আড়ি, আড়ি' বলে চীৎকার করবার জন্যে ছেলেরা লেখাপড়া এবং বুড়োরা কাজকর্ম্ম ছেড়ে দিলেই এ আগুন নিববে একথা বিশ্বাস করিনে। চরকা চালিয়ে খদ্দর পরে, এই আগুন নিববে এটা এতবড় একটা ছেলেভোলানো কথা যে, এ কথায় দেশসুদ্ধ লোক ভুলেচে দেখে হতবুদ্ধি ও হতাশ হতে হয়। সন্ন্যাসী বলচে তামাকে সোনা করবার একটা সহজ প্রক্রিয়া আমি জানি আমি বলচি সোনা যথা নিয়মে উপার্জ্জন করতে হবে অন্য কোন প্রক্রিয়া নেই—তখন তুমি যদি আমার উপর রাগ কর তাতে এই প্রকাশ হয় যে উপার্জ্জন করার মত উদ্যম তোমার নেই অথচ সোনা পাবার লোভ তোমার পুরো মাত্রায়—এমন মানুষকে বিধাতা পুরস্কার দেন না। চরকা চালিয়ে কোন ফল হয় না এ কথা কেউ বলে না, তার যেটুকু ফল তাই হয়, তার বেশী হয় না। কুইনিন্ খেলে ম্যালেরিয়া সারে, ম্যালেরিয়া সারলে দেশের পরম উপকার ঘটে, কিন্তু কুইনিন্ খেলে স্বরাজ হয় একথা কুইনিন্ বিক্রির মহাজনও বলে না।

(চিঠি পত্র ৭, পৃঃ ১০৯ ? ১০ প্রকাশ ২৫ বৈশাখ ১৩৬৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) "ইংরেজের অত্যাচার সহ্য করতে

হবে কিম্বা ভারতবর্ষ কোন দিন স্বাধীন হবার চেষ্টা করবে না এমন কথা বলিনি। মহাত্মাজি বলেচেন বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই আমরা থাকৃব এবং সে রকম থাকবার ইচ্ছা না করা "Religiously wrong" অর্থাৎ ধর্ম্মবিরুদ্ধ। আমি তা বলিনে। আমি বলি, স্বাধীনতা বাইরের কোন একটা ঘটনার উপর নির্ভর করেনা; দেশের যে অবস্থা ঘটলে স্বাধীনতার মূলপত্তন হয়, স্বাধীনতা সত্য হয় সে অবস্থা ঘটাবার জন্যে চেষ্টা করাই আমাদের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য। সে অবস্থা চরকা কেটেও হয় না, জেলে গিয়েও হয় না —তার সাধনা তার চেয়েও কঠিন ও বিচিত্র —তাতে শিক্ষার দরকার এবং দীর্ঘকালের তপস্যা চাই। হঠাৎ একটা কিছু করে বসা তপস্যা নয়। যে সব কাজে মনের সমস্ত শক্তির জাগরণ ও দীর্ঘকালের প্রাত্যহিক ত্যাগ স্বীকার চাই সে কাজে যখন আমাদের ছেলেদের কোনো উৎসাহ দেখিনে যখন দেখি তারা নিরন্তর তীব্র হৃদয়াবেগের নেশায় মেতে থাকতে চায় "তদা না সংশে বিজয়ায় সঞ্জয়।"—ঐ পৃঃ ১০৭

"আমি গুরু না, রাষ্ট্রনেতা না—আমি কবি, সৃষ্টির বিচিত্র খেলায় নানা ছন্দে গড়া খেলনা জোগাই; এই আমার কাজ। তাতে মানুষের যেটুকু আনন্দ সেইটুকুতেই আমার সার্থকতা। এই আমার স্বধর্ম্ম, আর সেই স্বধর্ম্ম রক্ষার দায়িত্বই আমার। আমার কাছ থেকে রাষ্ট্রনৈতিক সুবুদ্ধি, কর্ম্মনৈতিক নৈপুণ্য যারা আশা করেছে তারা নিজে ভুল করেছে; অথচ আশাভঙ্গের দুঃখের জন্যে আমাকেই দায়ী করেছে।" পৃঃ ১১৮

৩০। পাকিস্তানের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং ভারতের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশরণ সিং, জাতিসংঘের রিপোর্ট স্মর্তব্য। এবং While Memory Serves, Sir F. Thuker (Cessel 1950)

৩১। সমস্যা কালান্তর, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩২। প্রবাসী, ১৩৩৮ শ্রাবণ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিশিষ্টে ডঃ মুহম্মদ ইকবালের ভাষণ দ্রষ্টব্য

৩৩। ডঃ কালিদাস নাগকে লিখিত পত্র, শান্তিনিকেতন (পত্রিকা) ১৩২৯ শ্রাবণ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৪। চরকা, সবুজপত্র (প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত) ১৩৩২ ভাদ্র, পরিশিষ্টে উদ্ধৃত মুহম্মদ আলী জিন্নাহর ভাষণ দ্রষ্টব্য

৩৫। হিন্দু মুসলমান প্রবাসী—১৩৩৮ শ্রাবণ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তুলনীয়—এক বাপের দুই বেটা তাজা মরা কেহ নয়।

সকলেরি এক রক্ত, এক ঘরে আশ্রয়॥···
মালা পৈতা একজন ধরে,
কেউবা সুন্নত করে।
তবে ভায়ে ভায়ে মারামারি করে
যাচ্ছিস কেন সব গোল্লায়।

কবি পাগলা কানাই ; মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্যে উদ্ধৃত, পৃঃ ২১১

৩৬। ছোট ও বড়, কালান্তর, প্রবাসী, ১৩২৪ অগ্রহায়ণ, ঐ

৩৭। স্বামী প্রজ্ঞানন্দ প্রবাসী ১৩৩৩ মাঘ, ঐ, স্মর্তব্য You cannot clap with one hand, লিয়াকত আলী খাঁন, Jinnah H, B,

৩৮। সভাপতির অভিভাষণ, পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী Page 168 F—১৩১৪ (১৯০৭), ঐ

৩৯। ব্যাধি ও প্রতিকার; প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩১৪, ঐ

৪০। সদুপায়, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩১৫, ঐ

৪১। লোকহিত, কালান্তর, সবুজপত্র ১৩২১ ভাদ্র, ঐ

৪২। স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, প্রবাসী, ১৩৩৩

৪৩। হিন্দু মুসলমান, প্রবাসী, ১৩৩৮ শ্রাবণ

৪৪। পরিচয়, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩১৮, (১৯১১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মুহম্মদ আলী জিন্নাহর ভাষণ দ্রষ্টব্য।

৪৫। লাহোর প্রস্তাব, ১৯৪০, ২৩শে মার্চ।

৪৬। Resolution, All India Muslim League, Working Committee 11th April 1942, New Delhi

৪৭। পরিচয়, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩১৮, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪৮। জালিয়ানওয়ালা বাগের (১৯১৯) পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাইটহুড বর্জন করেন। লর্ড চেমস ফোর্ডকে লিখিত চিঠিতে জানান The helplessness of our position as British Subject in India (ডঃ আনিসুজ্জমানের মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্যে উদ্ধৃত, ১০৭ পৃঃ) এবং এর পর রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া সফরও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মনে রাখা দরকার গণশক্তির কথাটি রবীন্দ্রনাথের আগে তেমন করিয়া আর কেহ বলেন নাই।

৪৯। বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথ, শহীদুল্লাহ, সমকাল, রবীন্দ্র সংখ্যা পৃঃ ৬৭৩

সাফাই

সৈয়দ মুজতবা আলীর কোন্ গল্পে যেন পড়িয়াছিলাম—'এ সাবান বিককিরির না' উক্ত দোকানদারের মত বলিতে সাধ হইলেও বলিতে পারিতেছি কই—এই প্রবন্ধ পণ্ডিতজনের

জন্য নয়। —হইলে প্রথমেই একটা ভূমিকা থাকিত। —এই খানে? মাথা চুলকাইয়া, রেওয়াজ ভাঙ্গিয়া অবশেষে এবং সর্বশেষে 'সাফাই'। পুর্বেই উল্লেখ করিয়াছিলাম, ইহাকে 'প্রবন্ধ সংকলনও বলা যাইতে পারে'—নিতান্তই উদ্দেশ্য-মূলক রচনা। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সাধারণ অসাধারণ পাঠকের যে মনোভাব লক্ষ্য করিয়াছি সেই বেদনাদায়ক অনুভূতির প্রতিক্রিয়াই 'রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ'; তা-ও গোটা পৃথিবীর নয়, রাজনৈতিক ঝঞ্জাময় আফ্রো-এশিয়ার নয়, নিতান্তই পূর্ব পাকিস্তানের, তখন পরাধীন ছিলাম বলিয়া বড় জোর পাক ভারতেরও (ভারতবর্ষের)। আমি আমার সাধ্যমত আলোকপাত করিলাম। আলোটা ধার করা, এমন কি সম্পাতের কায়দাটা পর্যন্ত আমার নমস্য অধ্যাপক, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী সাহেবের। ধার করা বটে এবং অন্যেরই বটে—কিন্তু অনুরাগটা আমার, আমার বিশ্বাস দানে আলোকের ক্ষতিতো হয়ই না বরং বাড়ে এবং অধিক আলোকিত হয়। ছাত্রাবস্থায় অধ্যাপক চৌধুরীর কাছে নানাভাবে ঋণী ছিলাম, লেখার ব্যাপারেও তাঁহারই প্রবন্ধ (নামটাও লক্ষ্য করুন—রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক) হইতে দুই হাতেই লইয়াছি। নির্লজ্জ স্বীকারোক্তির কারণ পরিশোধের সাধ্য ও ইচ্ছা, কোনটাই আমার নাই। মুসলমান সমাজের শিক্ষা, জ্ঞান বিস্তার, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, শিল্পকলা, ভাস্কর্য, বিজ্ঞান চর্চ্চা—অর্থাৎ মুসলিম সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রাবদান আলোচনার সীমানার মধ্যে পড়িলে ঐ বিশাল বিষয়ের আলোচনায় মোটেই উৎসাহিত হই নাই—সাহস হইল না।

জনাব সিকান্দর আবু জাফর ও শ্রীমতি মৈত্রেয়ী দেবীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সমকাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী এবং কয়েকটি সংখ্যা নবজাতক হাতের কাছে না থাকিলে বড় বিপদ হইত।

পঁচিশে বৈশাখে

ডক্টর আহমদ শরীফ

আজ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। কলম হাতে নিয়েছি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করব বলেই। কিন্তু তার আগে দু'একটা কথা সেরে নিই।

সাহিত্য শাস্ত্র নয়, জ্ঞানভাণ্ডার নয়, বিষয়-বিদ্যাও নয়। সব মানুষের মধ্যে অল্প-বিস্তর রসপিপাসা থাকলেও তারা পরচর্চা করেই তা' মিটিয়ে নেয়,—বড়ো জোর গান-গল্প-কাহিনী মুখে মুখে শুনেই তারা তৃপ্ত থাকে। কাজেই সাহিত্য সবার জন্যে নয়। সাহিত্যানুরাগ আবাল্য অনুশীলন সাপেক্ষ। যারা সচেতনভাবে সাহিত্যরস গ্রহণে উৎসুক নয়, সাহিত্য তাদের জীবনে অপ্রয়োজনীয়। এজন্যে লেখাপড়াজানা লোক মাত্রেই সাহিত্যানুরাগী নয়। এমন শিক্ষিত লোকও আছে, যারা পাঠ্য বইয়ের বাইরে একটি গ্রন্থও পড়েনি জীবনে।

সাধারণ মানুষ চলে প্রাণধর্মের তাকিদে। প্রাণীর প্রাণধারণের পক্ষে যা প্রয়োজন, তা পেলেই প্রাণী সন্তুষ্ট। সমাজবদ্ধ সাধারণ মানুষও জীবিকার অবলম্বন পেলেই আর কিছুরই তোয়াক্কা করেনা। পশুর জীবন যেমন প্রবৃত্তিও প্রকৃতিচালিত, সাধারণ মানুষের জীবনও তেমনি নীতি ও নিয়ম নিয়ন্ত্রিত। এ নিয়ন্ত্রণে বিচলন ঘটায় কেবল লিপ্সা। বৈষয়িক জীবনে প্রয়োজন কিংবা সামর্থ্যাতিরিক্ত লিপ্সাই বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় আনে সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনে। এই লিপ্সা নিয়ন্ত্রণের জন্যেই মানুষ গড়ে তুলেছে সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রব্যবস্থা। আর এই নিয়ন্ত্রিত জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ও সৌন্দর্য বিধানের জন্যেই মানুষ সৃষ্টি করেছে সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি প্রভৃতি।

এগুলোর মধ্যে সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও দর্শন মনুষ্যত্ব ও

মানবতা বিকাশের সহায়ক। মনুষ্যত্বের ও মানবতার অনুশীলন ও বিকাশ সাধনের জন্যে এগুলোর চর্চা ছিল প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই আবশ্যক। কিন্তু সাধারণ মানুষ সে-প্রয়োজন ও দায়িত্ব স্বীকার করেনি কখনো।, তাই সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত কিংবা দর্শন চিরকালই গুটিকয় মানুষের সাধ্য-সাধনায় রয়েছে সীমিত।

সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও দর্শন মানুষের আত্মার উপজীব্য। সাধারণ মানুষ অবশ্য আত্মা নিয়ে মাথা ঘামায় না। তারা জানেও না ওটা কি বস্তু। সমাজ-ধর্মের সংস্কারবশেই তারা আত্মার অবিনশ্বরত্ব স্বীকার করে এবং সে-কারণেই পারত্রিক জীবনে আস্থা রাখে। তাই সমাজ-ধর্ম নির্দেশিত পাপ-পুণ্যবোধেই তাদের আত্মাতত্ত্ব সীমিত। যারা গভীরতর তাৎপর্য-সচেতন, তারা জানে, চেতনাই আত্মা। এবং এ চেতনা পরিশীলন ও পরিচর্যার অপেক্ষা রাখে। কেননা, পরিস্রুত ও পরিমার্জিত চেতনাতেই মনুষ্যত্ব ও মানবতার উদ্ভব। বলতে গেলে—সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও দর্শন একই সঙ্গে বীজ, বৃক্ষ ও ফল। কেননা সাহিত্যদর্শনাদি যেমন পরিস্রুতি ও পরিমার্জনার উপকরণ, তেমনি আবার পরিশীলিত চেতনার ফলও বটে। তাই সাহিত্যদর্শনাদি একাধারে আত্মার খাদ্য ও প্রসূন।

মানুষের মধ্যে যে-সব জীবনযাত্রী—বিষয়ে নয়, চেতনায় মধ্যেই জীবনকে অনুভব ও উপভোগ করতে প্রয়াসী—সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও দর্শন তাদের আত্মার খাদ্য। এসব তাদের জীবনের অপরিহার্য অবলম্বন। সাহিত্য, শিল্প সঙ্গীত কিংবা দর্শন চর্চা করে এধরণের লোকই শান দেয় তাদের চেতনায়। মনুষ্যত্বের দিগন্তহীন উদার বিস্তারে মানস-পরিভ্রমণ তাদের আনন্দিত করে, আর মানবতাবোধের অসীম অতল সমুদ্রে অবগাহন করে ধন্য হয় তারা।

মনুষ্যত্ব ও মানবতার সাধনা ফলপ্রসূ নয় ব্যবহারিক জীবনে,

বরং ক্ষতিকর। এজন্যে লোকে সচেতনভাবেই এড়িয়ে চলে এ সাধনা। তাই এ পথ যাত্রীবিরল। তারা পরিহার করে চলে বটে, কিন্তু তাচ্ছিল্য করে না—কেবল বিষয়লিপ্সাবশে এ পথ গ্রহণে উৎসাহ পায় না—এই যা।

যে স্বল্পসংখ্যক লোক মানুষের আত্মার খাদ্যরূপে এ ফসল ফলায়, আর যারা এর গ্রাহক, তারা বিষয়ে রিক্ত হলেও যে অন্তরে ঋদ্ধ, তা সাধারণ মানুষও উপলব্ধি করে তাদের অনুভবের সুন্দরতম মুহূর্তে। এজন্যেই তারা হেলা করে বটে, কিন্তু শ্রদ্ধাও রাখে।

এগুলোর মূল্য সম্বন্ধে তাদের অবচেতন মনের স্বীকৃতি রয়েছে বলেই লিপ্সুর বিষয়বুদ্ধি নিয়ে তারা এগিয়ে আসে এগুলোর মূল্যায়নের জন্যে এবং স্বার্থবুদ্ধি বশে বিধিনিষেধও আরোপ করতে চায় এগুলোর উপর। এমনাক ফরমায়েস করবার ঔদ্ধত্যও প্রকাশ হয়ে পড়ে কখনো কখনো। স্বার্থপরের বিষয়বুদ্ধি-প্রসূত এই নিয়ন্ত্রণ-প্রচেষ্টা সময়ে সময়ে জুলুমের পর্যায়ে নামে। এবং তখনই শুরু হয় মনুষ্যত্ব ও মানবতার দুর্দিন।

সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও দর্শন আত্মার উপজীব্য বলেই যারা চেতনা-গভীর জীবন কামনা করে, এগুলোর স্রষ্টা তাদের আত্মীয়। আত্মার জগতে দেশকাল-জাত ধর্ম নেই। তাই দেশ, কাল, সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র কিংবা জাতীয়তায় চিহ্নিত নয় এ চেতনালোক। এখানে যে কেউ আত্মার খাদ্য যোগায় সে-ই আত্মীয়। যা কিছু এ চেতনার বিকাশ ও বিস্তারের সহায়ক, তাই বরণীয়।

সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও দর্শনের ক্ষেত্রে মানুষের যা কিছু সার্থক সৃষ্টি তা চেতনা-প্রবণ বিশ্বমানবের সাধারণ সম্পদ, রিকৃথ ও ঐতিহ্য। একক চন্দ্র-সূর্য যেমন সবার এজমালি হয়েও প্রত্যেকের অখণ্ড সম্পদ, এবং দ্বন্দ্ব না করেই প্রত্যেকেই নিজের ইচ্ছা ও প্রয়োজন মতে পেতে পারে এগুলোর প্রসাদ, তেমনি সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত আর দর্শনও দেশ-কাল-জাত-ধর্ম নিরপেক্ষ

সর্বমানবিক সম্পদ। কল্যাণ ও সুন্দরের ক্ষেত্রে কোন মানবতাবাদীই মানে না জাত ও ভূগোল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী, সঙ্গীতকার ও দার্শনিক। তাই রবীন্দ্রনাথ চেতনা-প্রবণ মানুষমাত্রেরই আত্মীয়। পাক-ভারতে ইতিপূর্বে মানবাত্মার এত বিচিত্র খাদ্য আর কেউ রচনা করেননি। পৃথিবীর ইতিহাসেও এমন রকমারি ফসলের স্রষ্টা সুদুর্লভ। এত বড়ো মানবতাবাদীও ঘরে ঘরে জন্মায় না। পৃথিবীর আত্মীয়-সমাজে রবীন্দ্রনাথ আমাদের পরমাত্মীয়। কেননা, যে-ভাষা আমাদের জীবনানুভূতির ও জীবনোপভোগের বাহন, যে-ভাষা আমাদের জীবনস্বরূপ, সেই আত্মার ভাষাতেই আমাদের আত্মার উপজীব্য দিয়ে গেছেন তিনি। এত বড়ো সুযোগ ও সৌভাগ্যকে হেলা করার মতো নির্বোধ হই কি করে! জীবনের সঙ্গে জীবনের যোগ সাধনের যে-দিশা ও দীক্ষা আমরা তাঁর কাছে পেয়েছি, আজকে গরজের সময়ে যদি তা আমাদের পাথেয় করতে পারি, তবেই ঘটবে আমাদের মনের মুক্তি। আর আমাদের চেতনায় পাব মানবতার স্বাদ।

সম্প্রতি জাতির হিতকামী কিছুসংখ্যক বুদ্ধিজীবি, রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রভাবের মধ্যে অমঙ্গলের চিহ্ন প্রত্যক্ষ করে শঙ্কিত, আতঙ্কিত কিংবা দুর্ভাবনাগ্রস্ত। রবীন্দ্র-সাহিত্য নাকি আমাদের সংস্কৃতি-ধ্বংসী। অন্য কোন বিদেশী সাহিত্যের কুপ্রভাব কিংবা কুফল সম্বন্ধে কিন্তু চিন্তিত নন তাঁরা। অন্তত তাঁদের কর্মে ও আচরণে এখনো প্রকাশ পায়নি সে-ত্রাস। নইলে ইসলামী রাষ্ট্রের মুমীন নাগরিকের উপর চীন-রাশিয়ার ধনসাম্যবাদী নাস্তিক্য সাহিত্যের প্রভাবের মধ্যে নিশ্চয়ই অমঙ্গল দেখতেন তাঁরা এবং শঙ্কিত হতেন মার্কিনী যৌন ও গোয়েন্দা সাহিত্যের জনপ্রিয়তা দেখে। এ বিষয়ে হিতবুদ্ধি-প্রসূত কোন অসন্তোষও তাঁদের মুখে প্রকাশ পায়নি কিংবা প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা করেছেন বলেও আমাদের জানা নেই।

তাঁদের এই নিশ্চিন্ত উদারতা দেখে মনে হয়, তাঁরাও বিশ্বাস করেন যে, একাকীত্বে কিংবা স্বাতন্ত্র্যে মন-বুদ্ধি-আত্মার বিকাশ নেই, এবং বহির্বিশ্বের আলোবাতাসের লালন না পেলে জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বোধের উন্মেষ হয় না কিংবা গুণসংযোগ ব্যতীত ভাব-চিন্তা-কর্মের প্রসার অসম্ভব। কেননা, মানুষের জীবন, পরিবেশ ও পরিবেষ্টনী নির্ভর। সে-পরিবেষ্টনী যার জগৎ-জোড়া, তার জীবনের বিস্তার ও চেতনায় গভীরতা নিশ্চয়ই বেশী। তা হলে তাঁদের রবীন্দ্র-সাহিত্য বিরোধিতাব কারণ অন্য কিছু। আমরা অন্তর্যামী নই। কাজেই সে-কথা থাক।

কিন্তু আমাদের অন্য প্রশ্নও আছে। স্বধর্মী বলেই যদি ভারতের জাতীয় কবি গালেব-হালি-নজরুল পাকিস্তানী মুসলমানদের প্রিয় ও প্রেরণার উৎস হতে পারেন, তাহলে পূর্ব্ব পাকিস্তানের অমুসলমান নাগরিকরাই বা কেন তাদের স্বধর্মী বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ প্রভৃতির সাহিত্য পড়ার সুযোগ ও অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবে! হিন্দু-রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য পড়ে যদি মুসলমানের সংস্কৃতি নষ্ট হয়, তা হলে হিন্দুর সংস্কৃতি নিশ্চয়ই প্রাণ পায়। পাকিস্তানের অমুসলমানেরও যদি সমনাগরিকত্ব স্বীকৃত হয়, তা হলে তাদের স্বতন্ত্র সংকৃতিচর্চার অধিকারও মেনে নিতে হবে। সখ্যাগুরুর স্বার্থে সংখ্যালঘুর অধিকার হরণ নিশ্চয়ই অগণতান্ত্রিক। অতএব, শিশু, ছাত্র, মহিলা, সৈনিক, বুনিয়াদী গণতন্ত্রী প্রভৃতির জন্যে যেমন রেডিয়ো-টেলিভিশনে স্বতন্ত্র আসরের ব্যবস্থা রয়েছে, তেমনি শাক্ত-বৈষ্ণব ও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আসরও থাকা উচিত কেননা, সমদর্শিতাই সুবিচারের পরিমাপক।

মহৎচিত্তের ভাব-চিন্তা জ্যোৎস্নার মতোই সুন্দর, স্নিগ্ধ ও প্রীতিপদ। জ্যোৎস্না কখনো ক্ষতিকর হয় না। ও কেবল আলো ও আনন্দ দেয়, স্বস্তি ও শান্তি আনে আর দূর করে ভয় ও বিষাদ। মহৎসৃষ্টিও মানুষের মনের গ্লানি মুছে দিয়ে চিত্তলোকে আশা

ও আনন্দ জাগায়, প্রজ্ঞা ও বোধি জন্মায়, আর জগতে ও জীবনে লাবণ্যের প্রলেপ দিয়ে বৃদ্ধি করে জীবন-প্রীতি,—দীক্ষা দেয় মনুষ্যত্বে ও মানবতার মহিমাময় চেতনায়। এই কারণেই তো সাহিত্যরস তথা কাব্যরস্ ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর। জীবনে মানুষ' ও প্রকৃতির দেয়া দুঃখ-যন্ত্রণার অন্ত নেই। সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও দর্শন—এসব জীবন-যন্ত্রণা ভুলবার অবলম্বন। তা থেকে বঞ্চিত হলে কি করে বাঁচবে হৃদয়বান চেতনা-প্রবণ মানুষ!

এজন্যেই দেশী লেখক-প্রকাশকের নির্দ্বন্দ্ব ও নির্বিঘ্ন তরক্কী বাঞ্ছায় বিদেশী গ্রন্থের আমদানী বন্ধের আমরা বিরোধী। জীবনের আর আর ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতি ও ব্যবহারিক অসুবিধা স্বীকার করেও দেশী শিল্প ও সম্পদের আনুকূল্য করব। কিন্তু মনের চাহিদার ক্ষেত্রে দইয়ের সাধ ঘোলে মিটানো অসম্ভব। এখানে রসপিপাসা মিটাতে অকৃত্রিম রসেরই প্রয়োজন। জৈব চাহিদা আর মানস-প্রয়োজন অভিন্ন নয়। লে মিজারাবল, ওয়ার এ্যাণ্ড পীস, মাদার, জঁা ক্রিস্তফ কিংবা ঘরে-বাহিরে পড়ার সাধ আনোয়ারা, মনোয়ারা, সোনাভান পড়ে মিটবে না। তা ছাড়া এ যখন আমার সখের ও সাধের পড়া, এখানে বাধ্য করা পীড়নেরই নামান্তর। আমি পড়ি—আমার বৈষয়িক, আর্থিক, জৈবিক ও মানসিক যন্ত্রণা ভুলে থাকবার জন্যে, আর আমার চিত্তের সৌন্দর্য-অন্বেষা ও রসপিপাসা চরিতার্থ করবার জন্যে। আমি পড়ি—আমার আত্মার বিকাশ কামনায়—আমার চেতনার প্রসার বাঞ্ছায়,—আমার মানবিকবোধের উন্নয়ন লক্ষ্যে ও আমার মানবতাবোধের বিস্তার কল্পে।

যা'তে আমি আনন্দ পাইনে, তা দিয়ে আমি কি করে সৃষ্টি করব আমার পলাতক মনের আনন্দ-লোক! কাজেই বইয়ের ক্ষেত্রে স্বাদেশিকতা কল্যাণকর নয়। দেশের ভালো বই পড়ব

তো নিশ্চয়ই, গর্বও বোধ করব তার জন্যে। সে বইয়ের যে প্রতিযোগিতার ভয় নেই, তা বলবার অপেক্ষা রাখে না।

রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথিতে তাঁর সম্বন্ধে কিছু লিখে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা প্রকাশ করব বলেই কলম হাতে নিয়েছিলাম। নানা কথার চাপে মূল বিষয় হারিয়ে গেছে বটে, তবে মূল উদ্দেশ্য হয়তো ব্যর্থ হয়নি। কেননা, রবীন্দ্রসাহিত্য—প্রীতিই এসব বাজে কথা জাগিয়েছে আমার মনে। সব ভাষা আমাদের জানা নেই। বিশ্বের সেরা বইগুলো কখনো পড়া হবে না জীবনে। এইসব বই যে-সব মহৎ মনের সৃষ্টি, সে-সব মনের ছোঁয়াও মিলবে না কখনো। রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বের সে-সব মহৎ মনের প্রতিনিধি রূপে গ্রহণ করে বঞ্চিত আত্মাকে প্রবোধ দিতে চাই আমরা। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাদের চিত্তদূত—মানবতার দিশারী, আমাদের সামনে এক আলোক বর্তিকা, এক অভয়শরণ, এক পরম সান্ত্বনা। আমার ভাষাতেই তাঁর বাণী শুনতে পাই, তাঁর ভাষাতেই আমার প্রাণ কথা কয়—আমার এ সৌভাগ্যের তুলনা নেই। জয়তু রবীন্দ্রনাথ।

মতবাদীর বিচারে রবীন্দ্রনাথ

ইংরেজ-শাসন ও ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে অকালে, অতর্কিতে ও অভাবিতভাবে ঘটল আমাদের মধ্যযুগের অবসান। এ যেন অমাবস্যার নিশীথে হঠাৎ সূর্যোদয়, এ যেন কাঁচা ঘুমে জেগে উঠা। আধুনিক যুগের এই উষালগ্নে চকিতচমকিত জনের মানস স্বাস্থ্যানুসারে কেউ বিমূঢ় কেউ বিরক্ত আবার কেউ বা কৌতূহলী। নবযুগের সূচনায় যাঁকে সপ্রতিভ কৌতূহলী হিসেবে পাই তিনি

রামমোহন। পশ্চিমী চেতনার বাতায়নিক বায়ু সেবনে তাঁর চিত্তলোক প্রসারিত—প্রতীচ্য জ্ঞানরশ্মিতে তাঁর প্রজ্ঞালোক উদ্ভাসিত, তাঁর উদ্যম উদ্দীপ্ত—তাই তিনি চঞ্চল, মুখর ও অক্লান্ত। তাঁর মধ্যেই আমরা প্রত্যক্ষ করি বুদ্ধির মুক্তি—পশ্চিমী জীবন চেতনার প্রথম ফল।

পাশ্চাত্য হাওয়া অনেককাল কোলকাতার চৌহদ্দি অতিক্রম করতে পারেনি, কেননা, ইংরেজী শিক্ষা তখনো পরিব্যাপ্ত হয়নি মফঃস্বল অঞ্চলে। এখানেই আমরা বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত থেকে ইয়ং বেঙ্গল অবধি সবাইকে চেতনা-চঞ্চল দেখি। তখন পাশ্চাত্য নাস্তিক্য দর্শন, যন্ত্রবিজ্ঞান এবং ফরাসী বিপ্লবের মহিমাই ছিল মুক্তবুদ্ধি তরুণদের অনুধ্যেয়। অন্যেরা গ্রহণ-বর্জনের টানা-পোড়েনে দ্বিধান্বিত, কেউ কেউ বিপর্যস্ত। বস্তুত রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, রামকমল, কৃষ্ণকমল, প্রভৃতি কয়েকজন ছাড়া তারুণ্যের অবসানে আর সবাই অর্থাৎ ইয়ং বেঙ্গলেরা হিন্দুয়ানীতেই স্বস্তি খুঁজেছেন ১৮৬০-এর আগে ও পরে। অবশ্য লালবিহারী, কৃষ্ণমোহন, মধুসূদন প্রমুখ খ্রীস্টানই রয়ে গেলেন। তখন ব্রাহ্ম হওয়া আর ব্রাহ্ম থাকাই ছিল চরম আধুনিকতা তথা প্রগতিশীলতা।

এভাবে নাস্তিক্য দর্শন তাঁদের জীবনে হল ব্যর্থ, যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রসাদ ছিল অনায়ত্ত আর ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব রইল অনাগত।

আগে ছিল ভূমি-নির্ভর কড়ির জীবন। এখন নগরে দেখা দিল বেনে সমাজের কাঁচা টাকার লেন-দেন। নগুরে বাঙালী ব্রিটিশ বেনের বেনিয়া-ফরিয়া-কেরানী হয়েই সে-কাঁচা টাকার প্রসাদে ধনী ও মানী। বুর্জোয়া-জীবনের পরোক্ষ স্বাদ পেয়েই তারা ধন্য ও কৃতার্থ।

তারপর ক্রমে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার হল। প্রতীচ্য চেতনা রশ্মি গ্রামেও ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু সে-চেতনা ছিল

গোড়া থেকেই বিকৃত, বিসদৃশ, অস্পষ্ট ও অজাতমূল। বৈশ্য বুর্জোয়ার সাম্রাজ্যের মধ্যযুগীয় ভূমি নির্ভর সামন্তিক সমাজে হঠাৎ করে চালু হল পশ্চিমের শিল্পায়ত সমাজের বুর্জোয়া অর্থনীতি। অকালে ও অস্থানে এই অতর্কিত ব্যবস্থা নিয়ে এল এদেশের নিস্তরঙ্গ আর্থিক জীবনে চরম বিপর্যয়। সাম্রাজিক শোষণ, ঔপনিশেকতা, যন্ত্রজাত পণ্যপ্রাধান্য, অটল সামন্ত ব্যবস্থা, জনগণের অশিক্ষা, বুর্জোয়া জীবনানুরাগ আর মনোজগতে শিক্ষালব্ধ মানবিক আত্মিক জীবন-চেতনার প্রসার প্রভৃতি এক অদ্ভুত পরিস্থিতির জন্ম দিল, যার সমাধানবুদ্ধি ছিল না বিমুগ্ধ, বিমূঢ়, বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত জনগণের।

সামন্ততন্ত্রের বিলোপ, শিল্পবিপ্লব, বেনেবুদ্ধি, সাম্রাজ্যলিপ্সা প্রভৃতি ছিল ইংরেজের জীবন চেতনাজাত ও সমাজ-প্রতিবেশ-পরিস্থিতি প্রসূত স্বাভাবিক জীবনচর্যার প্রসূন। সে-পরগাছা লালনের প্রস্তুতি ছিল না আমাদের দেশে। যে আবহাওয়ায় ও-সবের উন্মেষ ও বৃদ্ধি, সে-আবহাওয়া ছিল অনুপস্থিত ও অজ্ঞাত। তাই এদেশের মাটি ও-সবের কোনটাই গ্রহণ করেনি বটে, কিন্তু সবগুলোর পীড়ন সইতে হয়েছে তাকে। অতএব, ইংরেজী শিক্ষার সূচনায় যে অকাল বসন্তের আভাস দেখা দিয়েছিল, রঙধনুর মতোই মিলিয়ে গেল সে-ক্ষণবসন্ত। বাসন্তী হাওয়া গায়ে লাগার আগেই যেন দেখা দিল হিমেল হাওয়ার দৌরাত্ম্য। কৃত্রিম আশ্বাস এভাবে বিদায় নিল অকৃত্রিম যন্ত্রণার জন্ম দিয়ে।

অজ্ঞ, মূক ও দৈব নির্ভর মানুষের দারিদ্র্য দুঃখ বেড়ে চলল বটে, কিন্তু এটি নিয়তির লীলা ও আল্লা ও আল্লাহর 'মার' বলেই জেনে আত্মপ্রবোধ পাওয়া কঠিন হল না। কাজেই কিসে কি হয়, সে তত্ত্ব রইল অজ্ঞাত।

যারা নগরে তারা ইংরেজ বেনের উচ্ছিষ্ট পেয়েই ধনী ও ধন্য। ব্যবহারিক জীবনের ঐশ্বর্যে, চাকচিক্যে ও ভোগের নতুনতর রীতির

আস্বাদনে তারা বিমুগ্ধ। যাদের বদৌলতে এ প্রাপ্তি, সেই ইংরেজ এখন তাদের প্রমূর্ত ভগবান। ছায়াকে কায়া বলে অনুভব করার বিড়ম্বনা তখনই টের পাওয়ার কথাও নয়।

এঁদের মধ্যে যাঁরা শিক্ষিত,ও মননশীল, তাঁরা জীবনের অসামঞ্জস্য ও অসঙ্গতির ঈষৎ অনুভূত পীড়া ও বেদনা থেকে মুক্তি কামনায় য়ুরোপীয় জীবন প্রতিবেশের আর এক দান বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য ও শিল্পচর্চায় আত্মনিমগ্ন থেকে চিত্তলোক প্রসারে আনন্দিত হতে চেয়েছেন।

য়ুরোপে যন্ত্র-শিল্পের প্রসার, মানসোৎকর্ষ ও বৈশ্য সভ্যতার বিকাশ তথা বুর্জোয়া সমাজের প্রাধান্য ছিল ঐতিহাসিক বিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী অভিব্যক্তি। এবং সে কারণেই স্বতঃস্ফূর্ত। এর কোনটাই অনুকূল ছিল না আমাদের দেশে এজন্যে আমাদের জ্ঞানী-মনীষারা য়ুরোপীয় জীবনের ও যুগের মর্মবাণী স্বরূপে উপলব্ধি করতে হয়েছেন অসমর্থ। তবু অবচেতন প্রেরণায় নতুন যুগ ও পরিবেশকে তাঁরা গ্রহণে ছিলেন উন্মুখ, যদিও সামর্থ্য ও সুযোগ ছিল সামান্যই। ব্যবহারিক জীবনে বুর্জোয়ার ঐশ্বর্য অর্জ্জনের উপায় ছিলনা বলে তাঁদের সাধনা হয় অন্তর্মুখী। এভাবে আর্থিক জীবনে প্রতিহত হয়ে তাঁরা মানবিক ও আত্মিক চেতনা প্রসারে হন প্রয়াসী। ব্যবসায় দ্বারকানাথের অসাফল্য দেশের স্বাদেশিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক চেতনা বৃদ্ধির নিমিত্ত হয়েছে, দেখতে পাই।

য়ুরোপীয় বুর্জ্জোয়া সমাজের ব্যবহারিক ও মানস ঐশ্বর্যে মুগ্ধ লুব্ধচিত্ত বাঙালীর ঘরে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। এই ঘরে সামন্ত জীবনের দাপট ও বুর্জ্জোয়া জীবনের ঐশ্বর্যের আশ্চর্য মিলন হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্বেই য়ুরোপে বুর্জোয়া জীবন বিকাশের পূর্ণতা লাভ করে। তাঁর জন্মোত্তরকালে বুর্জ্জোয়া সমাজের গ্লানি, ত্রুটি ও অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকট হতে থাকে। কিন্তু সে

খবর উনিশ শতকেও এদেশে পৌঁছেনি। কাজেই বুর্জোয়া সমাজ, বেনে বুদ্ধি ও বৈশ্য সভ্যতাই ছিল শিক্ষিত বাঙালীর অনুধ্যেয় জীবন স্বপ্ন। তাতে আবার ঠাকুর পরিবারের সন্তানেরা তখনো বুর্জোয়া জীবনের কোন প্রসাদ থেকেই ছিলেন না বঞ্চিত। ধন-মান-যশ-প্রতিপত্তি যা-কিছু মানবের কাম্য, যা-কিছু সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রয়োজন তা ছিল জন্ম সূত্রেই আয়ত্ত। এ জীবন দেশগত তথা প্রতিবেশ প্রসূত নয়—এ হচ্ছে দেখে শেখা ও পড়ে পাওয়া কৃত্রিম ও অনুকৃত জীবন—এ দেশে অজাতমূল। কাজেই গোটা দেশের প্রয়োজন বা সমস্যার সঙ্গে এ জীবনের যোগ ছিল না—তাই দায়িত্ব ও কর্তব্য—চেতনাও ছিল অনুপস্থিত। কিন্তু নেতৃত্বের সহজ অধিকার বশে তাঁরা সভাপতিত্ব করতেন বটে, কিন্তু তাতে সেবার প্রেরণা ছিল না, ছিল সৌজন্যের আড়ম্বর।

এ হেন পরিবেশের সন্তান রবীন্দ্রনাথের অসামান্যতা এখানে যে তিনি মানুষ অবিশেষের প্রতি প্রীতির অনুশীলনে সাফল্য লাভ করেছিলেন। মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ মানুষের মানবিক গুণে ও আত্মিক উৎকর্ষে আস্থা রাখতেন, অনুকূল আব-হাওয়ায় মানুষের সদ্বুদ্ধি ও সৌজন্যেই পীড়ন ও পাপমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে উঠবে—এ ধারণা বশেই তিনি জাগতিক সব অন্যায়-অনাচারের ব্যাপারে মানুষের বিবেক ও বোধের কাছেই আবেদন জানিয়েছেন। কোন কোন বাস্তব পন্থায় সমাধান-প্রয়াস তাঁর কাছে হয়তো মনে হয়েছে কৃত্রিম ও জবরদস্তীমূলক—যা স্বতঃস্ফূর্ত নয় বলেই টেকসই নয়।

দৈশিক পরিস্থিতিতে ঐতিহাসিক অমোঘতায় যে চেতনার জন্ম, সে চেতনা সমস্যার প্রকৃতি ও সমাধানের উপায় নির্ধারণে সহজেই সমর্থ। কিন্তু যে-চেতনা পড়ে পাওয়া এবং পরিশ্রুতি ও অনুশীলন প্রসূত তা তত্ত্ব-প্রবণই করে—সক্রিয়তা দেয় না। রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধও তাই সংবেদনশীলের মহাপ্রাণতাজাত—সমস্য-বিব্রত দেশকর্মীর নয়।

এজন্যেই তিনি চাষী-মজুরের হিতকামনা করেছেন, তাদের স্বাবলম্বী হবার প্রেরণা দিতেও চেয়েছেন। সমবায় সমিতি গড়েছেন কিন্তু প্রজাস্বত্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করেননি। জমিদার যে পরোপজীবী ও পরস্বাপহারী তা উপলব্ধি করেও জমিদারী প্রথার উচ্ছেদে সক্রিয় হননি।

পীড়নমুক্ত মনুষ্য সমাজ দেখবার জন্যে তাঁর আবেগ ও আকুলতার অন্ত ছিল না। এ ব্যাপারে তাঁর উদ্বেগও ছিল অশেষ। কিন্তু কৃত্রিম বুর্জোয়া পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন বলে সমাধানের বাস্তবপন্থা গ্রহণে ছিলেন অসমর্থ। এজন্যে রবীন্দ্রনাথ হিতকামী দার্শনিক—কর্মী পুরুষ নন।

কৌতূহল থাকলে তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ কার্ল মার্কসকে (১৮১৮–৮৩) চাক্ষুষও করতে পারতেন। তাঁর প্রৌঢ় বয়সে রাশিয়ায় মার্কসের আদর্শ সমাজ মূর্তিলাভ করতেও দেখলেন। অথচ রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় সে-প্রভাব অনুপস্থিত। এমনকি রাশিয়া স্বচক্ষে দেখেও তিনি দ্বিধামুক্ত হননি। মার্কসবাদের প্রয়োগক্ষেত্র হওয়া উচিত ছিল ভারতবর্ষ। কেননা বর্ণে বিন্যস্ত ও দারিদ্র্যে ক্লিষ্ট ভারতেই ছিল সাম্যবাদের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। যেহেতু জনমনে ছিল মধ্যযুগের ঘোর, সামন্ত ও পেটি বুর্জোয়া জীবন ছিল প্রসার-মুখী, এর জ্ঞানী-মনীষীরা ছিলেন বুর্জোয়া-জীবনের মানস-ঐশ্বর্যে বিমুগ্ধ এবং তার উপর ছিল পরাধীনের অসামর্থ্য ও আত্মবিশ্বাসের অভাব, সেহেতু সাম্যবাদ এখানে শিকড় গাড়তে পারেনি। এ আব-হাওয়ার সন্তান মানবতাবাদী মানব-দরদী রবীন্দ্রনাথও তাই চিন্তানায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেননি। মার্কস পেলেন তাঁর অবহেলা। প্রসঙ্গত নজরুল ইসলামের নামও এ সূত্রে মনে পড়ে। স্বাধীনতা ও সাম্যকামী হয়েও তিনি মার্কসবাদ গ্রহণ করেননি। উভয়ের ক্ষেত্রেই কারণ সম্ভবত অভিন্ন। বুদ্ধিগ্রাহ্য তত্ত্ব বা তথ্য কিংবা উপায় বা আদর্শ আবেগগত না হলে তা

জীবনে আচরণীয় হয়ে উঠে না। বিশেষ করে আস্তিক ও আত্মাবাদীরা নাস্তিক্য—ভিত্তিক ধনসাম্যবাদ মানতে চান না। কেননা তাঁদের চেতনায় 'Man does not live by bread alone' তত্ত্বের গুরুত্ব অশেষ। এ শ্রেণীর লোকই 'Animal Farm' জাতীয় গ্রন্থে নিজেদের বোধ ও বিজ্ঞতার সমর্থন পেয়ে আশ্বস্ত ও আনন্দিত হয়। কিন্তু ধনসাম্য যে মানুষের দেহ-মন-আত্মার পার্থক্য মুছে দেয় না কিংবা সত্তার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন বিকাশ যে ব্যহত করে না, ধনসাম্য যে শক্তিসাম্য ঘটায় না এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, প্রজ্ঞা, দর্শন প্রভৃতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিক স্বাতন্ত্র্য ও প্রতিষ্ঠা বুর্জোয়া কিংবা পুঁজিবাদী সমাজের মতোই যে সম্ভব, কেবল তা নয়, ব্যবহারিক, সামাজিক জীবনেও সামর্থ্যানুসারে প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি তথা মান-যশ-প্রভাব বিস্তারের সুযোগ থাকে অক্ষুন্ন—বরং বাড়ে। কেননা ধনে লভ্য কৃত্রিম শক্তির প্রয়োগ এখানে অচল বলেই যোগ্যের প্রতিষ্ঠা লাভ যে সহজ —তা তাঁরা বুঝতে চান না।

ধনসাম্যবাদীরা খাদ্যবস্তুর অভাব, তার উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার ত্রুটিই মানুষের যাবতীয় দুঃখ-যন্ত্রণা, পীড়ন-শোষণ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের উৎস বলে বিশ্বাস করে। জীবিকা তথা খাদ্যাদি প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন-আহরণ যারা করে তারা শ্রমজীবী শ্রেণী আর যারা কৃত্রিম উপায়ে পরোপজীবী তারা শোষক শ্রেণী। এদের সম্পর্ক হয়েছে উৎপাদক ও নিষ্ক্রিয় উপভোগীর, শোষক ও শোষিতের, পীড়ক ও পীড়িতের, বুর্জোয়া ও পলিতারিয়েতের, পুঁজিবাদী ও দরিদ্রের, সামন্ত ও ভূমিদাসের, মালিকের ও মজুরের, ধনী ও নির্ধনের, বেনের ও ক্রেতার, মহাজন ও খাতকের, মেহনতী জনতা ও পরশ্রমজীবী সবলের। কাজেই এদের মধ্যে সচেতন একটা দ্বন্দ্ব, বৈর কিংবা প্রতিপক্ষতা রয়েছে। এর নাম শ্রেণী সংগ্রাম। জীবন চেতনার বিশেষ বিকাশের সঙ্গেই এর শুরু। এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধি, জীবিকার দুর্লভতা, জীবনবোধের প্রসার

ও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে এ সংগ্রাম স্পষ্ট ও তীব্রতর হচ্ছে। অতএব মানুষের কল্যাণ নিহিত রয়েছে উৎপাদনে ও বণ্টনে সমতা বিধান করে প্রত্যেক মানুষের জীবিকার সুব্যবস্থা করার মধ্যেই। তাই মানবিক ভাব-চিন্ত-কর্ম এই শ্রেণী সংগ্রামের অবসানকল্পে উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণ লক্ষ্যে নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক। এ জন্যেই বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতিরও এ সমস্যা সমাধানে হাতিয়ার রূপে ব্যবহারের উপযোগী হতে হবে। এসবের আলাদা কোন উদ্দেশ্য বা সার্থকতা থাকতে পারে না— অন্তত থাকা উচিত নয়। এগুলো আগে পরশ্রমজীবী শোষকদের চিত্তবিনোদনে নিয়োজিত হয়েছে, এখন হবে শোষিতের মুক্তি সংগ্রামের সহায়ক। কাজেই রাষ্ট্রসংস্থার নিয়ন্ত্রণে জনগণের কর্ম ও চিন্তাগত যৌথ প্রয়াসে মানবিক সমস্যার সমাধান ও জীবিকার সুব্যবস্থাই হচ্ছে দৃষ্টিগ্রাহ্য একমাত্র উপায়।

রবীন্দ্রনাথ মার্কসবাদী ছিলেন না, তাঁর রচনা এই সংগ্রামী প্রেরণা প্রসূত নয়। তাঁর মানবতাবোধ ও মানবপ্রীতি বুর্জোয়া উদারতার প্রসূন মাত্র। কাজেই রবীন্দ্রসাহিত্য কালপ্রবাহে দেশের মৃত ঐতিহ্য মাত্র। এঁর মূল্য ইতিহাসের উপাদান হিসেবে—জীবনের উপকরণ রূপে নয়। অতএব বামপন্থীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ ও ও রবীন্দ্রসাহিত্যের কোন উপযোগ মূল্য নেই। এক্ষেত্রে মুসলিম তমদ্দুনবাদীদের মতও স্মরণীয়। তাদের কাছেও রবীন্দ্রসাহিত্য তাদের সংস্কৃতি-বিধ্বংসী। একদলের পক্ষে পরিত্যাজ্য বুর্জোয়া সাহিত্য বলে, অপর দলের কাছে অশ্রদ্ধেয় হিন্দুয়ানী বলে। তাদের ধারণায় রবীন্দ্রনাথ যুগের সৃষ্টি ও যুগধর—যুগোত্তর কিংবা যুগ-প্রবর্তক নন।

২

অতএব রবীন্দ্র সাহিত্যের অপমৃত্যু আসন্ন! অবশ্য কাল সবকিছুকেই গ্রাস করে। রবীন্দ্রনাথও এক সময় প্রাচীন কবি

হবেন, তাঁর অধিকাংশ রচনা মূল্য হারাবে—রবীন্দ্র-মহিমাও হবে ম্লান। ইতিমধ্যেই আধুনিক কবিতা ও গান রবীন্দ্র রচনার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। কিন্তু এত শিগগীর যে রবীন্দ্রনাথ অশ্রদ্ধেয় হয়ে উঠবেন তা ছিল অভাবিত।

অবশ্য এর মধ্যে ভরসার কথা এই যে এ বিরূপতা বিচারের ফল নয়—আদর্শিক প্রতিপক্ষতার স্বাক্ষর মাত্র। আদর্শে অনুগত মানুষের বিচারশক্তি থাকে না—থাকে আচ্ছন্ন মনে advocacy-র প্রবণতা। আদর্শিক প্রয়াসের সিদ্ধিবাঞ্ছায় তারা চালিত হয় আবেগে—বিবেক-বুদ্ধি হয় অবহেলিত।

উৎপাদন ও বন্টন বৈষম্যেই যে সমাজে ধনবৈষম্য ও তজ্জাত অন্যান্য সর্বপ্রকার উপসর্গের সৃষ্টি হয়েছে, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু সচেতন বা অচেতন শ্রেণী সংগ্রাম আধুনিক কালের চেতনাপ্রসূত—পুরাকালে এর উপস্থিতির সাক্ষ্য মেলে না। পৃথিবীর বিভিন্ন যুগের চিন্তানায়ক ও বিপ্লবীদের চেতনায় এর কোন নজির পাইনে। মুসাতে দেখি পাপ-ভীতি, ঈসার মধ্যে পাই ধনভীতি ও প্রীতির কথা, হযরত মুহম্মদের বাণীতে দেখি দাস ও দরিদ্রের প্রতি দাক্ষিণ্যের কথা এবং সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব কিন্তু ধন-সাম্যের নয়। বুদ্ধে রয়েছে জন্ম-জরার ত্রাস আর করুণা ও মৈত্রীর কাঙ্ক্ষা ও ধন-বিরাগ, ব্রাহ্মণ্য ধর্মে পাই লোভের পরিণামভীতি ও ভোগে অনাসক্তির গুরুত্ব। চৈতন্য প্রচার করেছেন বৈরাগ্য ও প্রীতির মহিমা, কনফুসিয়াস কিংবা লাওৎসে (Lao-tse)-ধন-সাম্যের কথা বলেননি। এঁদের সবারই আবেদন ছিল মানুষের আত্মার কাছে, সদ্বুদ্ধির প্রতি। এঁরা সবাই যুগানুগত ও মানবতাবাদী।

সুশৃঙ্খল সমাজ লক্ষ্যে সবাই চেয়েছেন নীতিনিষ্ঠা ও ন্যায়-সত্যের প্রতিষ্ঠা, উৎসাহ দিয়েছেন দয়া-দাক্ষিণ্যে—কিন্তু ধন বৈষম্যের অভিশাপের কথা কারো মুখে শোনা যায়নি। বস্তুত

মার্কস-পূর্ব যুগে উৎপাদন ও বন্টন বৈষম্যই যে মানবিক যন্ত্রণার গোড়ার কথা এবং সামাজিক মানুষের ব্যবহারিক জীবনের ইতিহাস যে শ্রেণীসংগ্রামের ইতিকথা, তা কখনো উচ্চারিত হয়নি। অবশ্য এসব মনীষীর চিন্তা ও কর্মের মধ্যে যদি কেউ শ্রেণীসংগ্রাম এড়ানোরই অবচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করেন, তা হলে আমরা নাচার।

(কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের চিন্তানায়ক রুশো-মন্টেগ-ভল্‌ট্যায়ার কিংবা মার্কস্-এঙ্গেলস্-লেনিন থেকে আজকের দিনের যে কোন দেশের অধিকাংশ কম্যুনিষ্ট নেতা, কর্মী কিংবা চিন্তাবিদ বুর্জ্জোয়া, পাতি বুর্জ্জোয়া এমনকি পুঁজিপতির সন্তান। Zeno থেকে Nicolite খ্রীস্টান বা জোসেফ প্রোঢোন, বাকুনীন বা Hippie অবধি কোন anarchist-ই গরীব ঘরের নন। কাজেই Suffering থেকেই সংগ্রামের শুরু অর্থাৎ শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের সংগ্রাম চিরন্তন—এই তত্ত্বে সত্য নেই। অতএব চিরকাল মানবিক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা বা সংগ্রাম করেছেন মানবতাবাদীরাই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শোষিত দরিদ্ররা এতো প্রচারণার পরেও আত্মস্বার্থে ধনসাম্যতন্ত্রে তথা সমাজতন্ত্রে আজো উৎসাহবোধ করছে না,—এটিই কি শ্রেণী-চেতনা ও শ্রেণীসংগ্রামের অনুপস্থিতির বড় প্রমাণ নয়! এতে বোঝা যায় মানবতাবোধ, মানবপ্রীতি, সংবেদনশীল মন, সংগ্রামী প্রেরণা প্রভৃতি আবেগ যুক্ত হলেই ব্যক্তি-বিশেষ শোষণ-পীড়ন ও দারিদ্র্যমুক্ত মনুষ্য-সমাজ বাঞ্ছা করে কিংবা গঠনে উদ্যোগী হয়।)

পৃথিবীর বিভিন্ন কালের মানবতাবাদী মানবদরদীরা সহানুভূতির আবেগেই সুশৃঙ্খল ও সুখী সমাজ গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন। প্রত্যেকেই দেশ-কালের প্রেক্ষিতে জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে মানুষের সামাজিক তথা আত্মিক কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ করেছেন। ক্রমে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশ হয়েছে, লোক-সংখ্যা বেড়েছে, জীবিকা হয়েছে অপ্রতুল, পৃথিবী হয়েছে সংহত, কাজেই সমস্যাও হয়েছে জটিল—সমাধানের উপায়ও হয়েছে বহু

ও বিচিত্র। মার্কসোত্তর যুগে মার্কসপন্থীর সমাজতন্ত্র তাই মানব-সমস্যা সমাধানের নতুনতম পন্থা। গরীবদেশের সমস্যা সমাধানে সমাজতন্ত্র তথা ধন-সাম্যবাদ প্রবর্তন অবশ্যম্ভাবী—তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এটিও স্থায়ী সমাধান নয়,, ঐতিহাসিক ধারার আধুনিক রূপ মাত্র।

অতএব হযরত ইব্রাহিম থেকে মাও সেতুঙ অবধি সবাই একই লক্ষ্যে কাজ করে এসেছেন, পার্থক্য কেবল পথ ও পদ্ধতির। সবাই মানবদরদী ও মানবতাবাদী। সবার জ্ঞান-বুদ্ধি অভিজ্ঞতা অভিন্ন ছিল না, কাজেই উপায়ও এক থাকেনি। মানুষের সমস্যাও পরিবেশগত। তাই সমাধান পদ্ধতিও হয়েছে স্থানিক ও কালিক। তাই কারো কল্যাণ প্রচেষ্টাই স্থান-কালের সীমা অতিক্রম করে সর্ব্বমানবিক হয়নি।

রবীন্দ্রনাথও মানবতাবাদী। তিনি মুখ্যত কবি-মনীষী—কর্মী নন। তাঁর কর্তব্য ছিল মানুষকে আত্মিক চেতনায় প্রবুদ্ধ করা—বাস্তবে রূপায়ণ নয়। আবহমান কালের ধারায় তিনি যুগ প্রতিনিধি। তাঁর আবেদন মানুষের সদ্‌বুদ্ধি ও বিবেকের কাছে। কম্যুনিষ্টদের আবেদনের লক্ষ্যও তাই। কম্যুনিষ্ট বল প্রয়োগে বিশ্বাসী। মানবতাবাদী কবি স্বতঃস্ফূর্ত কল্যাণ-বুদ্ধির বিকাশে আস্থাবান। সামন্তবাদী, ঔপনিবেশিকতাবাদী, পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্য-বাদী, অধ্যাত্মবাদী প্রভৃতি সংজ্ঞায় চিহ্নিত করে কোন মানবতা-বাদীকে বিচার করা অবিচারের নামান্তর। নিজের মত-পথকেই কেবল একমাত্র ও অভ্রান্ত ভাবা অসহিষ্ণুতা ও মানব-মনীষার প্রতি অশ্রদ্ধা তথা ব্যক্তিক সত্তার অবমাননার নামান্তর।

রবীন্দ্রনাথ নিজের সুদীর্ঘ জীবনে সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র তিনটেই স্বচক্ষে দেখেছেন—বুঝবার শক্তিও তাঁর নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু তিনি জানতেন আত্মিকবোধ না জন্মালে বাহুবলে আর্থিক-সাম্য স্থাপন স্থায়ী হতে পারে না। বুদ্ধির সঙ্গে আবেগের যোগ

না ঘটলে তা স্বভাবে পরিণতি পায় না। স্বেচ্ছাসম্মতি আর জবরদস্তির 'সায়' এক বস্তু নয়।

কবি-মনীষী রবীন্দ্রনাথ মানুষের প্রতি মানুষকে শ্রদ্ধাবান করে তুলবার সাধনাই করেছেন, কল্যাণ ও সদ্বুদ্ধি প্রসূত স্বেচ্ছাসম্মতি দানে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছেন মানব কল্যাণকামী স্বেচ্ছা সৈনিক। তাঁর এই জীবন-দৃষ্টিকে বুর্জোয়া উদারতা ও দাক্ষিণ্য বলে উপহাস করা অসৌজন্য।

গল্পে-প্রবন্ধে-নাটকে-কাব্যে কত ভাবে তিনি দ্বেষ-দ্বন্দ্ব, বিভেদ-বিরোধ, শোষণ-পীড়ন ও অপ্রেম-অশ্রদ্ধামুক্ত সমাজ-চিন্তা জাগানোর চেষ্টা করেছেন! ন্যায় যুদ্ধে কত আহ্বান জানিয়েছেন তিনি!

তবু তা কারো 'ism'-সম্মত হল না বলে তাদের কাছে তা অকেজোও অশ্রদ্ধেয়। কাজেই রবীন্দ্রসাহিত্য আজ তাদের কাছে না ঘরকা না ঘাটকা! মানুষকে ভালোবাসার এ এক অভিনব বিড়ম্বনা!

রবীন্দ্র প্রসঙ্গে

রবীন্দ্রসাহিত্য আমাদের সংস্কৃতি-বিধ্বংসী বলে যে কথা উঠেছে, যে আশঙ্কা আমাদের জাতি-প্রাণ বুদ্ধিজীবীদের মনে জেগেছে, তা নিরসনের জন্যে রবীন্দ্র সাহিত্যানুরাগী আর একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। তাঁদের সদিচ্ছা নিশ্চয় শ্রদ্ধেয়। তাঁদের কল্যাণকামী হৃদয়ের অকৃত্রিম আকুলতা সহানুভূতিও জাগায়। কিন্তু তাঁদের সদিচ্ছা সৎসাহসপুষ্ট নয়—এবং সদিচ্ছার সঙ্গে সৎসাহসের যোগ না হলে সাফল্য থাকে অসম্পূর্ণ; এমনকি স্থান-কাল বিশেষে সাফল্য অর্জন হয় অসম্ভব।

রবীন্দ্রসাহিত্য যে আমাদের অকল্যাণের নয় বরং আমাদের মনুষ্যত্ব ও মানবতাবোধ বিকাশের সহায়ক—এই কথা বুঝিয়ে বলবার জন্যে তাঁরা যে-সব যুক্তির অবতারণা করেন আর যে-সব

তথ্য ও তত্ত্ব উপস্থিত করেন, তাতে তাঁরা তাঁদের অজ্ঞাতেই রবীন্দ্রনাথকে করেন অপমানিত আর নিজেরা বরণ করেন কৃপাজীবীর লজ্জা।

তাঁরা প্রতিবাদের দ্বারা প্রতিরোধ করতে চান না, তাঁরা অনুগ্রহ-কামীর মন-বুদ্ধি নিয়ে হুজুরের দরবারে তদবীরে নিরত। বিরোধীদের ক্ষমা ও প্রশ্রয়বাঞ্ছায় তাঁরা পেশ করেন আবেদন-নিবেদন, যাচ্ঞা করেন কৃপাদৃষ্টি। তাই তাঁরা সভায় ও লেখায় বলে চলেছেন, রবীন্দ্রনাথের পিতা ছিলেন হাফিজের কাব্যের অনুরাগী, রবীন্দ্রনাথে বর্তেছে সে-প্রভাব, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম, আর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সূফীকবি, মুসলিম বিদ্বেষ তাঁর ছিল না, নিন্দাও করেননি কোথাও। তিনি টুপি ইজার আলখাল্লা পরতেন, আর সযত্নে লালন করতেন দাড়ি। মোঘলাই পরিবেশ ছিল ঠাকুর পরিবারে। অতএব রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রায় তৌহিদবাদী ও আধা মুসলমান। কাজেই হুজরান দয়া করে আমাদের শুনতে দিন রবীন্দ্রসঙ্গীত, পড়তে দিন রবীন্দ্রসাহিত্য। এখন মহামহিমদের সুমর্জি, ক্ষমাসুন্দর হুকুম ও সদয় প্রশ্রয়ের অপেক্ষায় রয়েছেন তাঁরা আসামীর দুরু দুরু বুকের কাঁপুনি ও আশা নিয়ে। নির্দোষ বলে প্রমাণ করার জন্যে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ভীরুহৃদয়ের এই সদিচ্ছা রবীন্দ্রনাথকে অপমানিত করতে বাকি রাখল কি? বরং রবীন্দ্র-বিরোধীরাই তাঁকে যথার্থ সম্মান দেন। কেননা, তাঁর অমিত শক্তি ও সর্বগ্রাসী প্রভাব স্বীকার করেন বলেই তাঁরা ভীত। তাঁরা সূর্যের প্রচণ্ড তাপ স্বীকার করেন বলেই অন্ধকারের প্রাণীর মতো আত্মরক্ষার ভাবনায় বিচলিত।

মহৎমনের স্পর্শকামী এই সব মানবতাবাদী যদি রবীন্দ্রসাহিত্য বিরোধিতা প্রতিরোধ প্রয়াসে সৎসাহসের সঙ্গে প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসতেন, তাহলে তাঁদের মুখে শোনা যেত অন্য যুক্তি।

তাঁরা বলতে পারতেন—আমাদের কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান থেকে ইসলামী শাস্ত্র অবধি সব বিদ্যাই দান করা হয় বিদেশী, বিজাতী ও বিধর্মী য়ুরোপীয় বিদ্বানদের গ্রন্থ পড়িয়ে। চীন-রাশিয়ার নাস্তিক্য সাহিত্যই আজ পাকিস্তানে জনপ্রিয় পাঠ্য। আমেরিকার যৌন-গোয়েন্দা সাহিত্যে আজ বাজার ভর্তি। বিদেশীর, বিজাতির ও বিধর্মীর সাহিত্য অনুবাদের জন্যে দেশে গড়ে উঠেছে সরকারী প্রতিষ্ঠান। খ্রীস্টান য়ুরোপের আদর্শে জীবন রচনার সাধনায় আজ সারাদেশ উন্মুখ। য়ুরোপীয় আদলে জীবন-যাপন করে অসংখ্য-লোক কৃতার্থমন্য। য়ুরোপ আজ কামনার স্বর্গলোক। তাছাড়া ইমরুল কএস থেকে হাতেমতাই, এবং দারানওশেরোয়াঁ থেকে রুস্তম অবধি সব আরব-ইরানী কাফেরই আমাদের শ্রদ্ধেয়। এতসব উপসর্গ বেষ্টিত হয়েও আমাদের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি বিলোপের আশঙ্কা করিনে। কেবল দেশী কাফের রাম থেকে রবীন্দ্রনাথকেই আমাদের ভয়। অথচ এই রাম-রবীন্দ্রনাথের দেশেই তাঁদের জ্ঞাতিরাই বরণ করেছে ইসলাম। এঁদের দেখে-শুনে-জেনেও বিচলিত হয়নি মুমিনের ইমান। পাশে থেকেও প্রভাব যে পড়েনি তার প্রমাণ আজকের মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। নাহলে হাজার বছরের পুরোনো মুসলমান সন্তানদের ধর্ম-সংস্কৃতি হারানোর এই ভয় কেন?

অতএব, রবীন্দ্রবিরোধিতার মূলে সংস্কৃতিধ্বংসের আশঙ্কা নয়, রয়েছে অন্য কিছু। তা যদি রাজনৈতিক স্বার্থ কিংবা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিষয়ক হয়, তা হলে আমাদের বুঝিয়ে বলেন না কেন তাঁরা? আমাদের স্বাজাত্যবোধ দেশপ্রেম কিংবা রাষ্ট্রানুগত্য কি কারো চেয়ে কম যে তাঁরা আমাদের প্রতি সন্দিহান হয়ে আমাদের অপমানিত করবার অধিকার নেবেন! আমরা যদি উপলব্ধি করতে পারি কিংবা তাঁরা যদি আমাদের বুঝিয়ে দেন যে রবীন্দ্র-সাহিত্য আমাদের রাজনীতি ও রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর, তা হলে

ডক্টর আহমদ শরীফ

আমরা নিশ্চয়ই বর্জ্জন করব রবীন্দ্রসাহিত্য। দেশের স্বার্থে এমনকি প্রয়োজন হলে নিজের সন্তানকেও বর্জ্জন করতে রাজি। কিন্তু এ তো হুকুমে হবার কাজ নয়—জানিয়ে বুঝিয়ে দিন। আমরা কি এতই পাপাত্মা যে দেশের স্বার্থ বুঝব না! —এমনি সব তথ্য, তত্ত্ব ও যুক্তির অবতারণা করতে পারতেন তাঁরা। আর যদি শ্রেণীস্বার্থের কারণেই ঘটে রবীন্দ্রবিরোধিতার উদ্ভব, তাহলে আমাদের স্বার্থেই প্রতিকার প্রয়োজন। সে-প্রতিকারের পথে যদি আঘাত নেমেই আসে, তবে ধৈর্য, দৃঢ়তা ও সাহসের সঙ্গে সইতে হবে সে আঘাত। কেননা, ছলনা দিয়ে ছলনার প্রতিকার হয় না। পরস্বাপহারীর হৃদয় গলেনা অনুনয়ে। কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে রাখলেই শুকায় না দুষ্টক্ষত কিংবা বন্ধ হয় না। মিথ্যার প্রলেপে ঢাকা যায় না মিথ্যাকে। বেদনা সয়েই ব্যবস্থা করতে হয় বেদনা উপশমের। সমস্যা এড়িয়ে চললে সমস্যা বাড়েই—সমাধান হয় না। অস্ত্রোপচারে যন্ত্রণা বাড়িয়ে যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হতে হয় কোন কোন রোগে। এরূপ ক্ষেত্রে কল্যাণবুদ্ধি ও মমতাই যোগায় নির্মম হবার প্রেরণা। আপাতনিষ্ঠুরতা অনেকক্ষেত্রেই গভীর করুণার পরিচায়ক।

রবীন্দ্রনাথ মানবতার প্রমূর্ত প্রতিনিধি। মানব কল্যাণের দিশারী। আমাদের গরজেই আমরা রবীন্দ্র সাহিত্যের পাঠক। সে-গরজ যদি হয় গুরুতর, তা হলে আমাদের প্রতিকার-প্রয়াসও হবে তীব্র। এভাবে সখের প্রেরণার সৌখিন ক্ষোভ ও বেদনা প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথকে অপমানিত করবার অধিকার নেই আমাদের।

প্রাচীন বরেন্দ্রীর মা ও শিশুমূর্তি

মুখলেসুর রহমান

৭

প্রাচীন পাক-ভারতীয় ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় নারীর বিভিন্ন রূপকে বিষয়বস্তু হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে অকৃপণভাবে। বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু প্রভৃতি ধর্মে মূর্ত উপাসনার প্রয়োজনে কল্পিত ও সৃষ্ট হয়েছে অসংখ্য দেব দেবীর প্রতিমা। স্ত্রী দেবতাদের চিত্রায়ণ করা হয়েছে তাঁদের প্রকৃতি অনুযায়ী সৌম্য বা ঘোর রূপে, নানা ভঙ্গীতে। কোন প্রতিমায় তাঁরা হাস্যমুখী, বরদা, অভয়া; কোনটায় বিকট-দর্শনা, ভয়ঙ্করী; আবার কোন ভাস্কর্যে তাঁরা শিশুক্রোড়ে মাতৃত্বের মহিমায় সমুজ্জ্বল।

অতি আদিম কালে, খাদ্য উৎপাদকের স্তরে উন্নীত হবারও বহু পূর্বে, মানব সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। প্রজনন ও সন্তান পালনে নারীর অত্যাবশ্যকতার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবারে মা-ই ছিলেন সর্বেসর্বা। খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর গর্ভ ধারণের ক্ষমতা, অপত্য পালনে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ততা, পরিবারের সকলের ভরণপোষণ, রক্ষণাবেক্ষণ কার্যে তাঁর দক্ষতা প্রভৃতি গুণের দরুন তাঁর উপর আরোপিত হয় অবোধ্য, রহস্যময় এক অদৃশ্য শক্তির। জনয়ত্রী আর পালয়ত্রীর দ্বৈত ভূমিকায় ক্রমে ক্রমে নারীর সমীকরণ হয় পৃথিবীর সঙ্গে। অতি পুরাতন প্রস্তর যুগে তৈরী এবং খুব সম্ভব দেবীরূপে পূজিত কতকগুলি নগ্ন স্ত্রীমূর্তির স্ফীত উদর, সুবিশাল স্তন আর নিতম্বের বৈপুল্য আপাতদৃষ্টিতে নিতান্ত স্থূল বলে মনে হলেও বহু পণ্ডিতের মতে এই বৈশিষ্ট্যগুলি মাতৃত্ব সূচক। বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতার

ডক্টর মুখলেসুর রহমান, অধ্যক্ষ, বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি মিউজিয়ম, রাজশাহী

ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত অনুরূপ মাতৃত্বের চিহ্নযুক্ত স্ত্রীমূর্তির প্রাচুর্য সত্যই বিস্ময়কর। বোধ হয় এই কারণেই একদল পণ্ডিত অনুমান করেছেন সুদূর অতীতে ঐশী শক্তির প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল খুব সম্ভব নারীর মাতৃরূপের মাধ্যমে*। প্রাচীনকালে নিকট. ও মধ্য-প্রাচ্যের ধর্মকর্মে স্ত্রীদেবতাদের যে বিশেষ প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়, সেটা মূলত তাদের মাতৃত্ব সূচক ভূমিকার দরুন। ইশতার, Cybele, Demeter বা Gaea প্রভৃতি 'মাদার গডেসে'র মাতৃমূর্তি অবশ্য পাওয়া যায়নি, কিন্তু প্রাচীন মিশরীয় ভাস্কর্যে এঁদের সমগোত্রীয় দেবী 'আইসিস্'কে দেখান হয়েছে তাঁর পুত্র Horusকে কোলে নিয়ে বা তাকে স্তনদানরত অবস্থায়। Hathor নাম্নী আর একজন মিশরীয় মাতৃকার সাক্ষাৎ আমারা পাই প্রাচীন ভাস্কর্যে, যেখানে তাঁকে অঙ্কিত করা হয়েছে গাভীরূপে*।

শিশুক্রোড়ে নারীর মাতৃমূর্তির কল্পনা প্রেরণা জুগিয়েছে সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশের শিল্পীকে। নারীর মাতৃত্বকে স্পষ্টতর করে প্রকাশ করার জন্য শিশুসহ তার মূর্তি নির্মাণের রেওয়াজ পাক-ভারতের বহু প্রাচীন কালের। প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্রে, বিশেষ করে হরপ্পা আর মোএনজোদারোতে, প্রত্নতাত্ত্বিকেরা আবিষ্কার করেছেন পোড়ামাটির তৈরী অগণিত স্ত্রীমূর্তি; এগুলির অনেকের ক্রোড়ে আছে এক বা একাধিক শিশু। জনৈক পণ্ডিতের মতে এই ক্ষুদ্রাকার স্ত্রী মূর্তিগুলি উর্বরতা সাধিকা; অপর একজনের ধারণা হল এগুলি খুব সম্ভব শিশু ও মাতৃমঙ্গলের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট কোন স্ত্রী দেবতার পূজায় ব্যবহৃত হ'ত, সন্তান কামনার বা সন্তান লাভের জন্য কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ। বর্তমান-

---

* Mury, M. A: The Genesis of Religion, London, 1963, pp. 61—62.

* পরম পুরুষ হতে উদ্ভূত প্রকৃতির বা নারীর বিভিন্ন রূপের মধ্যে গাভীরূপ অন্যতম। বৃহদারণ্যক উপনিষদ—১-৪-৪, এ প্রসঙ্গে তুলনীয়।

কালে পীরের দরগায় মাটির তৈরী গাজীর ঘোড়া বা তুলতুল রেখে আসার রীতি এ জাতীয় ঐতিহ্য বাচক বলে আমরা মনে করি। হরপ্পা ও মোএনজোদারোর স্ত্রীমূর্তিগুলির মধ্যে কতকগুলি আবার স্ফীতোদরা। মার্শালের মতে সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে দেবতার পূজায় এই গর্ভবতী স্ত্রীমূর্তিগুলি উৎসর্গ করা হ'ত, তারা বিশেষ ঐন্দ্রজালিক গুণসম্পন্ন এই বিবেচনায়।

শিশুক্রোড়ে স্ত্রীমূর্তিগুলি 'মাদার গডেসে'র প্রতিমা কিনা নিশ্চিতভাবে জানা না গেলেও ঐ দেবীর পূজার সঙ্গে তারা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল বলেই অধিকাংশ পণ্ডিতের অভিমত। হরপ্পা ও মোএনজোদারো ছাড়াও পাক-ভারতের বহু প্রাচীন স্থানের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এ জাতীয় মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। তক্ষশিলায় প্রাপ্ত মৌর্যযুগের কয়েকটি স্ত্রীমূর্তিকে মার্শাল চিহ্নিত করেছেন দেবী প্রতিমা বলে ; এগুলির প্রত্যেকটি বামক্রোড়ে শিশুসহ দণ্ডায়মান। মহেত বা প্রাচীন শ্রাবস্তীতে অনুরূপ কয়েকটি স্ত্রীমূর্তি পাওয়া গেছে। গুপ্ত আমলের এই মূর্তিগুলির প্রত্যেকটির বুকের বামদিকে সংলগ্ন আছে একটি করে শিশু। এলাহাবাদের সন্নিকটে ভিটায় মার্শাল আবিষ্কার করেছেন গুপ্তযুগের তিনটি পোড়ামাটির ম্যাডোনা, এদের একজন দাঁড়িয়ে আছে সন্তানকে দুহাতে ধরে, অপর দুজনের সন্তান তাদের বামহাতে ধরা। লৌঢ়িয়নন্দনগড়ে পাওয়া গেছে এ জাতীয় কয়েকটি স্ত্রীমূর্তি। শিল্পকর্মের নিদর্শন হিসেবে এগুলি স্থূল, এই নিদর্শনগুলির প্রত্যেকটির বামস্তনে সংলগ্ন আছে দেখা যায় এক বা একাধিক শিশুসন্তান। এই অঞ্চলে প্রাপ্ত পোড়ামাটির প্রাচীন স্ত্রীমূর্তির সংখ্যাধিক্যে জনৈক প্রত্নতাত্ত্বিক অনুমান করেন এই মা ও শিশুর মূর্তিগুলি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হত 'মাদার গডেস্' বা উর্ব্বরতা সহায়িকা দেবীর পূজায়। এলাহাবাদের অনতিদূরে ঝুসিতে খনন কালে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা পেয়েছেন শুঙ্গ বা কুষাণ আমলের সন্তান ক্রোড়ে মাতৃমূর্তি। খৃষ্টীয় ৬ থেকে ৭ শতকের মাঝামাঝি তৈরী

বলে পণ্ডিতেরা মত প্রকাশ করেছেন অহিচ্ছত্রের ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার করা অনেকগুলি মা ও শিশুমূর্তি সম্বন্ধে। ছাঁচে তৈরী এই নিদর্শনগুলির কয়েকটিতে শিশু মার বক্ষসংলগ্ন, বাকীগুলিতে দু'হাতে বা শুধু বামহাতে ধরা।

পোড়ামাটির তৈরী প্রাচীন ম্যাডোনা মূর্তি নিঃসন্দেহে প্রেরণা যুগিয়েছে পরবর্তী কালে পাকভারতীয় প্রস্তর ভাস্কর্যে অনুরূপ বিষয়-বস্তুর রূপায়ণে। আমাদের এই উক্তিকে সমর্থন করছে এক বা একাধিক শিশুসন্তানসহ স্ত্রীলোকের মাতৃত্বসূচক প্রস্তরমূর্তির প্রাচুর্য। গঠন বৈশিষ্ট্যের দরুন এই মূর্তিগুলির দেবত্ব যেমন স্পষ্ট প্রতীয়মান, তেমনি সহজবোধ্য এদের জনপ্রিয়তা এদের সংখ্যাধিক্য থেকে। 'মাদার গডেস' বা মাতৃকা উপাসনার সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাবে বৌদ্ধ ধর্মের অনুরূপ দেবী হারীতির মূর্তি থেকে, কারণ পাকভারতের প্রাচীন ভাস্কর্যে হারীতি সর্বদাই রূপায়িত হয়েছেন সসন্তান মাতৃরূপে। মথুরায় প্রাপ্ত কুষাণ যুগের কতকগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু হচ্ছে পাশাপাশি উপবিষ্ট একজন পুরুষ ও একজন নারী। নারীমূর্তির দক্ষিণ হস্তে আছে একটি ফুল আর তার বাম জানুর উপর একটি শিশু। এ জাতীয় ক্ষুদ্রাকৃতি প্রস্তরমূর্তির প্রাচুর্য দৃষ্টে অনুমান করা কঠিন নয় যে এদের উপাসনা ছিল লোকায়ত ধর্মের অঙ্গীভূত। মথুরা মিউজিয়মে রক্ষিত এ শ্রেণীর একটি প্রস্তরমূর্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ জোড়হস্ত ভক্তদের প্রতিকৃতি উপরোক্ত অনুমানের সমর্থক। গান্ধার অঞ্চলে পাওয়া গেছে একাধিক শিশু পরিবৃতা হাস্যমুখী, স্বাস্থ্যবতী জনৈকা দেবীর অসংখ্য প্রতিমা। হারীতির প্রতিমা বলে অভিহিত এদের দুটি নিদর্শন দেখা যাবে লাহোর মিউজিয়মে এবং একটিকে লণ্ডনে ব্রিটিশ মিউজিয়মে। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত মূর্তিটির অনুরূপ একটি নিদর্শন প্রদর্শিত হয়েছে মথুরা মিউজিয়মে। মুণ্ডহীন এই উপবিষ্ট স্ত্রীমূর্তিটির ক্রোড়ে আছে একটি এবং তার দু-পায়ের

বেষ্টনীর মধ্যে আরও চারজন শিশু। পাদপীঠেও খোদাই করা আছে একদল শিশুমূর্তি। মথুরা মিউজিয়মে স্থানান্তরিত হবার পূর্বে একশত এক সন্তানের গর্ভধারিণী কৌরবজননী গান্ধারীর প্রতিমা জ্ঞানে এই মূর্তিটিকে গ্রামাঞ্চলে ধুমধামের সঙ্গে পূজা করা হত বলে জানা গেছে ১৫।

কাসিয়া বা কুশীনগরে প্রাপ্ত একটি বৃহদাকার পোড়ামাটির ফলক দৃষ্টে মনে হয় প্রাচীন ভারতে এক বা একাধিক শিশুসহ স্ত্রীমূর্তিকে 'মাদার গডেসে'র প্রতিমা বিবেচনা করে পূজা করা হত। এই ফলকের উৎকীর্ণ স্ত্রীমূর্তিটিকে পার্ব্বতী, আর মোদক নিয়ে যুধ্যমান শিশু দুজনকে গণেশ ও কার্তিকেয় বলে সনাক্ত করা হয়েছে ১৬। খৃষ্টীয় ৬ শতকে তৈরী এবং রাজস্থানে উদয়পুর থেকে ৩০ মাইল দূরবর্তী তানেশ্বর মহাদেব মন্দিরে দেবীরূপে পূজিত শিশুসহ ১৫টি দণ্ডায়মান মাতৃমূর্তির কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে ১৭। মাথার পিছনে প্রভামণ্ডলী সমন্বিত, ঈষৎ ত্রিভঙ্গঠামে দণ্ডায়মান এই মূর্তিগুলির দু'টিকে দেখান হয়েছে তাদের বক্ষসংলগ্ন শিশুসন্তানকে স্তনদানরত অবস্থায়, এবং একটিকে বাম ক্রোড়ে শিশুসহ। অবশিষ্ট কয়েকজনের শিশুকে দেখা যায় তাদের দক্ষিণে বা বামে দাঁড়ান অবস্থায়। এই নারীমূর্তিগুলি মাতৃকাদের প্রতিমা বলে কোন কোন পণ্ডিত দাবী করলেও এদের মাথার পিছনকার প্রভামণ্ডলী ব্যতীত এদের দেবত্বসূচক আর কোনরূপ চিহ্ন নেই। মূর্তিগুলির প্রত্যেকটিই বিপুলশ্রোণী; পীনোন্নত পয়োধরা, পূর্ণযৌবনা স্ত্রীলোকের, ১৬—১৭ শতকের য়ুরোপীয় চিত্রকর রুবেন্স্-এর মডেলদের অনুরূপ। কিন্তু যথেষ্ট আকর্ষণীয় মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এদের দেহসৌষ্ঠব কামগন্ধ-বিবর্জিত, কারণ তা হচ্ছে প্রাচুর্য আর সমৃদ্ধির প্রতীক, মাতৃত্বের সুষমামণ্ডিত।

পাল ও সেন আমলের কতকগুলি মা ও শিশুর প্রস্তরালেখ্য

আমাদের বিবেচনায় উপরোক্ত সন্দেহজনক দেবত্ববিশিষ্ট ম্যাডোনা মূর্তিগুলির সমগোত্র। বিহার ও বঙ্গদেশের বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী থেকে সংগৃহীত মধ্যযুগীয় ভাস্কর্য শিল্পের এই নিদর্শনগুলি কলকাতা, ঢাকা ও রাজশাহী মিউজিয়মে প্রদর্শিত হয়েছে। এগুলির বিষয়বস্তু হচ্ছে ১৮ নকশাবহুল, মূল্যবান আরামদায়ক পর্যঙ্কে বাম দিকে পাশ ফিরে শায়িতা একজন মহিলা; তাঁর দক্ষিণ হস্তে ধরা একটি পদ্ম। মহিলার সুসজ্জিত মস্তক উপাধানের উপর ঈষৎ উত্থিত অবস্থায় তাঁর বাম হস্তের তালুতে ন্যস্ত। তাঁর দক্ষিণ চরণ রাখা আছে বাম চরণের উপর আড়াআড়িভাবে। একজন দাসীজাতীয় স্ত্রীলোক মহিলার বাম চরণের পরিচর্যায় নিযুক্ত। পর্যঙ্কের উপর মহিলার বাম স্তনের সন্নিকটে শায়িত একটি শিশু, তার উভয় চরণ একটি পদ্মের উপর স্থাপিত। পালঙ্কের শিয়রে ও পাদদেশে দণ্ডায়মান আরও দু'জন কিঙ্করী বীজনী আর চামর হস্তে মহিলার সেবায় ব্যস্ত। পর্যঙ্কের পশ্চাতে প্রাচীরগাত্রে খোদাই করা আছে কার্তিকের ও গণেশের মূর্তি, আর একটি শিবলিঙ্গ। এ জাতীয় আর কয়খানি আলোখ্য নবগ্রহ মূর্তিও উৎকীর্ণ করা হয়েছে দেখা যায়।

রাজশাহী, ঢাকা ও কলকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে রক্ষিত মা ও শিশু-মূর্তিগুলির উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহের আলোচনা প্রসঙ্গে স্বর্গীয় ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহিলাটিকে পার্ব্বতী আর তার পার্শ্বে শায়িত শিশুকে শিবের সদ্যোজাত মূর্তি বলে দাবী করেছেন ১৯। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তাঁর উক্তির সমর্থনে উপস্থাপিত যুক্তিগুলি গ্রহণযোগ্য নয় একাধিক কারণে। ডঃ ভট্টশালীর মতে মহিলাটি পার্ব্বতী ব্যতীত আর কেউ নন, কিন্তু শিশুটিকে কার্তিক বা গণেশ বলে গণ্য করা যাবে না, যেহেতু উভয়েরই প্রাপ্তবয়স্ক রূপ এই আলেখ্যে স্থান পেয়েছে! কিন্তু যদি এই কারণেই আলোচ্য ভাস্কর্যের শিশুটিকে কার্তিক বা গণেশের প্রতিকৃতি বলে বিবেচনা করা সম্ভব না হয়, তাহলে

এদের উভয়ের পিতা বলে সুপরিচিত শিবের সদ্যোজাত রূপ বলে ঐ শিশুকে গণ্য করতে হবে কোন্ যুক্তিতে? উপরন্তু, শিব পূর্ব্বে থেকেই কি এ জাতীয় প্রস্তরালেখ্যে উপস্থিত নেই তাঁর প্রতীক লিঙ্গের মাধ্যমে?

ডঃ ভট্টশালী তাঁর গ্রন্থে লিঙ্গপুরাণের যে কাহিনীটি উদ্ধৃত করেছেন, তার সাহায্যে আলোচ্য ভাস্কর্যের শিশুমূর্তিকে শিবের সদ্যোজাত রূপ বলে বুঝা যায় না। এই কাহিনীতেই বলা হয়েছে শিব ব্রহ্মার ধ্যান-সম্ভূত, কিন্তু ঐ অবস্থায় জাত শিবের সঙ্গে পার্ব্বতীর কোনরূপ সম্পর্কের ইঙ্গিত নেই এখানে।

দেবীভাগবতে (২০) দেখা যায় শিব পার্ব্বতীকে মাতৃসম্বোধন করেছেন। দেবীপুরাণে (২১) শিব পার্ব্বতীর নিকট মিনতি করছেন তাঁকে পুত্রবৎ দেখার জন্যে, কিন্তু উভয় পুরাণের কোথাও এমন কিছু বলা নেই যার সাহায্যে আলোচ্য ভাস্কর্যের মা ও শিশুকে যথাক্রমে পার্ব্বতী এবং শিবের সদ্যোজাত মূর্তি বলে স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে। ডঃ ভট্টশালীর উদ্ধৃত ব্রহ্ম-পুরাণের কাহিনীর অনুরূপ লিঙ্গপুরাণের একটি কাহিনী (২২) পাঠে জানা যায় পার্ব্বতীর সঙ্গে তাঁর বিবাহের ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্তে তাঁকে পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্যে শিব কিভাবে শিশু-মূর্তি ধারণ করেন। উভয় কাহিনীতে পার্বতী বর্ণিতা হয়েছেন বিবাহ-মণ্ডপে উপস্থিত বহু দেবদেবী, তাঁর পিতামাতা, আর সখীদল পরিবৃতা বধূবেশে সজ্জিতাবস্থায়, কিন্তু এই প্রস্তরালেখ্যগুলিতে যে দৃশ্য উৎকীর্ণ হয়েছে তা হল একটি শয়ন কক্ষের, বিবাহমণ্ডপ বা পরিণয় উৎসবের সঙ্গে তার বৈসাদৃশ্য যেমন প্রকট, পর্যঙ্কে শয়ান মহিলার সঙ্গে পার্ব্বতীর বধূরূপের পার্থক্যও তেমনি সুস্পষ্ট। লিঙ্গপুরাণের আর একটি কাহিনীতে আছে শিবের শিশুরূপ ধারণ করে দেবীর স্তনদুগ্ধ পান করার কথা, (২৩) কিন্তু এই ঘটনা কালে পার্ব্বতী দেবী নন, এখানে তিনি বর্ণিতা হয়েছেন ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণা, বিকটদর্শনা,

ভয়ঙ্করী কালীরূপে যার সঙ্গে আলোচ্য মা ও শিশুমূর্তির সুদর্শনা মহিলার নেই বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য।

ডঃ ভট্টশালীর মতানুযায়ী মা ও শিশুমূর্তির কতকগুলি নিদর্শনে নবগ্রহের অন্তর্ভুক্তির দরুন মহিলাটিকে পার্বতী এবং শিশুটিকে শিবের সদ্যোজাত মূর্তি বলে গণ্য করা অযৌক্তিক হবে। শিব ও পার্বতীর বিবাহ বিষয়ক ভাস্কর্যের কতকগুলি নিদর্শনে নবগ্রহের উপস্থিতি আমরা অবশ্য অস্বীকার করি না, কিন্তু এ জাতীয় আলেখ্যগুলিতে দেবীর বধূরূপ বিশেষভাবে সূচিত তাঁর কোমল তরুণীমূর্তি আর হস্তধৃত দর্পণের মাধ্যমে (২৪)। আলোচ্য ভাস্কর্যগুলিতে নবগ্রহের উপস্থিতি সত্ত্বেও বিবাহে আমন্ত্রিত দেবদেবী, পার্ব্বতীর মাতাপিতা ইত্যাদির মূর্তির অভাব, এবং বধূরূপের পরিচয় বাচক কোনরূপ সম্পুর্ণ মাঙ্গলিক চিহ্নের অনুপস্থিতি মহিলাকে পার্বতী বলে সনাক্ত করার ব্যাপারে প্রধান অন্তরায়। অতএব একই কারণে শিশুটিকেও শিবের সদ্যোজাত রূপ বলে বিবেচনা করা সম্ভব নয়। মহিলার দক্ষিণ হস্তের পদ্ম আর শিশুটির দুই পা পদ্মের উপর ন্যস্ত থাকায় অনেকেই চেয়েছেন এদের দুজনের উপর দেবত্ব আরোপ করতে। কলকাতা ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের একটি নিদর্শনে শিশুটিকে দেখান হয়েছে জটামুকুট পরিহিত অবস্থায় (২৫)। কিন্তু করধৃত পদ্মের দরুন মহিলাটিকে একজন দেবী তথা পার্বতী বলে গণ্য করতে হবে এমন কোন আইন নেই। কালিদাসের মানবী নায়িকাদের বর্ণনায় আমরা দেখি তাদের হাতে আছে 'লীলাকমলকম্'। লীলাকমলহস্তা বহু নায়িকার রোমান্সের বর্ণনা পাওয়া যাবে কথাসরিত্‌সাগরের কাহিনীগুলোতে। তেমনি শিশুটির পায়ের নীচে পদ্ম আছে এজন্য বা তার জটামুকুটের দরুন, ঠিক হবে না তাকে দেবতা, বিশেষ করে সদ্যোজাত শিব বলে গণ্য করা। বড় জোর মনে করা যেতে পারে শিশুটি কোন রাজা বা বিত্তশালীর পুত্র।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে আলোচ্য প্রস্তরালেখ্যগুলিতে কৃষ্ণ বা বুদ্ধের জন্মদৃশ্য বর্ণিত হয়েছে (২৬)। কিন্তু ফলকগুলিতে শিবের লিঙ্গরূপীণ প্রতীক, এবং কার্তিক গণেশের প্রতিকৃতি থাকার দরুন আমরা তাঁদের সঙ্গে একমত নই। আমাদের বিবেচনায় এই ভাস্কর্যগুলিতে পার্ব্বতীর পার্শ্বে শিবের সদ্যোজাত রূপ যেমন দেখান হয়নি, তেমনি এগুলির কোনটিরই বিষয়বস্তু কৃষ্ণ বা বুদ্ধের জন্মসংক্রান্ত নয়। অধিকন্তু ভাস্কর্যগুলিতে এমন কোন চিহ্ন বা ইঙ্গিত নেই যা থেকে বোঝা যাবে শিশুটি কৃষ্ণ না বুদ্ধ, কিংবা মহিলাটি যশোদা না মায়াদেবী। ভাস্কর্যটিতে শৈব প্রভাব অবশ্যই লক্ষ্যণীয়, কিন্তু কোনো দেবতা বা মহাপুরুষের জন্মদৃশ্যের অবতারণা এখানে করা হয়নি। বস্তুতঃ এ জাতীয় রচনাগুলির বিষয়বস্তুকে যদি আমরা নিছক অনাধ্যাত্মিক বলে বিবেচনা করি, তাহলে কিছুমাত্র অন্যায় করব না। আমাদের বিশ্বাস আলোচ্য ভাস্কর্যের মহিলা ও শিশু হচ্ছেন একজন মানবী মা ও তাঁর সন্তান; খুব সম্ভব মহিলাটি কোন রাজমহিষী। আমাদের এ অনুমান বিশেষ করে সমর্থন করছে মহিলার সুখশয্যা, তাঁর সর্ব্বাঙ্গের অলঙ্কার-বাহুল্য, মূল্যবান স্বচ্ছ মসলিনের পরিধেয়, বহুযত্নে রচিত কবরী, রত্নখচিত মস্তকবেষ্টনী আর তাঁর পরিচর্যায় নিযুক্ত একাধিক কিঙ্করী। এ থেকেই আমাদের বোঝা উচিত কেন তাঁর পার্শ্বস্থ শিশুটির পা দু'খানি রাখা হয়েছে পদ্মের উপর, আর কেনই বা তার মাথায় দেওয়া হয়েছে রাজমুকুট।

আলোচ্য প্রস্তরালেখ্যগুলিতে শিবলিঙ্গের উপস্থিতির কারণ, আমাদের বিবেচনায় দু'টি। প্রথমটি হচ্ছে, এর দ্বারা ভাস্কর বোঝাতে চাচ্ছেন আলেখ্যগুলির মালিকেরা শৈবমতাবলম্বী; আর দ্বিতীয়তঃ শিব হচ্ছেন পুত্রদ, অতএব উর্ব্বরতা বা প্রজননের প্রতীক হিসাবে উক্ত দেবতার এই বিশেষ অঙ্গটিকে এই ভাস্কর্যগুলির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গণেশ সিদ্ধিদাতা, বিঘ্ননাশন; কার্তিকেয়

দেবগণের সেনাপতি, এজন্যই তাঁদের প্রতিকৃতি স্থান পেয়েছে এই জাতীয় রচনায়। সুখ ও শান্তি, পারিবারিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি, দীর্ঘ জীবন, সুবৃষ্টি আর শত্রুনাশ কামনায় পূর্ব্ব ভারতে নবগ্রহের পূজার বিশেষ প্রচলন ছিল, মধ্যযুগে, (২৭) কাজেই এই শ্রেণীর কয়েকখানি প্রস্তর আলেখ্যে তাদের প্রতিকৃতির উপস্থিতি খুবই সঙ্গত ও স্বাভাবিক বলেই আমরা মনে করি।

এটা খুবই সম্ভব যে আলোচ্য ভাস্কর্যগুলির মা ও শিশুমূর্তিকে দেবতার প্রতিকৃতি মনে করে মধ্যযুগের সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তিরা বা রাজারা এ জাতীয় প্রস্তরালেখ্যগুলিকে তাঁদের অন্তঃপুরের শয়ন কক্ষে রাখার ব্যবস্থা করেন প্রাচীর গাত্রের বিশেষ অলঙ্করণ হিসাবে। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, মথুরা মিউজিয়মে সংরক্ষিত অশোক বৃক্ষতলে বক্ষলগ্ন শিশুসন্তানসহ কুষাণযুগের ভগ্ন নারীমূর্তি (২৮) বা খাজুরাহো অথবা ভুবনেশ্বরের কোন মন্দির গাত্র থেকে সংগৃহীত এবং কলকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের দ্রষ্টব্যের অন্তর্গত (২৯) ফুল ও ফলভারাবনত লতামণ্ডপের নীচে মনোহর ভঙ্গীতে দণ্ডায়মানা খৃষ্টীয় ১১ শতকের শিশুহস্তা, সালঙ্কারা, সুসজ্জিতা, দেবদুর্লভ সৌন্দর্য-মণ্ডিতা, পূর্ণযৌবনা স্ত্রীমূর্তির মতই বঙ্গীয় ভাস্কর্য শিল্পের মধ্যযুগীয় নিদর্শন এই মা ও শিশুমূর্তি কোন দেবতার প্রতিকৃতি নয়। সন্তান ক্রোড়ে বা সন্তানকে স্তনদানে নিরতা নারীর মাতৃমূর্তি, তার পবিত্রতা, স্বাভাবিকতা ও সরলতার দরুন বিষয়বস্তু হিসেবে অতি সহজেই উদ্দীপিত করেছে সর্বকালে সর্বদেশের শিল্পী-মানসকে। একথা অনস্বীকার্য যে ২ শতক থেকে আরম্ভ করে খৃষ্টীয় চিত্রকলা বা ভাস্কর্যে ম্যাডোনার অসংখ্য রূপায়নের পিছনে আছে মা ও শিশুর পবিত্র রূপের কল্পনা। কিন্তু এ জাতীয় রচনা সব সময়ই ধর্মমূলক হতে হবে তার কোন সঙ্গত কারণ নেই। র‍্যাফায়েলের আঁকা ম্যাডোনার মতই সাধারণ মানবী মা ও তাঁর সন্তানের প্রতিকৃতি চিত্রকর বা ভাস্করের নৈপুণ্যে

মহিমান্বিত হয়ে আমাদের চোখে ধরা দিতে পারে। অতএব প্রাচীন বরেন্দ্রীর মা ও শিশুর প্রস্তরালেখ্যগুলি পবিত্র দেবতামূর্তি বলে বিবেচনা করার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ, আমাদের মতে এগুলির বিষয়বস্তু হচ্ছে সম্পূর্ণ অনাধ্যাত্মিক। রেনেসাঁ-পরবর্তীযুগে ইটালির সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেরা, রাজা ও রাজপুরুষেরা যেমন শিল্পী নিয়োগ করতেন তাঁদের স্ত্রীদের ম্যাডোনা আর সন্তানদের শিশু যীসু রূপে আঁকবার জন্য তেমনি আমাদের আলোচ্য মা ও শিশুর প্রস্তরালেখ্যগুলির নির্মাণের পিছনে পূর্বভারতের কোন কোন নৃপতি বা বিত্তশালীর অনুরূপ ইচ্ছা প্রধানত বলবৎ ছিল বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

প্রাচীন ভারতে 'মাতৃকা' উপাসনার সাক্ষ্য-প্রমাণ

এক

পাক-ভারতে 'মাতৃকা' (১) বা মাদার গডেস (*Mother Goddess*) উপাসনার প্রাচীনত্ব আর ধারাবাহিকতার প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ যত পাওয়া গেছে, তার তুলনায় গুপ্ত পূর্ববর্তী যুগের সাহিত্যে দেবী পূজার নজীর খুবই কম। মহারাজ শূদ্রক রচিত মৃচ্ছকটিক নাটকে 'মাদার গডেসে'র গৌরী ও পার্বতী নাম দুটির অবশ্য উল্লেখ পাওয়া যায়। শূদ্রক এবং তাঁর পূর্ব্ববর্তী নাট্যকার

ডক্টর মুখলেসুর রহমান; অধ্যক্ষ, বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি মিউজিয়াম, রাজশাহী।

ভাসের রচনায় মাতৃকাদের (২) উপাসনার কথা থাকলেও, সেগুলির সাহায্যে প্রাচীন ভারতে 'মাদার গডেসের' ইতিহাস বা তাঁর পূজাপদ্ধতি সম্পর্কে কোনরূপ ব্যাপক ধারণা করা সম্ভব নয়।

প্রকৃতপক্ষে গুপ্তযুগেই (খৃষ্টীয় ৪-৭ শতক) সুপরিকল্পিত উপায়ে মহাদেবীরূপে দুর্গার উপাসনারীতি সংগঠিত হয়ে হিন্দু সমাজে প্রচলিত হয়। (৩) এই সময় থেকেই শাক্ত মতবাদ দ্রুত প্রাধান্য লাভ করতে থাকে। গুপ্তযুগেই দুর্গার সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীগুলি লোকায়ত সাহিত্যের অন্যতম প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। লোকগাথা ও উপকথার মাধ্যমে বহুযুগব্যাপী জন সমাজে প্রচলিত শিব ও উমার বিবাহ সংবাদ এই যুগের বিখ্যাত কবি কালিদাসের লেখনীতে রূপান্তরিত হয় এক সুমার্জিত, সুসংহত, রসঘন মহাকাব্যে —কুমার সম্ভবে।

খৃঃ পূঃ ৫ শতকের বৈয়াকরণ পাণিনির রচনায় উত্তর-বৈদিক যুগের স্ত্রী দেবতাদের তালিকায় 'মাদার গডেসে' ভবানী, শর্ব্বাণী, রুদ্রাণী ও মৃড়ানী, এই চারটি নাম পাওয়া যায়। (৪) গুহ্যসূত্র সমূহ রচনাকালে এই সব নামেই দুর্গা ছিলেন হিন্দুসমাজের উপাস্যদেবী। (৫) ভব, শর্ব্ব, রুদ্র, মৃড়, সবগুলি নামই শিবের, শর্ব নামে শিব ছিলেন প্রাচ্যদেশের জনপ্রিয় দেবতা, আর ভব নামে বাহ্লিক দেশে। (৬) এ থেকে অনুমিত হয়, শর্ব্বাণী ও ভবানী (শর্ব্ব ও ভবের স্ত্রী লিঙ্গ) একই দেবীর বিভিন্ন আঞ্চলিক নাম। অমরকোষে (৭) দুর্গার নাম-পঞ্জীর নাতিখর্বতা গুপ্তযুগের পাকভারতে তাঁর পূজার প্রসারতার পরিপোষক।

খৃষ্টীয় (৬) শতকে রচিত বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় (৮) দুর্গার অন্যতম রূপ ও অভিরী একানংশার প্রতিমা নির্মাণ ও স্থাপন সম্পর্কিত কয়েকটি শ্লোকে বিশদ নির্দেশ দৃষ্টে অনুমান করা কঠিন নয় যে গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় হিন্দুধর্ম্মে 'মাদার গডেসে'র স্থান কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু মহাভারতে (৯) দেবীর উদ্দেশ্যে রচিত স্তোত্রগুলি বা

প্রাচীন ভারতে 'মাতৃকা' উপাসনার সাক্ষ্য-প্রমাণ

প্রাচীন ভারতে 'মাতৃকা' উপাসনার বৃহৎসংহিতায় তাঁর একানংশরূপের বিশদ বিবরণ, এর কোনটাই প্রাচীন বা আদি বা মধ্যযুগের হিন্দুধর্ম্মে তাঁর উপাসনার সঠিক মূল্যায়নে বিশেষ সহায়ক হবে না, যেমন হবে গুপ্তযুগের সমস্তমার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্য নামধেয় অধ্যায়গুলি। এই পুরাণের দেবীমাহাত্ম্য বা চণ্ডী অংশটুকুকে ভিত্তি করে বাণভট্ট রচনা করেন চণ্ডীশতক, খৃষ্টীয় ৭ শতকে।(১০) বাণের অন্যান্য গ্রন্থ, যথা কাদম্বরী ও হর্ষচরিতেও আমরা একাধিকবার দুর্গার সাক্ষাৎ পাই আর্য ও অনার্যসেবিতা দেবীরূপে।

আদি মধ্যযুগে 'মাদার গডেসে'র দুর্গা নামটির প্রচলন ছিল অপেক্ষাকৃত কম; সচরাচর চণ্ডী বা অপর কোন নামে তিনি পূজিত হতেন। বাণভট্টের রচনায় এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে যেমন যাবে বাণের সমসাময়িক বাকপতির গৌড়বাহো কাব্যে, যাতে কালী বা বিন্ধ্যবাসিনী দেবী আর চণ্ডী, পার্বতী, শবরী, নারায়ণী, শঙ্করী ও মহিষাসুরমর্দিনীকে এক ও অভিন্ন দেবী বলে বর্ণনা করা হয়েছে।(১১) ঘোর রূপ, নাম ও স্বভাব সূচক চামুণ্ডা অভিধায় নরবলি সহ দেবী-পূজার বর্ণনা দিয়েছেন খৃষ্টীয় ৮ শতকের নাট্যকার ভবভূতি, তাঁর মালতীমাধব গ্রন্থে। (১২) দেবী-পূজায় নরবলি দেওয়ার প্রথার উল্লেখ করেছেন ভারতে চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন সাং।(১৩) নৌকাযোগে অযোধ্যা থেকে পূর্বদিকে যাওয়ার সময় শোনিতপিপাসু দেবীর ভক্তদের হাত থেকে তিনি অল্পের জন্য রক্ষা পান। প্রাচীনকাল থেকে কাশ্মীরে দুর্গার সন্তুষ্টি সাধন করার জন্য নরবলি দেবার যে প্রথা ছিল, পরবর্তী যুগে রাজা মেঘবর্ণ তা রহিত করেন।(১৪) মধ্যযুগে গৃহদেবীরূপে দেবীর সৌম্য মূর্তি নির্ম্মাণ করে পূজা করার রীতিরও সমধিক প্রচলন ছিল। রাজশেখর বিরচিত কর্পূরমঞ্জরীতে পার্বতী নামে অভিহিতা দেবীর ধাতব মূর্তি রাজান্তঃপুরে পূজিত হত বলে উল্লেখ আছে।(১৫)

দুই

আদি ও মধ্যযুগে 'মাদার গডেস' উপাসনার অধিকতর নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যাবে প্রস্তর ফলক, স্তম্ভগাত্র, তাম্রপট্ট ও দেবীর বিভিন্ন মূর্তির গাত্র বা পাদপীঠে উৎকীর্ণ সমকালীন লিপি থেকে। যদিও এ জাতীয় নজীরগুলি মূলতঃ প্রত্নতাত্বিক তবু লিখিত বলে এগুলিকে সাহিত্যিক প্রমাণের সঙ্গে একত্র করে আমরা বিচার করব। 'মাদার গডেস' থেকে উদ্ভূত মাতৃকাদের পূজার সংবাদ বহনকারী শিলালিপিগুলি নিঃসন্দেহে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে শাক্তমতবাদের অস্তিত্ব ও প্রসারতার জোরালো ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু দুর্গা-পূজার ইতিহাস রচনায় এগুলিকে বড় জোর পরোক্ষ প্রমাণ বলে দাবী করা যেতে পারে, তার বেশী নয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে স্কন্দগুপ্তের আমলের বিহার স্তম্ভলিপির, (১৬) যার বিষয় বস্তু হচ্ছে কতকগুলি মন্দির প্রতিষ্ঠার বিবরণ। এদের মধ্যে একটি আবার দেবী ভদ্রার্যার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। ভদ্রকালী বা সুভদ্রার 'ভদ্রা আর হরিবংশের আর্যাস্তবের 'আর্যা' এই দুটি শব্দযোগে যে ভদ্রার্যা নামটি সৃষ্টি হয়েছে, সে বিষয়ে আমরা অধ্যাপক ব্যানার্জীর সঙ্গে একমত। অন্যান্য মন্দিরগুলি উৎসর্গ করা হয়েছে 'মাতৃগণ'কে আর স্কন্দকে ; এরা সকলেই 'মাদার গডেসে'র সঙ্গে নানা ভাবে সংশ্লিষ্ট। তাছাড়া আদি ও মধ্য যুগে দুর্গা বহুল পূজার পাত্রী ছিলেন একানংশা নামে, যার দরুণ মধ্যযুগের ভারতবর্ষে বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের রক্ষয়িত্রী বা কুল-দেবীদের সত্তা কি ভাবে ক্রমে ক্রমে 'মাদার গডেসে'র প্রবল ব্যক্তিত্বে বিলীন হয়ে যাচ্ছিল তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে রাজস্থানের যোধপুর জেলায় একটি প্রাচীন মন্দিরে আবিষ্কৃত এবং ৬০৮ খৃষ্টাব্দে

প্রাচীন ভারতে 'মাতৃকা' উপাসনার সাক্ষ্য-প্রমাণ

রাজস্থানে উদয়পুর রাজ্যে ভমরা মাতা মন্দিরে গ্রথিত গুপ্তযুগের গৌড়ক্ষত্রিয় বংশের ধন্যাসোম-পৌত্র এবং রাজ্যাবর্ধনের পুত্র যশোগুপ্তের একখানি শিলালিলিতে ৫৪৭ বিক্রম সংবতের (৪৯০—৯১ খৃ) মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের দশ তারিখে দেবী বা দুর্গার জন্য একটি মন্দির নির্ম্মাণ করার কথা বলা হয়েছে। (১৭) প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে 'ভমরা' শব্দটি হচ্ছে মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত 'মাদার গডেসে'র অন্যতম অভিধা 'ভ্রমর' বা 'ভ্রমরী নামের একটি আঞ্চলিক রূপ।

খৃষ্টীয় ৫ শতকেউত্তর ভারতে'মাদার গডেসের' পূজার সাক্ষ্যবহন করছে নার্গার্জুনি পর্বতমালায় আবিস্কৃত মৌখরী-প্রধান অনন্তবর্ম্মণের দু'খানি শিলালিপি।(১৮) এর একখানিতে অনন্তবর্ম্মণ কর্তৃক ভূতপতি নামে শিবের এবং দেবী আখ্যায় ভূষিতা তাঁর স্ত্রীর মূর্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। গোজীগুহায় প্রাপ্ত অপর শিলালিপির সংবাদ হচ্ছে উক্ত নৃপতি কর্তৃক কাত্যায়নী নাম দিয়ে দেবীর একটি মূর্তি স্থাপনের বিষয়। এই লিপিখানিতে আরও বলা আছে দেবীর সেবার্থে একটি গ্রাম দানের কথা, কিন্তু দেবীকে উল্লেখ করা হয়েছে ভবানী নামে। লেখাটির ২য় অনুচ্ছেদের ১ম পঙ্‌ক্তিতে দেবীর বাম চরণের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে, কারণ ঔজ্জ্বল্যে প্রস্ফুটিত পদ্মের সমস্ত সুষমা নিষ্প্রভকারী নূপুর নিক্কণিত সেই শ্রীচরণ পরম তাচ্ছিল্যভরে স্থাপিত হয়েছিল মহিষাসুরের মস্তকে। দেবীর এই রূপই যে আদি মধ্যযুগে সুপরিচিত ছিল তার প্রামাণ্য নজীর হচ্ছে এই শিলালিপিখানি, আর উদয়গিরির ২য় চন্দ্রগুপ্তের গুহায় মহিষমর্দিনী মূর্তি। শিলা-লিপিখানি থেকে আরও প্রমাণ হয় যে মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডী বা দেবীমাহাত্ম্য অধ্যায়গুলি উত্তর ভারতে এই সময়ে সুবিদিত ছিল, কারণ মহিষাসুরকে বধ করার পূর্ব্বে যুদ্ধে তাকে পর্যুদস্ত করে তার

মস্তকে দেবীর চরণ রক্ষার কথা সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ করা হয়েছে পুরাণটির এই অংশেই।(১৯)

মধ্যযুগের ভারতবর্ষে বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের রক্ষয়িত্রী বা কুল-দেবীদের সত্ত্বা কি ভাবে ক্রমে ক্রমে 'মাদার গডেসে'র প্রবল ব্যক্তিত্বে বিলীন হয়ে যাচ্ছিল তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে রাজস্থানের যোধপুর জেলায় একটি প্রাচীন মন্দিরে আবিষ্কৃত এবং ৬০৮ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ দধিমতীমাতা শিলালিপিতে। দধিমা গোত্রীয় ব্রাহ্মণদের কুলদেবী, এজন্য দেবীর নাম এই লিপিতে দধিমতী বলে বর্ণিত হলেও তিনি দুর্গা ব্যতীত অপর কেউ নন। কারণ লিপির ১১ শ পঙক্তিতে আছে মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত মহাদেবীর প্রণাম মন্ত্র: 'সর্ব মঙ্গল মাঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমহস্তুতে'॥ লিপির ৩য় পঙক্তিতে মন্দিরের প্রাচীনত্ব দৃষ্টে মনে হয় শিলালেখটি রচনাকালের বহু পূর্ব থেকেই এতদঞ্চলে দেবী দধিমতীর পূজা বর্তমান ছিল। উত্তর ভারতে 'মাদার গডেসে'র ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তির দরুণ লিপি রচনা কালে তাঁর সঙ্গে পূর্বোক্ত দেবীর একত্রীকরণ সম্পাদিত হয়। মৌখরী-প্রধান অনন্তবর্মণের দ্বিতীয় শিলালিপিখানির মত এই লেখটিও আদি মধ্যযুগে মার্কণ্ডেয় পুরাণের, বিশেষ করে এর দেবীমাহাত্ম্য নামধেয় অধ্যায়গুলির বিদ্য-মানতার একটি অবিসম্বাদী প্রমাণ। অনুরূপ আর একটি দলিল হচ্ছে খৃষ্টীয় ৭ শতকের প্রথমার্ধে রচিত (৬৮২ বিক্রমসংবৎ ৭২৫ খৃঃ) বর্মলাটের বসন্তগড় শিলালিপি। এটির প্রথম শ্লোকে দেবীকে দুর্গা সম্বোধন করে তাঁর আশিস প্রার্থনা করা হয়েছে, বলা হয়েছে তিনি মূর্তিমতী বেদ ও ব্রহ্মগীতা, তিনি বিশ্বের মঙ্গলদাত্রী। ২য় শ্লোকের উদ্দিষ্টা হচ্ছেন দেবী ক্ষেমার্যা বা ক্ষেমকরী (ক্ষেমঙ্করী)। দুর্গার অন্যতম একটী অভিধা হচ্ছে ক্ষেমঙ্করী এবং রাজস্থানে খিমেল-মাতা নামে তিনি জন সাধারণের উপাসনার পাত্রী। ক্ষেমার্যা আর দুর্গা যে এক ও অভিন্ন এটা সহজবোধ্য, কারণ ক্ষেমঙ্করী দুর্গার

আর একটী রূপ। তাছাড়া শিলালিপিটীর প্রাপ্তিস্থান একেবারে মন্দির সন্নিকটে। ক্ষেমঙ্করী ও খিমেলমাতার অভিন্নতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যাবে ১২৩৪ বিক্রমসংবতে। (১১৭৮ খৃঃ) লিখিত ওশিয়ানে (মাড়ুবার) সচীয়ামাতা মন্দিরের উত্তর পূর্ব কোণে সন্নিবিষ্ট একটী শিলালিপি থেকে।

'মাদার গডেসে'র শঙ্করা নামে রাজস্থানে পূজিত হবার সংবাদ পাওয়া গেছে ৬৯৯ বিক্রমসংবৎ মোতাবেক ৬৪৪ খৃষ্টাব্দের সাকরাই শিলালিপির ১৪শ শ্লোকটিতে। এই লিপির ২য় শ্লোকে দেবীকে চণ্ডিকা নামে অভিহিত করা হয়েছে। উত্তর ভারতে দেবী পূজার সাক্ষ্যবহন করছে মেবার অঞ্চলের সামোলিতে প্রাপ্ত আর একটি শিলালেখ। এটির সময় হচ্ছে ৭০৩ বিক্রমসংবৎ, অর্থাৎ ৬৪৬ খৃঃ। দেবী অরণ্যবাসিনীর সম্মানার্থে একটি মন্দির নির্মাণের কথা লিপিটির বিষয় বস্তু। হরিবংশ পাঠে জানা যায় দুর্গা ছিলেন বনবাসিনী, অতএব শিলালিপির অরণ্যবাসিনী দেবী খুব সম্ভব দুর্গা ছাড়া আর কেউ নন। অরণ্যবাসিনী নাম থেকে আরও মনে হয় হিন্দু ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হবার পূর্বে তিনি ছিলেন শক্তিশালী আটবিক অনার্য সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা।

পৃথ্বিমাতারূপেও যে 'মাদারগডেস' রাজস্থানে পূজিত হতেন, তার সমর্থনে কেবলমাত্র ডুঙ্গরপুরের বসুন্ধরা মন্দির নয়, সেখানে পাওয়া একখানি খণ্ডিত শিলালিপির সাক্ষ্যও পেশ করা যেতে পারে। খৃষ্টীয় ৭ শতকের অক্ষরে লেখা এই লিপিতে 'মাদার-গডেস'কে বসুন্ধরা সম্বোধনে স্তুতি করা হয়েছে।

কনৌজের গুর্জরপ্রতিহাররাজ প্রথম ভোজদেবের দৌলতপুর তাম্র শাসনখানি খৃষ্টীয় ৯ শতকে উত্তর ভারতে দেবী পূজার একখানি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এই লেখটির সঠিক তারিখ সম্বন্ধে প্রচুর মতভেদ আছে, কিন্তু প্রথম ভোজদেবের অন্যান্য তাম্রলিপি থেকে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে তিনি ৮৩৬ থেকে ৮৮৫ খৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

তদনুসারে বর্তমান লেখটির সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে ৯০০ বিক্রম সংবৎ। ৮৪৩ খৃঃ। এই লিপিতে উল্লেখিত গুর্জরপ্রতিহার বংশের আটজন নৃপতির মধ্যে তিন জন ছিলেন শাক্ত, একথা তাঁদের প্রত্যেকের নামের পূর্বে 'পরম-ভগবতীভক্ত' কথাটি থেকে বেশ বোঝা যায়। জনৈক পণ্ডিত এই বিশেষণটীর যে অর্থই করুন না কেন, পুরাণগুলিতে 'মাদার গডেস'কে ভগবতী নামে অভিহিত করা হয়েছে একাধিকবার। সুতরাং ভগবতী নামে দুর্গাই যে প্রাগুক্ত তিনজন রাজার ইষ্টদেবী ছিলেন এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দিহান হতে পারি। বর্তমান এবং অন্যান্য তাম্রশাসনে, প্রথম ভোজদেবের 'প্রভাস', 'আদিবরাহ' প্রভৃতি অভিধাগুলি স্বভাবতই তাঁর সৌর-মতের পরিচয় দেয়। কিন্তু তিনি যে প্রকৃতপক্ষে ভগবতীর উপাসক ছিলেন তার সপক্ষে প্রচুর শক্তিশালী নজীরের অভাব নেই। (২৭) লিপি-বর্ণিত দেবী ভগবতীর সঠিক পরিচয় পট্টের উপর খোদিত দেবীমূর্তি থেকে সংশয়াতীতভাবে পাওয়া যাবে। সমপাদস্থানক ভঙ্গীতে চতুর্ভুজ দেবী দাঁড়িয়ে আছেন দুটি বাঘের মাঝখানে; তাঁর ডান দিকের উপরের হাতে রয়েছে শিবলিঙ্গ, নীচের বামহাতে কমণ্ডলু আর উপরের বামহাতে গণেশ মূর্তি। 'অতএব এই মূর্তিটী হচ্ছে পার্বতী বা ভগবতীর, যা সাধারণতঃ শৈব মন্দিরে দেখা যায় এবং যাঁর উপাসক ছিলেন নাগভট্ট, প্রথম ভোজ ও মহেন্দ্র পাল'। (২৮) খৃষ্টীয় ৯ শতকে অম্বিকা নামে 'মাদার গডেস' রাজস্থানে জৈন সম্প্রদায়ের উপাস্য ছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে মাড়বারের ঘাটিয়ালায় মাতাজী মন্দিরের প্রাচীর সংলগ্ন ৯১৮ বিক্রম সংবতের (৮৬১ খৃঃ) শিলালিপিখানির। (২৯) জৈন দেবী অম্বিকার নাম ও রূপ উভয়ই দুর্গার কাছ থেকে ধার করা। (৩০)

যোধপুর থেকে প্রায় ছয় ক্রোশ দূরে অরনার একটি স্তম্ভলিপিতে (খৃঃ ৯-১০ শতক) 'মাদার গডেস'কে নন্দা নামে অভিহিত করা হয়েছে।(৩১) বরাহপুরাণমতে(৩২) নন্দা দুর্গার অপর একটি নাম

ও রূপ, এবং এই নামেও তিনি বৃত্রাসুরকে বধ করে দেবতাদের আনন্দ দান করেছিলেন। হিমালয়বাসিনী নন্দা 'মাদার গডেসে'র একটি পৌরাণিক নাম ; তার সঙ্গে বৌদ্ধ হারীতি বা কুষাণ মুদ্রায় অঙ্কিত নানা দেবীর কোন সম্পর্ক আছে বলে কোন কোন পণ্ডিত দাবী করলেও (৩৩) আমরা তাঁদের সঙ্গে একমত হবার কোনরূপ যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখি না। ১০০৩ বিক্রমসংবৎ বা ৯৪৬ খৃস্টাব্দে উৎকীর্ণ মহোদয়ার অধিপতি ২য় মহেন্দ্রপালের প্রতাপগড় শিলালিপিতে (৩৪) দেবীকে অভিহিত করা হয়েছে বটযক্ষিনী নামে। এ নাম দৃষ্টে মনে হয় অরণ্যবাসিনীর মত আদিমযুগে এই দেবী ছিলেন অনার্যসেবিতা, আর তাঁর পূজার স্থান ছিল বটবৃক্ষের মূলদেশে। লিপিতে দেবীকে মহিষমর্দিনী ও কাত্যায়নী বলে সম্বোধন করে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করায় বোঝা যায় বটযক্ষিনী আর দুর্গা এক ও অভিন্ন। মাড়বারের কিনসারিয়ার কেবয়মাতা মন্দিরের শিলালিপিতে (৩৫) দেবীকে কালী ও কাত্যায়নী বলে উল্লেখ করায় মনে হয় রাজস্থানে খিমেলমাতার মত কেবয়মাতাও দুর্গার একটি আঞ্চলিক নাম। এই লিপি থেকে প্রকাশ হয় যে মন্দিরটি দেবী ভবানীর জন্য নির্মিত। এ ছাড়াও লিপির ৩য় পঙ্‌ক্তিতে দেবীর ভগবতী ও কাত্যায়নী নামের উল্লেখদ্বারা কেবয়-মাতাকে দুর্গার সঙ্গে সমীকরণ করা হয়েছে।

কাঙড়ার পূর্বদিকে অবস্থিত বৈজনাথে খৃষ্টীয় ৯ শতকে উৎকীর্ণ যে প্রশস্তিটি (৩৬) আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে মহাভারত ও হরি-বংশের অনুকরণে 'মাদার গডেস'কে স্তুতি করা হয়েছে। এই প্রশস্তিতে দেবীর অন্যান্য গুণ উল্লেখ করে বলা হয়েছে তিনি মহাশক্তি, সিংহবাহিনী, ত্রিনয়না, পর্বতদুহিতা (পার্বতী), দেবজননী, উগ্রপত্নী, গৌরী, মৃগনী ও শর্বাণী। এই প্রশস্তিটি মধ্যযুগে উত্তর ভারতীয় হিন্দুধর্মে 'মাদার গডেস'রূপে দুর্গার প্রাধান্য ও তাঁর উপাসনার গুরুত্বকে সন্দেহাতীতভাবে সমর্থন করছে বললে অত্যুক্তি হবে না।

বিহার ও বাংলাদেশের বিভিন্নস্থানে আবিষ্কৃত আদিম টেরা-কটা স্ত্রীমূর্ত্তিগুলি প্রাচীনকালে পাকভারতের পূর্ব্বাঞ্চলে 'মাদার গডেসে'র পূজার অস্তিত্বের পরিচয় জ্ঞাপক। (৩৭) ময়ূরভঞ্জে প্রাপ্ত একটি হরগৌরী মূর্তি কুষাণযুগে উড়িষ্যায় শাক্তপ্রভাবের ইঙ্গিত দেয়। গয়া জেলাস্থিত নাগার্জুনি পর্বতে আবিষ্কৃত অনন্তবর্মণের শিলালিপিগুলি প্রমাণ করে 'মাদার গডেস' দুর্গা তাঁর একাধিক নাম ও রূপে পূর্বভারতের হিন্দু সমাজে খৃষ্টীয় ৫ শতক বা তারও পূর্ব্ব থেকে বিশিষ্ট দেবীরূপে পূজিত হচ্ছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে, পূর্ব্বভারতে, বিশেষতঃ বাংলাদেশে, প্রাচীন বা মধ্যযুগে দেবীপূজার অস্তিত্ব নির্ণয়ে সহায়ক হতে পারে এমন পুঁথিগত *(literary)* বা প্রত্নতাত্ত্বিক নজীরের পরিমাণ খুবই কম। বরেন্দ্র ভূমির বিভিন্ন অঞ্চলে শুঙ্গ বা কুষাণ আমলের ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শন যে সব স্ত্রীমূর্তি পাওয়া গেছে তার কোনটাকেই শাক্তদেবী বলে নিশ্চিতরূপে চিহ্নিত করা যায় না। খৃষ্টীয় ৮ শতকের সোমপুরী (পাহাড়পুর) বিহারের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে টেরাকটা ও পাথরের তৈরী বহু দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে, কিন্তু সেগুলি সবই বৈষ্ণব আর বৌদ্ধধর্মের। পাহাড়পুরে শিব, ব্রহ্মা, এমন কি গণেশের মূর্তি পর্যন্ত পাওয়া গেছে, কিন্তু দুর্গাপূজার অস্তিত্বসূচক কোন কিছুই আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি।

বিষ্ণু, সূর্য প্রভৃতি দেবতাকে কেন্দ্র করে বাংলা দেশে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের অস্তিত্বজ্ঞাপক অনেকগুলি প্রাক্‌গুপ্ত ও তার পরবর্তী যুগের মূর্তিই শুধু আবিষ্কৃত হয়নি, বেশ কিছু সংখ্যক শিলা ও তাম্রলিপিও পাওয়া গেছে। (৩৯) আদি মধ্যযুগীয় বাংলা দেশে দুর্গাপূজার পুঁথিগত সাক্ষ্য একেবারে নেই বললেই চলে। ১২ শতকের গ্রন্থকার সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর রামচরিতমে দেবীপূজার যে সামান্যতম ইঙ্গিত করেছেন তাতে আমরা জানতে পারি যে এদেশে 'মাদার গডেস' উমা নামে পরিচিতা ছিলেন এবং তাঁর

পূজার সময় বরেন্দ্রী উৎসবময় হয়ে উঠত। (৪০) এর অনেক পরে আবির্ভাব হয় দুর্গাপূজা পদ্ধতি রচয়িতাদের। এঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন শূলপানি ; এঁর লেখা দুর্গোৎসববিবেক ও বাসন্তীবিবেক ; দুর্গোৎসববিবেকের নিবন্ধগুলিতে তাঁর পূর্ব্বসূরী দুজন বাঙ্গালী পণ্ডিত, জিকন ও বালকের রচনা থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি আছে। (৪১) জিকন বা বালকের কাল নির্ণয় হয়নি, তবে এঁরা পূর্ব্ববঙ্গের জনৈক রাজা হরিবর্মদেবের (১২ শতক) মুখ্যমন্ত্রী ভট্ট ভবদেবের পূর্ব্বে বর্তমান ছিলেন বলে মনে হয়। (৪২) কারণ ভবদেব তাঁর স্বরচিত স্মৃতির টীকায় জিকন, বালক এবং শ্রীকর বলে আর একজন পণ্ডিতের রচনার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রধাণতঃ পূজা পদ্ধতির উপর লেখা এই সব গ্রন্থগুলি থেকে আমরা জানতে পারি বাংলা দেশে ১০-১১ শতকে দেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমার পূজা করা হত। (৪৩) কিন্তু এদেশে দুর্গাপূজার উৎপত্তি বা তার প্রসারতার ইতিহাস সম্পর্কে এ গ্রন্থগুলি একেবারেই নীরব।

বাংলা দেশে দেবীপূজার প্রাচীনতম প্রামাণ্য লেখটিতে 'মাদার-গডেস' অভিহিত হয়েছেন শর্ব্বাণীনামে। এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়, কারণ নামটি বৈদিক ও পৌরাণিক। দেবীর এই অষ্টভুজা ধাতব প্রতিমার পাদপীঠে উৎকীর্ণ লেখাটি সম্বন্ধে বিস্ময়কর ব্যাপার হল, এর নির্মাণকর্ত্রী ও উৎসর্গকারিণী প্রভাবতী হচ্ছেন গোঁড়া বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রাজা দেবখড়্গের (খৃঃ ৭ শতকের শেষভাগ) মহিষী। দেবী যে বাংলা দেশে বৌদ্ধ-সেবিতা ছিলেন তার আরও নজীর পাওয়া যাবে ১১৪১ শকে লিখিত পট্টীকেরার রাজা রণবঙ্কমল্ল হরিকলদেবের ময়নামতী তাম্রশাসন খানিতে। এতে দেবীকে 'দুর্গোত্তরা' নামে সম্বোধন করে তাঁর উদ্দেশ্যে একটি বিহার উৎসর্গ করার সংবাদ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

পূর্ব্ব ভারতে দেবীপূজার প্রমাণ স্বরূপ লিখিত সংবাদগুলি বেশীর ভাগই দেবীর ধাতব বা প্রস্তর মূর্তির পাদপীঠে খোদাই করা।

এই সব মূর্তিগুলি 'মাদার গডেসে'র বিভিন্ন নাম ও রূপের পরিচায়ক। লিপিগুলি সন তারিখযুক্ত, অতএব দেবীপূজার ইতিহাস রচনায় এগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শর্ব্বাণী মূর্তিলিপিতে বৌদ্ধরাজ-মহিষী প্রভাবতী ঐ প্রতিমা উৎসর্গ করেছেন, এ সংবাদ থেকে বোঝা যায় খৃঃ ৭ শতকের শেষ ভাগে বাংলা দেশে দেবীর উপাসনা কতখানি সর্ব্বজনীনতা আর প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল। এইভাবে লোকনাথের ত্রিপুরা তাম্রলিপিতে (৬৬৩—৬৪ খৃঃ) সংযুক্ত শীলের উপর খোদাই করা গজলক্ষ্মীর মূর্তিকেও ৭ শতকের পূর্ব্ববাংলায় ঐ দেবীর উপাসনার প্রমাণ বলে ধরা যেতে পারে। এই লেখগুলিতে মধ্যযুগে দেবী তাঁর যে সব নামে সুবিদিত ছিলেন কেবল মাত্র তাই জানা যায় না, স্থান বিশেষে কি কি আঞ্চলিক নামে তিনি জনসাধারণের উপাস্যা ছিলেন তারও হদিস মেলে। যেমন, দেবীর জননীরূপ জ্ঞাপক পুণ্ডেশ্বরী, পুণ্যেশ্বরী, মুণ্ডেশ্বরী ইত্যাদি প্রতিমা-গুলি থেকে মনে হয়, এই অভিধায় তিনি মধ্যযুগে বিহার প্রদেশের অনেক স্থানে পূজিত হতেন। এগুলির চেয়েও অখ্যাত হচ্ছে দেবী ক্ষেমঙ্করী, খিমেলমাতা, অরণ্যবাসিনী, বটযক্ষিনী, দধিমতী প্রভৃতি মধ্যযুগীয় নামগুলি,যার সাক্ষাৎ আমরা ইতিপূর্ব্বেই পেয়েছি। আমরা আরও দেখেছি, দেবীর ঘোররূপবাচক দুর্গা, চণ্ডী ও মহিষ মর্দিনী নামও কতকগুলি শিলালেখে স্থান পেয়েছে। কিন্তু দেবীর সৌম্যরূপেরও সমধিক কদর ছিল তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় গোবিন্দপালের রাজত্বের চতুর্দশ বর্ষে (বিক্রমসংবৎ ১২৩২।১১৭৭ খৃঃ) উৎসর্গীকৃত দেবীর পার্ব্বতীরূপের একটি ধাতব প্রতিমার গাত্রস্থিত লিপিতে। অনুরূপ ভাবে লিপি খোদাই করা মহারাজ লক্ষ্মণসেনের (১১৭৮—১২০৬ খৃঃ) রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে ঢাকা নগরীতে স্থাপিত দেবীমূর্তিটি এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য; চণ্ডী নামে অভিহিতা হলেও দেবীর সৌম্য প্রকৃতির প্রতি পক্ষপাতিত্ব সরবে ঘোষণা করছে তাঁর, কারণ প্রতিমাটি

হচ্ছে দেবীর গজলক্ষ্মী আর চণ্ডরূপের অত্যাশ্চর্য মিশ্রণ।

তথ্য-সংকেত

১। Marshall, Sir John : Mohenjodaro and Indus Civilization, Vol. 1, London, 1931, P. 49, pl. xcv.

২। Wheeler, Sir R. E. M. Five Thousand Years of Pakistan, London, 1950, p. 73.

৩। Mackay, E. J. H. : Further Excavations at Mohenjodaro, 2 vols., Delhi, 1938, p. 269, pl. xxvl. 13.

8। Op. cit, p. 49.

৫। Taxila, vol. II, Cambridge, 1951, p. 448, pl. 132, nos. 23-25.

৬। Archaeological Survey of India, Annual Report (ASI), 1907-08, p. 86.

৭। Ibid, 1911-12, p. 79, pls. XXVII. 102, XXVIII. 103-104.

৮। Ibid., 1936, p. 50, pl. XXIV. 14, 15.

৯। Chhabra, B. Ch. : 'Antiquities from Jhansi and other Sites', Lalit-kala, No. 9, New Delhi, 1961, p. 14, pl. v. 7.

১০। Agrawala V. S. :' Terracotta Figures at Ahichchatra' Ancient India, vol. IV, New Delhi. 1947-48, p. 196.

১১। ASI, 1909—10, p. 77 ; Smith, V. A. : History of Fine Arts in India and Ceylon, Oxford, 1911, pp. 114—16 ; figs. 64, 65.

১২ ASI, 1909—10, p. 76, fig, 7.

১৩ Ibid., p. 77

১৪ Ibid.

১৫ Ibid., pl. XXVIII. d.

১৬ Agrawala, V. S. : 'Gupta Art, Lucknow, 1947, p. 12.

১৭ Agrawala, R. C. : 'Some More Unpublished Sculp-

tures from, Rajasthan,' Lalit-kala. No. 10, New Delhi, 1961, p. 31 ff., pls. XXI. 10—12, XXII.

১৮। Anderson, J. : Catalogue and Handbook of the Archaeological Collections in the Indian Museum, Vol. 11, Calcutta, 1883, p. 258. Bhattasali, N. K. : Iconography of the Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum, Dacca, 1929, p. 134 ff : pls. LIII. b, LIv.

১৯। Op. cit., p. 137.

২০। দেবীভাগবত পুরাণ, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯১০, ৩।৫।১

২১। দেবী পুরাণ, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, কলিকাতা ১৯১০ ১৭।২৪

২২। লিঙ্গপুরাণ, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত কলিকাতা, ১৯০৬ ১।১০২

২৩। ঐ ১।১০৬

২৪। Bhattasali, N. K. : Op. cit., pp. 121—22, pls. XIVII. b, XIVIII. a, b ; Catalogue of the Archaeological Relics in the Museum of the Varendra Research Society, Rajshahi, 1919, p. 9, pl. 3 ; Banernjea, J. N. : Development of Hindu Iconography, Second edition, Calcutta, 1956, pp. 485-86.

২৫। ASI, 1930-34, p. 262, pl. CXXXII. b.

২৬। Banerji, R. D. : Eastern Indian School of Medieval Sculptures, Archaeological Survey of India, New Imperial Series, Vol. XLVII, Delhi, 1933, p. 107 ; Anderson, J : Op. cit., p. 259 ; Banerjea, J. N. 'Iconography, History of Bengal, Vol. 1, ed. R. C. Mujumder, Dacca, 1943, p. 462.

২৭। Development of Hindu Iconography, p. 443.

২৮। Coomaraswamy, A. K. : History of Indian and Indonesian Art, London, 1927, p. 233, pl. XXI. 81.

২৯। Zimmer, H. : The Art of Indian Asia, 2 vol. New

York 1954, p. 415 pl. 344.

৩০। MacCulloch J. A. : Bambino ; Encyclopaedia of Religion and Ethics ed. J. Hastings, Edinburg 1909 vol. 11 p. 342.

তথ্য-সংকেত

১। হিন্দু ধর্মে উপাস্যা এবং দুর্গা, পার্ব্বতী, উমা, গৌরী, কাত্যায়নী, মহিষমর্দ্দিনী, চণ্ডী, মাতা, দেবী, মহাদেবী ইত্যাদি নামে পরিচিতা।

২। বিভিন্ন পুরাণগুলিতে এঁরা দুর্গার শরীর থেকে উদ্ভূত বলা হয়েছে। এরা সংখ্যায় সাধারণতঃ সাত জন এবং বিভিন্ন দেবতার শক্তি বলে পরিচিত। ব্রাহ্মী, মহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ইন্দ্রাণী, এঁরা যথাক্রমে ব্রহ্মা, মহেশ্বর, কার্তিকেয়, বিষ্ণু, বরাহরূপী বিষ্ণু, নরসিংহরূপী বিষ্ণু, ইন্দ্রের প্রতিভূরূপে অসুরদলনী দুর্গার সাহায্যকারিণী।

৩। Payne, E. A. The Saktas, Calcutta, 1933, p. 37.

৪। Agrawala, V. S. India as known to Panini, Lucknow, 1953, p. 357.

৫। ঐ

৬। শতপথ ব্রাহ্মণ, ১।৭।৩।৮

৭। অমরকোষ, annotated by H. T. Colebrooke, Serampur, 1808, ১।১।৩৬—৩৮

৮। বৃহৎসংহিতা, ed. Sudhakara Dvivedi, Benares, 1897, ৫৭।৩৭-৩৯

৯। মহাভারত, বনপর্ব ৬ষ্ঠ অধ্যায়, বিরাট পর্ব ২৩শ অধ্যায়।

১০। The Saktas p. 41

১১। গৌড়বাহো, (শঙ্কর পাণ্ডুরং পণ্ডিত সম্পাদিত), বোম্বাই, ১৮৮৭, ভূমিকা, CII-CIII

১২। Wilson, H. H. : *Hindu Theatre* Vol. II 2nd edition, London, p. 54.
১৩। Watters T. : On Yuan Chwang's Travels in India, London, 1904, p. 360.
১৪। রাজতরঙ্গিনী, ৩।৮৩—৯১
১৫। কর্পূরমঞ্জরী, ed. N. G. Suru, Bombay, 1960, p. 99.
১৬। Corpus Inscriptionum Indicarum (CII) ed. J. F. Fleet, Vol, III p. 49. line 8.
১৭। Archaeological Survey of India, Annual Report (ASI) 1829-30, p. 187.
১৮। CII, Vol. III, plate XXXIA p. 223 ff ; pl. XXXI B p. 226 ff.
১৯। মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৮৩।৩৭।

এবমুক্ত্বা সমুৎপত্ত সারূঢ়া তং মহাসুরম।
পাদেনাক্রম্য কণ্ঠে চ শূলেনৈনমতাড়য়ৎ॥

২০। Pandit Ram Karna : 'Dadhimati-mata Inscription of the time of Druhlana, Epigraphia Indica (EI) Vol. XI p. 299.
২১। Bhandarkar D. R. : Vasantgarh Inscription of Varmalata' EI, Vol. IX p. 187 ff.
২২। ASI, 1908-09, p. 109.
২৩। Chhabra, B Ch : 'Sakrai Stone Inscription, V S 699' EI vol XXVII p 22
২৪। Agrawala R C : 'Goddess worship in Ancient Rajasthana, Journal of the Bihar Research Society, (JBRS) vol XI (1), Patna March, 1955, p 1 ff
২৫। ঐ
২৬। K elhorn, F. : 'Daulatpur Plate of Bhojadeva I of Mahodaya', EI vol. V p. 201 ff. ; Fleet J. F. : 'Inscription of Maharaja Vinayakapala', Indian Antiquari, Vol XV p. 138 ff.
২৭। Tripathi, R.S. : History of Kanauj, Benares, 1937 p. 238.

২৮। D.R. Bhandarkar, quoted in JBRS, Vol. XII (i) p. 9.

২৯। ঐ

৩০। Bhattacharya, B. C. : Jaina Iconography, Lahore, 1939, pp. 142-43.

৩১। JBRS, Vol. Xli (i), pp. 9-10.

৩২। বরাহপুরাণ, ৩৮।২৭—৪৪

৩৩। JBRS, Vol. Xli (i), p. 10.

৩৪। Ojha, G. H. : 'Partabgarh Inscription of the time of king Mahendra Pala II of Mahodaya' EI, Vol. XIV, p. 177.

৩৫। Pandit Ramkanta, 'Kinsaryia Inscription of the Dadhichika (Dahiya) Chachcha' EI, Vol. XII, p. 56 ff.

৩৬। Buhlar G. : 'The Two Prasastis of Baijnath', EI, Vol. p. 97 ff.

৩৭। Consolidated Report on the Archaeological Museum, Mathura, Lucknow, 1961, p. 17 ff. ; Das Gupta, P. C. : 'Early Terracottas from Chandraketugarh'; Lalitkala No. 6, New Delhi, 1959, p. 45 ff., pls, XIII. 4, XIV. 8, XV. 15 ; Saraswati, S.K. : Early Sculpture of Bengal, Calcutta, 1962, p. 96 ff., figs, 37, 38, 39, 43 ; Johnston, E.H. ; 'A Terracotta figure at Oxford,' Journal of the London Society of Oriental Art, Vol. III, Calcutta, 1942, p. 94 ff.

৩৮। Vasu, N. : Archaeological Survey of Mayurabhanja, Vol. I, Calcutta, 1912, p. XXVII, li, fig. 9.

৩৯। 'Susunia Rock Inscription of Chandravarman', El, Vol. XII, pp. 133 ff ; 'Baigram Copper-plate of the time Kumaragupta I, GE 128/447-48 A.D., EI, Vol. XXI, p. 78 ff. ; Damodarpur Copper Plate (No. 4) of the of Budhagupta' EI, XV, p. 138 ; 'Three Copper Plate Grants of Sasankaraja, Gupta Samvat 300/619-20 A.D.' EI, Vol. VI, pp. 143 ff.

৪০। রামচরিতম (রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি সম্পাদিত), রাজশাহী, ১৯৩৯, ৩/৩৫।

৪১। জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চোপাসনা, কলিকাতা, ১৯৬০, ২৮১ পৃঃ।

৪২। Majumdar, N. G.: Inscriptions of Bengal, Vol. III, Rajshahi, 1929, pp. 27-28.

৪৩। পঞ্চোপাসনা, ২৮১ পৃঃ।

৪৪। Bhattasali, N. K.: 'Sarvvani Image Inscription of Prabhavati, Queen of Deva-Khadga' EI, Vol. XVII, pp. 358-59.

৪৫। 'The Mainamati Copper-plate of Ranavankamalla Hari-kala-deva, 1141 Saka,' Varendra Research Society' Monograph no. 5, Rajshahi, 1934, pp. 14-15.

৪৬। Basak, R. G.: 'Tipperah Copper Plate, Grant of Lokhanatha, EI, Vol. XV, p. 302.

৪৭। JBRS, Vol. XII (2), p. 146 ff.; EI, Vol XXVIII, p. 138; R.D. Banerjea: Eastern Indian School of Medieval Sculptures, Delhi, 1933, p. 31, XII. C, also p. 22, pl. III. a—b.

৪৮। Eastern Indian School of Medieval Sculptures, p. 23, pl. VI. C.

৪৯। Bhattasali, N.K.: 'Dacca Image Inscription of the 3rd Regnal year of Laksmansena' EI, Vol. XVII, p. 360.

৫০। Bhattasali, N. K.: 'Iconography of the Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca, Museum', Dacca, 1929, p. 203; Eastern Indian School of Medieval Sculptures, p. 121,pl. VI. d.

ইয়েট্‌স ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ

সারওয়ার মুরশিদ

১

প্রভাত মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্র-জীবনকথা'য় দুঃখ করে লিখেছেন, 'আশ্চর্য লাগে ভাবতে ইয়েট্‌সের শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর মানসিক আকর্ষণ প্রায় লোপ পেয়েছিল।'[১] এর কারণ সম্পর্কে প্রভাতকুমার আমাদের কোনও আলো দেন নি, এ বইতেও নয়, তাঁর বৃহত্তর 'রবীন্দ্রজীবনী'তেও নয়।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি ইয়েটসের মানসিক আকর্ষণ কেন লোপ পেয়েছিল তা বুঝতে হলে দুই কবির বন্ধুত্বের পশ্চাৎপটের দিকে ফিরে তাকাতে হবে। তাঁদের কবি প্রকৃতি ও কাব্যিক পরিণতির কথা মনে রাখলে এবং সংশ্লিষ্ট সব তথ্য উপস্থিত করলে আশ্চর্য হবার কোনও কারণ থাকবে না।

এ প্রবন্ধে দেখা যাবে যে এক বিশেষ অর্থে, প্রাচ্য জীবনের প্রতীক হিসেবে, ইয়েটসের কাছে রবীন্দ্রনাথের মূল্য শেষ পর্যন্ত অম্লান ছিল, যদিচ রবীন্দ্রনাথের ও প্রাচ্যের চিন্তার কোনও কোনও দিকের প্রতি তাঁর কিছুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। আরও একটি বিষয়ে আমি রবীন্দ্রানুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করব: সেটি হল, যখন ইয়েটস রবীন্দ্রনাথের চিন্তা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করছেন তার কাছাকাছি সময় তাঁর একটি কবিতায় প্রায় রাবীন্দ্রিক অনুভূতি ও চিন্তার আকস্মিক ও বিস্ময়কর উপস্থিতি।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইয়েটসের পরিচয় হয় প্রথম মহাযুদ্ধের দু'বছর আগে। এ সময়টা য়ুরোপীয় সংস্কৃতির এক সঙ্কটকাল। য়ুরোপের মানবতন্ত্রী এবং বিজ্ঞানতন্ত্রী সভ্যতা তখন বিস্ফোরণের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল। এ জটিল সভ্যতার নীচের তলায় ছিল কুটিল ক্ষয়, আর উপর তলায় ছিল কুৎসিত স্বার্থপরতা এবং শূন্যতা। এমন সময় এক অপেক্ষাকৃত সরল অথচ গভীর সংস্কৃতির

মর্মস্পর্শী বাণী নিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ। সংশয়দীর্ণ ও হৃত-প্রত্যয় য়ুরোপীয় চিত্ত তাঁর আনন্দিত উপলব্ধি ও গভীর বিশ্বাসে মুগ্ধ হল।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইয়েটসের পরিচয়ের ভূমিকাটি দীর্ঘ করে দেওয়ার প্রয়োজন আছে। আয়র্লণ্ডের সাংস্কৃতিক ও' আধ্যাত্মিক ইতিহাস ইংলণ্ডের থেকে স্বতন্ত্র এবং কোনও কোনও দিক দিয়ে য়ুরোপে অনন্য। তাহলেও উনিশ শতকের শেষ দিকে ও বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে দু'দেশের লেখক ও ভাবুকদের অনেকে একই আধ্যাত্মিক সমস্যায় পীড়িত হয়েছিলেন। যুক্তিবাদ, বস্তুবাদ, প্রত্যক্ষবাদ ও যান্ত্রিক বিজ্ঞান আত্মাকে অস্বীকার করে, সহজ উপলব্ধিকে সংশয়াক্রান্ত করে এবং কল্পনাকে খর্ব করে অধ্যাত্ম জীবনকে শূন্যগর্ভ করে দিয়েছিল। ডারউইনীয় বিবর্তন তত্ত্ব এবং বাইবেলের ঐতিহাসিক সমালোচনার মুখে বিপন্ন, এবং যুক্তিবাদী প্রোটেষ্টাণ্ট মানসিকতার কল্পনাহীন ও অসুন্দর আচার অভ্যাসের বাহন, ইসায়ী ধর্ম এ শূন্যতা অনেক ক্ষেত্রেই পূরণ করতে পারেনি। জীবন ও জগতের সার্বিক ব্যাখ্যা হিসেবে, একই সঙ্গে বুদ্ধি, কল্পনা ও আত্মার আশ্রয় হিসেবে, এ ধর্ম অকেজো হয়ে পড়েছিল—ইয়েটসের ভাষায়, 'এক বাক্স খেলনায় পরিণত হয়েছিল।'

এ আধ্যাত্মিক পরিস্থিতিতে ইয়েটস্ ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হন মোহিনী চট্টোপাধ্যায়ের দৌত্যে। খৃষ্টের মত প্রিয়দর্শন এই ব্রাহ্মণ যুবক গীতা ও শঙ্করাচার্যের বেদান্তের ব্যাখ্যা করে শতাব্দী-শেষের তরুণ ডাবলিন সমাজের কাছে জ্ঞান, উপলব্ধি ও কল্পনার এক নূতন দিগন্ত খুলে দিয়েছিলেন। এ কথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে পরবর্তীকালে যে স্বীকৃতি ও মুগ্ধতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইয়েটসের পরিচয় হয়েছিল, তার ক্ষেত্র অনেকখানি তৈরী করেছিলেন এই দার্শনিক ব্রাহ্মণ। পরিণত বয়সে ইয়েটস বলেছেন, 'এলকিবায়ডিস সক্রেটিসের কাছ থেকে পালিয়ে বেঁচেছিলেন পাছে সব ছেড়ে দিয়ে জীবনভর শুধু তাঁর

কথাই শুনতে হয়। আর আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, আমরা তরুণেরা, যারা কর্মে ও চিন্তায় অজানাকে খুঁজেছি, তারা ভেবেছি, শুধু এ মানুষটীর কথা শোনা আর পরিশেষে তাঁর মতো ভাবতে পারা জীবনের সার্থকতম কাজ।'(৩) বস্তুতঃ গ্রহণে, প্রতিক্রিয়ায়, বর্জনে ভারতীয় ধ্রুপদী দর্শনের এই ব্যাখ্যাকার কবি ইয়েটসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। মোহিনী চট্টোপাধ্যায়ের বাণী তাঁর স্মৃতিতে, গদ্যে ও কাব্যে সারাজীবন থেকে থেকে অনুরণন তুলেছে।

মোহিনী চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ইয়েট্স কি পেয়েছিলেন? তাঁর কাছ থেকে ইয়েট্স পেয়েছিলেন এমন এক দর্শন যা 'যুক্তিসহ' এবং একই সঙ্গে 'নিঃসীম'।(৪) এ দর্শনের প্রধান প্রত্যয়, সব কিছুর উৎসমূল আত্মা। এ প্রত্যয় য়ুরোপীয় সংস্কৃতিতে দুর্বল হয়ে পড়েছিল, আর এ নিশ্চয়তার উপরই তিনি জীবনের ভিত্তি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। ইয়েটসের বন্ধু রাসেল বলেছেন, 'ভগবৎ গীতা' এবং উপনিষদের প্রজ্ঞায় এমন দৈব পরিপূর্ণতা দেখতে পাই যে আমার মনে হয়, এর রচয়িতারা যেন অবিক্ষুব্ধ স্মৃতি নিয়ে কামনাতুর সহস্র জীবনের দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখেছেন, দেখেছেন, কায়াহীনের সাথে ছায়ার লোভে মানুষের জরাক্রান্ত দ্বন্দ্ব। নইলে আত্মা যা নিশ্চয় বলে জানে, তা এমন বিশ্বাসের সঙ্গে কি করে তাঁরা বলে যেতে পারলেন?'(৫) ইয়েটস ও রাসেল দু'জনেই এ নিঃসংশয় প্রত্যয়ের উপর সাহিত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। ইয়েটস বলেছেন, 'দার্শনিক কান্টের ধারণায় যে তিনটি জিনিষ না হলে বাঁচা চলে না আমিও সে তিনটি জিনিষের উপর সাহিত্যের ভিত্তিকে দাঁড় করাতে চাই। এগুলি হল: মুক্তি, ঈশ্বর, অবিনশ্বরতা। বেকন, নিউটন এবং লকের প্রভাবে এ তিনটি জিনিষই ফিকে হয়ে গেছে। সুতরাং সাহিত্যও হয়ে গেছে ক্ষয়িষ্ণু। আইরিশ সাহিত্য তখনই আমাকে আনন্দ দিয়েছে যখন আমি এতে দেখতে পেয়েছি

শুধু এ তিনের কোন একটির স্বীকৃতি এবং আর সব কিছুর প্রতি উপেক্ষা। এ সাহিত্য তখনই আমাকে আনন্দ দিয়েছে যখন এতে দেখতে পেয়েছি এমন আবেগ বা বেহিসেবী চরিত্র, যা জরাহীন, মৃত্যুহীন বলে ভাবতে সক্ষম মানব চিত্তের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ।'(৬) এ সব যদিও ইয়েট্‌সের শেষ জীবনের উক্তি, তিনি এ কথার সাক্ষ্য রেখে গেছেন যে নূতন আইরিশ সাহিত্যের পেছনে যে দর্শন তাতে মোহিনী চট্টোপাধ্যায়ের অবদান অনেকখানি।(৭)

মোহিনী চট্টোপাধ্যায়ের বেদান্ত দর্শনের মধ্যে ইয়েটস আর একটা বড় সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছিলেন। ইয়েটস আজীবন মানবসত্তার ঐক্যের সমস্যা নিয়ে ভেবেছিলেন। এর দু'টো দিক, একটি ব্যক্তির ঐক্য, অপরটি সমাজের ঐক্য। কবি হিসেবে নিজের জন্যে, এবং তাঁর জাতির জন্যে, তিনি একটি দর্শনের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। তিনি এমন একটা কিছু চেয়েছিলেন যা আধুনিক বিজ্ঞানের বিশ্লেষণী প্রক্রিয়ায় শতভাগে ভেঙে যাওয়া ব্যক্তিমনকে আবার এক করবে, যা সব শ্রেণীকে এক বৃন্তে স্থান দেবে এবং জাতির সমস্ত বিচ্ছিন্ন কার্যকলাপকে, অর্থনীতি জাতীয়তা ও ধর্মকে, এক আন্তর ছন্দে মিলিত করবে। ইয়েটস আধুনিক মানুষ হিসেবে এমন ধর্ম চেয়েছিলেন যা ব্যক্তির সম্পূর্ণ সত্তাকে পরিতৃপ্ত করবে, ভেতরের জগতের সঙ্গে সঙ্গে বাইরের জগৎকেও একটা আত্মিক সংহতি দান করবে। এই ঐক্যের সূত্র তিনি দেখেছিলেন মোহিনী চট্টোপাধ্যায়ের অসীম বিস্তৃত দর্শনের গভীর চিন্ময়তায়।

কিন্তু ইয়েট্‌স্ কবি, তিনি শুধু দর্শন খোঁজেননি, তিনি দেখতে চেয়েছেন কাব্য এবং জীবনে তার রূপ। 'আমাদের সত্তার যে একটি কালাতীত স্থানাতীত দিক আছে তা' হয়তো আমাদের যুক্তির কাছে আধুনিক দর্শনের কোনও কেতাব স্বচ্ছন্দে প্রমাণ করতে পারবে, তবুও তো দেখতে পাই আমাদের কল্পনা নিসর্গের দাস

হয়ে আছে।'(৮) তাই প্রয়োজন স্পন্দিত 'অভিজ্ঞতার'।(৯)

রবীন্দ্রনাথ কোনও কোনও দিক দিয়ে ইয়েটসের এ দাবী মিটিয়েছিলেন। মোহিনী চট্টোপাধ্যায় যে দর্শন থেকে ইয়েটসকে পাঠ দিয়েছিলেন সে দর্শন-লালিত সংস্কৃতির পরমাশ্চর্য প্রকাশ তিনি দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। গীতাঞ্জলি'র কবিতায় বেদ-উপনিষদের মর্মোত্থিত প্রত্যয় ও আশ্বাস বাংলা দেশের রোদভরা নিবিড় নীল আকাশের নীচে নূতন করে ধ্বনিত হয়েছিল। এ প্রত্যয়ের অতলতা ও প্রশান্তি ইয়েটসকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথের আবেদন ছিল প্রধানতঃ একটী স্থিতধী এবং সুসম্পৃক্ত সংস্কৃতির আবেদন। যেখানে কিষাণ ও অভিজাত জীবনে তখনও যোগ ছিল এবং দেহ ও আত্মাকে মানুষ আলাদা করে দেখেনি।

ইয়েটস গীতাঞ্জলির ভূমিকায় লিখেছেন: 'ভারতীয় সভ্যতার মত রবীন্দ্রনাথও আত্মাকে আবিষ্কার করে এবং তার মুক্তির কাছে নিজেকে সমর্পণ করেই খুসি।'(৯) 'সারা জীবন আমি যে জগতের স্বপ্ন দেখেছি এ কবিতাগুলোর চিন্তায় দেখতে পাই সেই জগৎ'। এগুলো এক পরম সংস্কৃতির কীর্তি, তবুও মনে হয় এগুলো যেন কাশ-দুর্বার সাধারণ মাটি থেকে বেরিয়ে এসেছে। কাব্য ও ধর্ম যাতে মিলে এক হয়ে গেছে এমন একটী ঐতিহ্য, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত থেকে ভাব ও উপমা গ্রহণ করেছে, এবং বিদ্বজ্জনের ও আমীরের চিন্তাকে আবার পৌঁছে দিয়েছে জনতার কাছে। যদি বাংলার সভ্যতা ভেঙে না যায়, যে মন সবার মধ্যে অন্তঃশীলা তা যদি আমাদের মনের মত ভেঙে খান খান হয়ে না যায়, তাহলে কয়েক যুগের মধ্যে এদের সূক্ষ্ম সৌকর্যের কিছু নাকিছু পথস্থিত ভিক্ষুকদের কাছে গিয়ে পৌঁছবে।'(১০)

কিন্তু য়ুরোপীয় হিসেবে ইয়েটস সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেহ ও আত্মার অনায়াস মিলন দেখে।

Entering my heart unbidden even as
One of the common crowd, unknown to me,
My king, thou didst press the signet
Of eternity upon many a fleeting moment.(১১)

ইয়েটস 'গীতাঞ্জলি'র এ লাইন ক'টির উপর মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেছেন : 'এ পবিত্রতার অনুভূতি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের ধর্ম-চর্চ্চার অনুভূতি নয়, কিংবা কশার সাহায্যে আত্মনিগ্রহজনিত অনুভূতি নয়। এ যেন ধূলো আর সূর্যালোকের ছবি আঁকেন, এমন কোনও শিল্পীর অনুভূতি—শুধু তীব্রতর হয়ে উঠেছে এই যা। এ কণ্ঠ শুনতে হলে আমরা যাই, যাঁরা আমাদের হিংসাপূর্ণ ইতিহাসে নেহাতই বিদেশীর মত, সেই সেণ্ট ফ্র্যান্সিস আর ব্লেকের কাছে।'(১২) মোহিনী চট্টোপাধ্যায় তরুণ ইয়েটসকে বলেছিলেন : 'শিশুদের শেখাও এ দেহ তাদের নয়'; আবার, 'এ দেহ-ই ব্রাহ্মণ।'(১৩) পরে ইয়েটস 'গীতাঞ্জলি'তে পড়লেন :

Life of my life, I shall ever try to keep
My body pure, knowing that thy
Living touch is upon all my limbs.(১৪)

যা ছিল তত্ত্ব কবির অভিজ্ঞানে তা উপলব্ধ সত্যের প্রত্যক্ষতা লাভ করল। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় দর্শনের মর্মকথা ইয়েটসের কাছে মোহিনী চট্টোপাধ্যায়ের চেয়ে অনেক বেশী প্রাণস্পর্শী করে উপস্থিত করেছিলেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

আধুনিক কালের খণ্ডিত সমাজ, খণ্ডিত কালচেতনা, এবং খণ্ডিত জ্ঞানের জন্য ইয়েটস যতখানি ক্লিষ্ট বোধ করেছেন, রবীন্দ্রনাথের জীবনের এবং তাঁর সংস্কৃতির স্বতঃস্ফূর্ত ঐক্য দেখে তাঁর প্রতি ঠিক ততখানি আকৃষ্ট বোধ করেছেন। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ ইয়েটসের মতো নিজ দেশের সংস্কৃতি ও চিন্তাক্ষেত্রের নায়ক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আভিজাত্যও ইয়েটসের ভালো লাগার কথা। আরও একটি

কারণ সম্ভবতঃ দুই কবির সখ্যের সহায়ক হয়েছিল। ভারতের আধ্যাত্মিক গৌরব এবং তার রাজনৈতিক পরাধীনতার মধ্যেকার ব্যবধানটি আয়র্লণ্ডের জীবনেও ছিল। ইয়েটস ভারতবর্ষ ও আয়র্লণ্ডের মধ্যে কি আধ্যাত্মিক মিল দেখেছিলেন তা প্রসঙ্গান্তরে আলোচিত হবে।

১৯৩২ সালে শ্রীপুরোহিত স্বামী নামে এক ভারতীয় সন্ন্যাসীর আত্মজীবনীর ভূমিকায় ইয়েটস লিখেছেন: 'আমি রবীন্দ্রনাথের সুন্দর কাব্যগ্রন্থ গীতাঞ্জলি'র জন্যে একটি ভূমিকা লিখেছিলাম, আর আজ বিশ বছর পর এমন একটি গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যা সমান গুরুত্বের বলে পরিগণিত হতে পারে।'(১৫) ইয়েটসের এ ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়নি। ইংলণ্ডেও বইটি প্রায় অজ্ঞাত। তাহলে ইয়েটস এ বই সম্পর্কে এমন বিস্ময়কর মন্তব্য করেছিলেন কি করে? পুরোহিত স্বামী পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তিনি ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার গুপ্ত ও রহস্যময় দিকের, শ্রদ্ধাহীনেরা বলবেন আষাঢ়ে দিকের, প্রতিভূও ছিলেন। স্বামীজীর আত্মজীবনীটি অনেক অলৌকিক ঘটনায় পূর্ণ, এ বইয়ের সঙ্গে 'গীতাঞ্জলি'র তুলনায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যখানির যে মূল্যায়ণ প্রকাশ পেয়েছে তা সম্ভব হয়েছে ইয়েটসের মনের কৌতূহলোদ্দীপক ইন্দ্রজাল ও অলৌকিক প্রীতির জন্যে। এ কথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যে আলোর চেয়ে অন্ধকারময় রহস্যের প্রতি ইয়েটসের কম অনুরাগ ছিল না। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে অশরীরী যোনীর অস্তিত্ব বিষয়ে ইয়েটসের মনোভাবটি খুব সরল নয়।

ইয়েটস পুরোহিত স্বামীর ভূমিকায় আরো লিখেছেন, কি করে আইরিশ প্রোটেষ্টাণ্ট দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে লেডি গ্রেগরি এবং তিনি, আয়র্লণ্ডের অলৌকিকে বিশ্বাসী অজ্ঞ জনসাধারণের দেখা হুরপরীর কাহিনী সংগ্রহে ব্যাপৃত হয়েছিলেন। এই অনুসন্ধানের ফলে তাঁরা এসে উপনীত হয়েছিলেন 'এক ঝাপ্‌সা

অন্ধকারের মধ্যে, এমন এক গর্ভাশয়ের মধ্যে যা থেকে সব কিছুর উৎপত্তি, এমন এক অবস্থার মধ্যে, "যেখানে উল্লাস ও যন্ত্রণা এবং কুকুর আর ঘোড়ার দেখা অপচ্ছায়া" যেন একই জায়গাতে স্থান পেয়েছে।'(১৬) কিন্তু সব সময় কবির মনে হয়েছে কী যেন একটা পাওয়া যাচ্ছে না। আর সে জিনিষটি নিয়ে এলেন পুরোহিত স্বামী। তাঁর 'ব্যাখ্যাকারী বুদ্ধি' এ অন্ধকারের বার্তাবাহী খণ্ড খণ্ড তথ্যগুলোকে এক প্রাচীন দর্শনের সূত্রে গ্রথিত করে ইয়েটসের মনকে তৃপ্ত করল।(১৭) আর এ অন্ধকারের সেতু দিয়ে আয়র্লণ্ড ও ভারতবর্ষ ইয়েটসের চিন্তা ও কল্পনায় মিলিত হল। পুরোহিত স্বামীর সহযোগিতায় ইয়েটস শুধু যে উপনিষদের তরজমা করেছিলেন তা নয়, পাতঞ্জলি-নির্দেশিত যোগ-প্রক্রিয়া এবং তান্ত্রিক রহস্য বিষয়েও অনেক জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

ইয়েটস ধীরে ধীরে ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করেছিলেন এবং তিনি এ আবিষ্কার সম্পূর্ণ করেছিলেন পুরোহিত স্বামীর সংস্পর্শে এসে। এ দীর্ঘ পরিচয়ের ইতিহাসে ইয়েটস রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব একটী ক্ষুদ্র ঘটনা মাত্র এবং শেষ জীবনে যখন তিনি উপনিষদের প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন তখন রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রতি তাঁর অনুরাগ অনেকখানি হ্রাস পায়। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে শুধু এ কারণেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি ইয়েটসের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছিল। এখানে ১৯৩৫ সনে রোদেনষ্টাইনের কাছে লিখিত ইয়েটসের একখানি চিঠি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ; 'জাহান্নামে যাক রবীন্দ্রনাথ। ষ্টার্জ মূর আর আমি মিলে তাঁর তিনখানি সুন্দর বই বের করেছিলাম ; তারপর তিনি বড় কবি হওয়ার চেয়ে ইংরেজী ভাষা জানাকে অনেক বড় জ্ঞান করলেন, আর ছাপলেন ভাবুকতার ভাপে ভরা জঞ্জাল ; এবং এ করে নিজের খ্যাতিকে নষ্ট করলেন। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী জানেন না, কোনও ভারতীয় ইংরেজী জানে না। যে ভাষা শৈশবে শেখা হয়নি, এবং তখন থেকে চিন্তার

বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি, সে ভাষায় গীতময়তা বা বৈশিষ্টের সঙ্গে কেউ কিছু লিখতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে আমি আবার ফিরে আসব, তবে এখন নয়—ফিরে আসব এ কারণে যে সম্প্রতি তিনি ইংরেজীতে কয়েকটি অতি সুন্দর গদ্য রচনা প্রকাশ করেছেন যা তাঁর কবিখ্যাতি অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ায় উপেক্ষিত হয়েছে।'(১৮) আর ১৯১২ সালে ইয়েটস রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত অনুবাদের জন্যে তাঁকে ইংরেজী ভাষার কবি হিসাবে তাঁদের 'সংসদে' নির্বাচন করার জন্য বৃটিশ বন্ধুদের কাছে ওকালতি করেছিলেন।(১৯)

কিন্তু ইয়েটসের কবি প্রকৃতি এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিরোধ এবং প্রতীচ্যের কবির প্রাচ্যের কবির প্রতি অসন্তোষের কারণ সম্পর্কে বিশেষ আলো পাওয়া যায় জোসেফ হোন লিখিত ইয়েটস জীবনী থেকে। ১৯৩৭ সালে একজন ভারতীয় অধ্যাপক ও ট্রিনিটি কলেজের ডক্টর ট্রেঞ্চ এবং ইয়েটসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এবং ভারতবর্ষ বিষয়ে একটী তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা হয়। এ আলোচনায় নাটকীয়তা ছিল :

ইয়েটস উত্তেজিত ছিলেন। তিনি এ বলে কথা শুরু করলেন, 'আমার বন্ধু রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরকে নিয়ে বড্ড বেশী লেখেন। তাঁর এ সব রচনার অস্পষ্টতায় আমার রাগ ধরে। আরেক রকম মরমিত্ব কাব্যের ক্ষতি করে তা হল পিটার বেল এবং প্রিমরোজ ঘটিত মরমিত্ব।' ডক্টর ট্রেঞ্চ বললেন, 'কিন্তু শিলার উপরের প্রিমরোজ-গুচ্ছ নিয়ে ওয়ার্ডসোওয়ার্থের কবিতাটি সম্পর্কে আপনি কি বলবেন? ফুল বৃন্তে, বৃন্ত পাথরে, পাথর বসুধায় সংলগ্ন, বসুধা তার মণ্ডলে নিষ্ঠ, এবং ঋতুর সব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সব কিছুর উপর বিধাতা।' ইয়েট্‌স এ প্রচ্ছন্ন তিরস্কার অগ্রাহ্য করে বললেন, 'আমি সারাজীবন উপনিষদের দর্শন থেকে প্রাণরস গ্রহণ করেছি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মরমিত্বের একটী দিক আছে যা আমি অপছন্দ করি। ভারতীয় কাব্যে আমি ট্র্যাজেডী দেখতে পাই না। আর ভারতীয়দের লেখা

উচিত উর্দু কিংবা বাংলায়।' অধ্যাপক বসু জবাব দিলেন, 'আমাদের সমস্যা দ্বন্দ্বে প্রবেশ করা নয়, দ্বন্দ্ব থেকে বেরিয়ে আসা।' ইয়েটস আরও বললেন, অক্সফোর্ডে ভারতীয়দের আলাপ করবার সময় মাত্র একজনকে দেখেছি যিনি 'ইংরেজীতে নিজকে প্রকাশ করার চেষ্টাকে ঘৃণা করতেন। তার কারণ সে ব্যক্তি ছিলেন নেপালী, তাই কখনও স্বাধীনতা হারাননি বা জোয়ালে মাথা লাগান নি। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী ছেড়ে দিন।' অধ্যাপক বসু বললেন, 'প্রশ্নটি জটিল। হিন্দু মুসলমানের ভিন্ন ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদের বোঝা-পড়া করতে হচ্ছে। আপনি ভারতবর্ষের জন্যে একটি বাণী দিতে পারেন?' 'এ পক্ষের এক লক্ষ লোক অপর পক্ষের এক লক্ষ লোকের সম্মুখীন হোক। বিরোধের উপর জোর দিন, ভারতের প্রতি এই আমার বাণী।' এরপর ইয়েটস দ্রুত বেগে ঘরের এক-দিকে গেলেন এবং সাটোর (২০) তরবারিটি নাটকীয় ভঙ্গিতে কোষ-মুক্ত করে চীৎকার করে বললেন, 'চাই দ্বন্দ্ব, আরও দ্বন্দ্ব।'(২১)

উপরের উদ্ধৃতি ইয়েটসের কাব্যিক রুচি ও মেজাজকে চিহ্নিত করছে এবং জীবন চেতনার দিক দিয়ে তাঁর ও রবীন্দ্রনাথের ব্যবধান যে যোজন যোজন তা প্রমাণ করেছে। সম্ভবতঃ ইয়েটস রবীন্দ্র-নাথের ঈশ্বরানুভূতিতে অস্পষ্টতা ছাড়াও তাগিদহীনতা অভ্যাস ও ভাবালুতা দেখতে পেয়েছেন। এখানে লক্ষ্য করার মত যে ইয়েটস উপনিষদের একজন অনুরক্ত পাঠক, এ কথা তিনি জোরের সাথে ঘোষণা করেছেন। তিনি বোঝাতে চাইছেন যে উপনিষদে এমন গুণ আছে যা তিনি রবীন্দ্রনাথে দেখতে পান না। উপনিষদের অনেক গুণের মধ্যে এ গুণটি যে কি তার কিঞ্চিৎ ধারণা হয় ইয়েটসের এক আলোচনায় ঈশ উপনিপদ থেকে উদ্ধৃত ক'টি লাইন থেকে। ১৯৩৬ সালে আধুনিক ইংরেজী কাব্য বিষয়ে এক বেতার বক্তৃতায় ইডিথ সিটওয়েলের 'Ass Face' কবিতাটির আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন:

গভীর দর্শনের সৃষ্টি ভয় থেকে। পায়ের তলায় অতলস্পর্শ গহবর উন্মোচিত হয়, আর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সমস্ত পূর্ব ধারণা···এর অতলে বিলীন হয়। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সেই প্রাচীন প্রশ্ন জিজ্ঞাস করতেই হবে: সত্য কোথাও আছে কি? ঈশ্বর আছেন কি? আত্মা আছে কি? আমরা ভারতের পবিত্র গ্রন্থের মত উচ্চকণ্ঠে বলে উঠি: 'ওরা সোনার ছিপি দিয়ে বোতলের মুখ বন্ধ করেছে; ওটা খুলে ফেল। সত্যকে মুক্ত কর'।(২২)

ইয়েটস রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবোধে এ তীব্রতা, তাঁর দার্শনিক কবিতায় হৃদয়রক্ত মথিত করা এ জাতীয় কোনও জিজ্ঞাসা দেখতে পাননি। এবং পাওয়ার কোনও কারণও নেই। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতার দুর্ব্বল দিকের যে সমালোচনা ইয়েটস করেছেন তার যথার্থতা মেনে নিলেও এখানে স্মর্তব্য যে, সংশয়াকুল হৃত-ঐতিহ্য আধুনিক য়ুরোপীয়দের মত বিশ্বাস আবিষ্কারের জন্য রবীন্দ্রনাথের নূতন করে আদিম পৃথিবীর শূন্যতার ও ত্রাসের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়নি। কোনও অবিশ্বাস তাঁর বিশ্বাসে কোনও দিনই ফাটল ধরাতে পারেনি, যেমন ধরিয়ে ছিল জেরার্ড ম্যানলি হপকিন্‌সের ক্ষেত্রে। কোনও সংশয় বা বিরুদ্ধ চেতনার সঙ্গে তাঁকে যুঝতে হয়নি। অনিশ্চয়তার কালো গহবরে ঐতিহ্যলব্ধ ধারণা বিসর্জন দেয়া দূরে থাকুক, তিনি তাঁর দ্বন্দ্ব-মুক্ত আনন্দময় অধ্যাত্ম নিশ্চয়তা পেয়েছিলেন ঐতিহ্য সূত্রে।

ভারতীয় কাব্যে তথা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে 'ট্রাজেডি' নেই বলে ইয়েটস অভিযোগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের স্বভাবে গভীর দ্বন্দ্ব ছিল কিনা, থাকলে তা কতখানি প্রকাশ পেয়েছে, (২০) এ বিতর্কে না গিয়েও বোধহয় বলা চলে, বেদান্ত দর্শনের প্রবণতা অনুযায়ী তাঁর মন দ্বন্দ্ব ও দ্বৈতকে ততটা স্বীকার করেনি যতটা করেছে ঐক্যকে। তাই তাঁর কাব্যে কোনও মৌল, কোনও আত্যন্তিক বিরোধ প্রকাশ পায়নি। তাই তিনি ইডিথ সিটওয়েলের মত

রাসভ চর্মাবৃত বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের রাসভ চীৎকারে (!) কেইন ও আবেলের কলহ শুনতে পাননি,(২৪) কিংবা ইয়েটসের মত মানুষের স্বভাবের ভিতরকার ক্ষয়হীন weasel's tooth(২৫) দেখতে চাননি। পত্রপুটের 'পৃথিবী' কবিতায় তিনি 'বিপরীত' মানুষের জীবনের 'দুঃসহ দ্বন্দ্ব' এবং 'শুভ-অশুভে'র কথা বলেছেন। এগুলো তাঁর কল্পনায় অতি সামান্য স্থান অধিকার করেছিল। এমনকি তিনি যখন পৃথিবীর ইতিহাসের সেই 'আদিম বর্ব্বরের' কথা বলেন যা 'স্বভাবের কালো গর্ত থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসে এঁকে বেঁকে তখনও মনে হয় না যে এ কুটিল সরীসৃপ (আপাততঃ জয়ী হলেও) অমর; কিংবা তাকে দেবতারা বিবর্তনের আরো কয়েক ধাপ পরে নিঃশেষে সংহার করতে পারবে না। অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের গোটা কাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলার উপায় নেই যে এ 'নাগদানবের' হাতে শুভের অন্তিম পরাজয় তিনি মেনে নিয়েছিলেন, তাঁর কল্পনা অশুভের উপর বেশীক্ষণ নিবদ্ধ থাকতে পারেনি। 'শিশুতীর্থে' তাঁর অশুভ কল্পনার ক্রূর বাস্তবতা যে প্রত্যয় সৃষ্টি করে তাঁর শুভ সম্ভাবনার চিত্র মোটেই তা করে না। তবুও কবিতাটির শেষ শুভে। 'পশুই শাশ্বতঃ' এ কথা পাঠক ভুলতে না পারলেও কবিতার শেষে কবি ভুলে যান। সাধারণভাবে এ সত্য যে দ্বন্দ্ব দেখে রবীন্দ্রনাথ পীড়িত হন, অশুভ দেখে তিনি মানুষের জন্যে উৎকণ্ঠিত হন, সঙ্গেসঙ্গে ব্যাকুল প্রার্থনায় তাঁর দ্বন্দ্ব ও অশুভবোধ তলিয়ে যায়।

ইয়েটসও গভীর ভাবে ঐক্য কামনা করেছেন, কিন্তু সে এক অবাস্তবায়িত সুদূর সম্ভাবনা মাত্র। তাঁর কাব্যে বৃত্ত একীভূত সত্যের প্রতীক। এ দৃশ্যমান অব্যবস্থাপিত বিশ্বের ব্যাপার নয়, খুব বিরল মুহূর্তে মানুষের অভিজ্ঞতায় এ ধরা পড়ে। তাই তিনি কল্পনা করেছেন বৃত্তের ভিতর দু'টী পরস্পর অনুবিদ্ধ বিপরীতমুখী গতি যার একটী অপরটির সাথে বিরামহীন দ্বন্দ্বে লিপ্ত। এ দ্বন্দ্ব নিয়মে বাঁধা, এক পক্ষের শক্তি যখন বাড়ে অন্য পক্ষের শক্তি

তখন হ্রাস পায়, পর্যায়ক্রমে এ চলতে থাকে। হয়ত কোনও অনন্তে এ দ্বন্দ্বের অবসান হবে। কিন্তু পার্থিব সীমায় চেতনার অর্থ দ্বন্দ্ব, (২৬) আর দ্বন্দ্ব মানুষের স্বভাবে, আত্মিক জীবনে এবং সভ্যতার ইতিহাসে। 'আমরা বাঁচতে শুরু করি, যখন থেকে জীবনকে ট্র্যাজেডি বলে ভাবি।' (২৭) তাঁর 'There' কবিতায় আমরা পড়ি :

There all the serpent-tails are. (২৮)

কিন্তু ভুজঙ্গিনী প্রকৃতি মুখ দিয়ে ল্যাজ স্পর্শ করে যে বৃত্ত সৃষ্টি করে তা জীবনায়ত্ত নয়, অভীপ্সিত মাত্র ; যা আপাততঃ বাস্তব এবং যা তিনি সাগ্রহে এবং সানন্দে গ্রহণ করেছেন তা হল :

The frog spawn of a blind man's ditch
A blind man battering blind men. (২৯)

কী হিংস্র আর আবেগময় বিরোধের চিত্রকল্পে কবির অন্ধ জীবন ক্ষুধা প্রকাশ পেয়েছে। ইয়েটস দ্বন্দ্বকে চিন্তার, অভিজ্ঞতার, ব্যক্তির এবং বিশ্বের সব সম্পর্কের মূলনীতি বলে গ্রহণ করেছিলেন ; অভিজ্ঞতার রূপায়ণেও তিনি দ্বন্দ্বের কাঠামোকে বার বার ব্যবহার করেছেন। এমন কি দ্বন্দ্বের সূত্র ধরে তাঁর কাব্যে পরিণতি এসেছিল। প্রথম থেকেই ইয়েটস দুরকমের মূল্য বিরোধ দেখেছিলেন : একদিকে অক্ষয় সৌন্দর্য, প্রেম, সত্তার মুক্তি ও স্বতঃস্ফূর্ততা, অন্যদিকে ক্ষয়, বাধা, বিচ্ছেদ, বিশ্লেষণ। কিন্তু রেখার অস্পষ্টতায়, ভাষার অবসন্নতায় এবং ঘুম ঘুম ছন্দের ওঠা পড়ায় তাঁর পলায়নী কাব্য মরজগতকে কার্যতঃ অস্বীকার করেছিল। যখন থেকে কাব্যিক স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে ইয়েটসের রচনায় বস্তুজগত অপর জগতের মুখোমুখী হল, অর্থাৎ যখন থেকে এ দুই জগতের সম্পর্ক দ্বন্দ্বময় হয়ে উঠল, তখন থেকে তাঁর কবিতা পেল রৌদ্র-উদ্ভাসিত পৃথিবীর তীক্ষ্ণতা এবং জ্যা-আঁটা ধনুকের দৃঢ়তা। আত্মপ্রকাশকামী কবি-নায়ক নিজ সত্তা ও বস্তুর সংঘাতবেগ থেকে

পেলেন বস্তুকে অতিক্রম করার শক্তি। বৃত্তের যে ভগ্নাংশে মানুষের অস্তিত্ব তার কোনও অনুভূতি বা অবস্থার কথাই ইয়েটস ভাবতে পারেননি সংশ্লিষ্ট বিপরীতকে সামনে দাঁড় না করিয়ে। ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটিও যে রবীন্দ্রকাব্যের সরল আত্মসমর্পনের সম্পর্ক নয়, বরঞ্চ এক ধরণের বৈরিতার সম্পর্ক তা আমরা যথাস্থানে দেখতে পাব। অবশ্য একটু ভেবে দেখলে বোঝা যাবে যে বিপরীতের মধ্য দিয়ে ইয়েটস নিরন্তর পরিপূরককে খুঁজেছেন, সুতরাং সব বিরোধকে জ্ঞানের ও জীবনের অঙ্গীভূত করে ঐক্যকে আয়ত্ত করতে চেয়েছেন।) দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে ঐক্য আসবে এ আশা তিনি এক সময় করতেন। তাঁর ক'টি পংক্তি প্রসঙ্গচ্যুত করে এখানে বলা চলে:

For nothing can be sole or whole
That has not been rent. (৩০)

ইয়েটসীয় দ্বন্দ্ব জীবনে একই সঙ্গে সৃষ্টিশীল ও বিধ্বংসী, শিল্পে সম্পূর্ণ সৃষ্টিশীল; তা এত মূল্যবান বলেই তিনি ট্র্যাজিক অনুভূতির পরিমাপে জীবনের মূল্য নিরূপণ করছেন, কিন্তু এ দ্বন্দ্বের অনবসানতা অসম্পূর্ণতাবোধকে অনতিক্রম্য করে তাঁর জীবন চেতনাকে গভীরতর অর্থে বিয়োগান্ত করে তুলেছিল।

ইয়েটসের সঙ্গে তুলনায় রবীন্দ্রনাথের ঐক্যবোধ যে অনায়াসলব্ধ, এবং সে কারণে তাঁর দ্বন্দ্ববোধ যে তীক্ষ্ম হতে পারেনি, তা বোধ হয় অনস্বীকার্য। ইয়েটস একবার বলেছিলেন: 'প্রাচ্যের কাছে সব কিছুর সমাধান আছে, তাই সে ট্রাজেডি কাকে বলে জানে না।' (৩২)

অধ্যাপক বসুর কাছে ইয়েটস ভারতবর্ষকে যে বাণী দিয়েছিলেন তাতে আরও প্রমাণ হয় যে তিনি হিংসায় বিশ্বাসী ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর মনোভাবকে নাটুকে এবং একটু 'কাব্যিক' বলে ধরে নেওয়ার লোভ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু তাঁর হিংসার একটা

দার্শনিক, অন্তত ভেষজতাত্ত্বিক, ভিত্তি ছিল। তাঁর জীবনের সর্বশেষ কবিতায় তিনি লিখেছেন :

> You that Mitchel's prayer have heard,
> Send war in our time. O Lord !
> Know that when all words are said
> And a man is fighting mad,
> Something drops from eyes long blind
> He completes his partial mind. (৩৩)

সুতরাং পূর্ণতার জন্যে দ্বন্দ্ব এবং হিংসার প্রয়োজন আছে। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের কাছে এ দর্শন গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হত না।

ডাবলিন ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে রক্ষিত হোনের কাগজ পত্রাদি থেকে জানা যায় রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর বিষয়ক কবিতার অস্পষ্টতা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে ইয়েটস আরও একটু মন্তব্য করেছিলেন। তিনি ভারতীয় কবির সঙ্গে নিজের তুলনা করে বলেছিলেন যে তাঁর কবিতায় সব সময় তাঁর লক্ষ্য ছিল স্পষ্ট চিন্তা ও যুক্তিসহ নিখুঁত প্রকাশ। ইয়েটস নিজের সম্পর্কে যে দাবী করেছেন তা' অস্বীকার করা সম্ভব নয়; তবে এ কথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথ ও ইয়েটসের ঈশ্বরবোধ এক ধরণের ছিল না। একজন পরম সুন্দরের লীলাকে অন্তর্লোকে ও বহির্লোকে প্রতিক্ষণে প্রত্যক্ষ করেছেন, নানারূপে নানা বর্ণচ্ছটায় তাঁর প্রকাশ দেখতে পেয়েছেন, আনন্দে প্রেমে শংকায় তাঁকে আপন অস্তিত্বে উপলদ্ধি করেছেন। আর একজন কাব্যের ধ্বনি ও মিলের খাতিরে ঈশ্বরের মহিমাকে প্রয়োজন মত কমিয়েছেন বাড়িয়েছেন, কখনও জ্যামিতিক-নন্দন-তাত্ত্বিক কারণে-তাঁর বিশ্বকল্পনাকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্যে সৃষ্টিকর্তাকে 'ত্রয়োদশ সূচী ঘন ক্ষেত্র', বলে অভিহিত করেছেন, কখনও বা তাঁকে প্রতিপক্ষ হিসেবে গ্রহণ করে, বিরোধের মধ্য দিয়ে, একটু নিকটতর সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। কিন্তু ঘোর অহংবাদী ইয়েটস

রবীন্দ্রনাথের মত ঈশ্বরের সঙ্গে কোনও মন্ময় সম্পর্ক স্থাপন করেন নি। এ কারণে তাঁর কবিতায় ঈশ্বর মন্ময় অনুভূতির অস্পষ্টতা থেকে মুক্ত, তাঁর উল্লেখ অতি সতর্ক, সুবিবেচিত এবং রবীন্দ্রকাব্যের তুলনায় বিরল। ইয়েটস দু একবার মরমী অভিজ্ঞতার 'দাবী'ও করেছেন।(৩৪) একবার তাঁর 'আত্মা'-সচেতন অহঙ্কারকে বিসর্জন দিয়ে স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পনও করেছেন, কিন্তু এ সব ব্যতিক্রম মাত্র। তবে এ সব ক্ষেত্রেও তার সুমতি, ব্যঞ্জনাময় অথচ স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের কাছে ঈশ্বর সূর্যকর কিংবা বাতাসের মতো, তাঁকে তিনি এড়াতে পারেন নি—এড়াতে চানও নি; তাঁর চেতনা কখনো ঈশ্বরশূন্য হয়নি; তাঁর দীর্ঘ জীবনের কাব্য সাধনায় তাই ঈশ্বর নানা বেশে উপস্থিত। (৩৬) ইয়েটস রবীন্দ্রকাব্যের অতি পরিমিত অংশের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সুতরাং তাঁর সমালোচনার যেটুকু যথার্থ তা হল এই যে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরানুভূতির সব প্রকাশে 'আবেগের চাপ', 'বিশ্বাসের উত্তাপ', 'ব্যঞ্জনার প্রাখর্য', সমানভাবে উপস্থিত ছিল না, এবং এ কারণে তা কাব্যিক বিচারে সামান সার্থক হয়নি। 'বলাকা'র কবি উচ্চাঙ্গের দার্শনিক মননে সক্ষম এ কথা হয়তো ইয়েটস জানতেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের বিস্ময়কর পরিণতি, তাঁর মননের দৃঢ়তা, আবেগের সংযম, ভাষার নির্মম মিতাচার এবং ব্যঞ্জনার তীক্ষ্মতা ও জটিলতা, এ সব তিনি কি করে জানবেন? প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে নিরাভরণতা, অর্থগাঢ়তা ও সংহত শক্তির দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্য ইয়েটসের পরিণত রচনার সঙ্গে তুলনীয়। এখানে এও বলে রাখা উচিত যে এ অংশের মতামতের ভিত্তি কেবল রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং এ মতামত তাঁর গদ্যরচনা ও নাটক দ্বারা পুরোপুরি সমর্থিত হয় কিনা সে বিষয়ে আলোচনার অবকাশ আছে।

ইয়েটসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল দেখাতে গিয়ে কেউ কেউ আইরিশ কবির প্রথম দিকের কোনও কোনও কবিতার উল্লেখ

করেন। কিন্তু ১৯৩৪ সালে, অর্থৎ অধ্যাপক বসুর সঙ্গে কথোপকথনের তিন বছর আগে, ইয়েটস 'Ribh Considers Christan Love Insufficient' কবিতাটি লেখেন। কবিতাটির ভাবের কাঠামো অনন্য এবং এর শেষ স্তবকের চিন্তা ও অনুভবের ভঙ্গি বিস্ময়করভাবে রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি, এবং তাঁকে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেয়।

কবিতাটির নামের মধ্যে খৃষ্টীয় প্রেমের মূল্যায়ণ স্পষ্ট। ইয়েটস এর কারণ দিয়েছেন অন্য আরেকটি কবিতায়ঃ মানুষ শুধু বংশবৃদ্ধি করে চলেছে আর ঈশ্বর মাত্র তিন, তার কারণ মানুষ ঈশ্বরের মত ভালবাসতে পারে না। মানুষের প্রেম উত্তাপ ও তীব্রতা হারায় উত্তাপহীন দেহ কিংবা মনের স্পর্শে, তাই বিশ্বময় পুনরাবৃত্তির এ ঘটা, প্রকৃতিতে সংখ্যার এ বাড়াবাড়ি। আলোচ্য কবিতায় ইয়েটস খৃষ্টীয় প্রেম ছাড়া আধুনিক গণকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের মন ও দেহহীন নৈর্ব্যক্তিক প্রেমেরও সমালোচনা করেছেন। সবার উপরে 'ঘৃণা'কে ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভের উপায় বলে তিনি গ্রহণ করেছেন। ইতির জন্যেই নেতি, এ নেতির প্রকাশ নায়কের অতি সবল অতি সচেতন আমিত্বে উগ্র; কিন্তু সব মানবিক সম্পর্ক, কর্ম, ভয় ও ছলনাকে বর্জন করে, সব 'দৈহিক ও মানসিক আসবাব' পরিত্যাগ করে, নেতির গভীর থেকে গভীরে পৌঁছে 'আমি' আবিষ্কার করল ইতিকে, আর অমনি উদ্বেল আত্মসমর্পণে নত হল ভগবানের কাছে। কবিতাটির সম্পুর্ণ উদ্ধৃতি প্রয়োজনঃ

Why should I seek for love or study it ?
It is of God and passes human wit.
I study hatred with great diligence,
For that's a passion in my own control,
A sort of besom that can clear the soul
Of everything that is not mind or sense.

Why do I hate man, woman or event?
That is a light my jealous soul has sent.
From terror and deception freed it can
Discover impurities, can show at last
How soul may walk when all such things are past,
How soul could walk before such things began.

Then my delivered soul herself shall learn
A darker knowledge and in hatred turn
From every thought of God mankind has had.
Thought is a garment and the soul's a bride
That cannot in that trash and tinsel hide!
Hatred of God may bring the soul to God.

At stroke of midnight soul cannot endure
A bodily or mental furniture.
what can she take until her Master give!
Where can she look until He make the show!
What can she know until He bid her know!
How can she live till in her blood He live! (৩৭)

তৃতীয় স্তবকের ঈশ্বর বিদ্বেষের ভঙ্গিমাটি লক্ষণীয়। আরও লক্ষণীয় ইয়েটসের আকস্মিক আত্মসমর্পন। এ কবি নিজেকে সৃষ্টিকর্তার সমান না হলেও তাঁর প্রায় কাছাকাছি বলে মনে করতেন; তিনি শঙ্করাচার্যের মত আপোষহীন ঐক্যবাদী ছিলেন, সুতরাং আত্মা ও পরমাত্মা, বিষয় ও বিষয়ী, প্রার্থনাকারী ও প্রার্থনা শ্রবণকারীর মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখতে চাননি। শুধু এ কবিতাটি এর ব্যতিক্রম। এখানে তিনি স্রষ্টার কাছে বিনম্র প্রার্থী।

বলা বাহুল্য, শেষের পংক্তি কটির সুর এবং 'গীতাঞ্জলি'র সুর এক এবং এ আত্মসমর্পণের ভাব 'গীতাঞ্জলি'র পাতায় পাতায়

ছড়ানো। এখানে ইয়েটসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শব্দগত মিল থাকা নিষ্প্রয়োজন। ইয়েটস ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক তাগিদ ও প্রেরণায় এ কবিতা লিখেছিলেন, যদিও এ তাঁর ভাবজীবনের এক বিশেষ আবহাওয়ায় রচিত। এ আবহাওয়া তৈরী করতে সাহায্য করেছিল বার্দ্ধক্যের প্রশ্নসঙ্কুল মন, পুরোহিত স্বামীর দর্শন এবং তাঁর সাহচর্য। আরও প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে স্মরণযোগ্য যে, পুরোহিত স্বামী এবং রবীন্দ্রনাথ দু'জনেই প্রার্থী ও প্রভুর দ্বৈত স্বীকার করতেন। তাই ইয়েটসের মন যখন প্রার্থনা এবং নিবেদনে আকুল ও আর্দ্র হল তিনি প্রায় 'গীতাঞ্জলি'র কবির ভাষায় কথা কয়ে উঠলেন।(৩৮)

অবশ্য এই দুই কবির প্রকৃতি এত ভিন্ন যে তাঁদের সাদৃশ্য তাঁদের বৈসাদৃশ্যের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। রবীন্দ্রনাথ ইয়েটস থেকে কিছু গ্রহণ করেন নি, এবং ইয়েটসও উল্লিখিত ব্যতিক্রম ছাড়া রবীন্দ্রনাথ থেকে এমন কিছু লাভ করেন নি যা তাঁর কবিতায় আঙুল দিয়ে চিহ্নিত করা যাবে। রবীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর ইয়েটস রদেনস্টাইনকে লিখেছিলেন যে তিনি তাঁর থেকে নিজ শিল্পে অনুপ্রেরণা পান।(৩৯) তার অর্থ এ নয় যে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় তাঁর মতো কবিতা লিখতে উদ্যোগ করেছিলেন। কোনও বড় কবি তা করেন না, ইয়েটসের মত স্বনিষ্ঠ মহৎ কবির বেলায় তো তা একেবারেই অচিন্তনীয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়ের সময়ে ইয়েটস আপন নির্দিষ্ট পরিণতির পথে দৃঢ়পদে অগ্রসরমান। তখন তাঁর বিশ্রুত 'cold and passionate' রীতি সূচিত হয়ে গেছে, যাতে 'রক্ত, কল্পনা এবং বুদ্ধি' একসঙ্গে প্রবহমান। রবীন্দ্রনাথ ইয়েটসের কয়েকটি সাংস্কৃতিক অভীপ্সা এবং আধ্যাত্মিক প্রত্যয়কে স্পষ্ট এবং শক্তিশালী করা ছাড়া তাঁর কাব্যে কিছু যোগ করেন নি।

আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ভারতীয়দের সাথে আইরিশ কবির পরিচয় সার্থক হয়েছিল এভাবে। পরিণামে ইয়েটস জীবনের

মধ্যে সত্যকে অনুভব করে বস্তুর অন্তরে আত্মাকে দেখেছিলেন, এবং এ কারণে একদিকে বস্তুর একাধিপত্য দৃপ্তকণ্ঠে অস্বীকার করেছেন, আর অন্যদিকে তাঁর অতিবস্তুবিহারী কল্পনাকে বস্তুর মর্মোদ্ঘাটনে নিয়োগ করেছেন, তাঁর কাব্যের মূল জীবনে ও ঘটনায় দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন। বস্তু ও আত্মায় কোন ছেদ নেই, প্রতীক ও প্রতীকাতীত শেষ পর্যন্ত এক—Natural and supernatural with the self-same ring are wed (৪০)—এ কথা যখন ইয়েটস বুঝতে পারলেন, বস্তুর প্রতি তাঁর অনুরক্তি বাড়ল, সেই সঙ্গে তাঁর কবিতা হয়ে উঠল অসাধারণ স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল। অবশ্য এ জন্যে ইয়েটসের কোন ব্যক্তিবিশেষ বা উৎসবিশেষের কাছে ঋণ স্বীকারের প্রশ্নই উঠে না, কেননা এ বোধ তাঁর সারাজীবনের অভিজ্ঞতা উপলব্ধি পড়াশোনা, এক কথায় তাঁর জটিল কাব্যজীবনের পরিণতির ফল।

তাঁর উত্তরজীবনে ইয়েটসের কাছে প্রাচী এবং প্রতীচি মানুষের মনের কতগুলো স্থায়ীগুণ বা প্রবণতার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। প্রাচীর আকর্ষণীয় দিক তার 'সারল্য', 'স্বাভাবিকতা', 'ঐতিহ্যবোধ', 'আনুষ্ঠানিকতা,' আর তার মন্দ দিক তার 'আকারহীনতা,' 'অস্পষ্টতা,' 'অমূর্ততা,' 'আত্মনিগ্রহ,' ও 'আত্মসমর্পণেচ্ছা'। প্রতীচির বৈশিষ্ট্য তার 'দেহীজীবন', 'বাস্তবতা', 'আক্রমণমুখিতা,' তার কল্পনার সুব্যক্ত রূপময়তা এবং ইতিহাসে অসীমের প্রকাশে গুরুত্বদান। এ গুণগুলো ভৌগোলিক হলেও দেশকাল নির্বিশেষে যে কোনও দেশে যে কোন কালে দেখা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ইয়েটস প্রাচ্যের প্রায় সব ক'টি চিত্তাকর্ষক গুণ দেখতে পেয়েছিলেন, এবং এ জন্যে শেষ অবধি তাঁকে মূল্য দিয়েছেন।

১৯৩১ সনে ইয়েটস রবীন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন: 'আপনার কবিতা আমাকে উদ্দীপ্ত করে। গত কয়েক বছর আপনার গদ্য রচনায়, "ঘরে বাইরে", "জীবনস্মৃতি" গল্প ইত্যাদিতে

প্রজ্ঞা ও সৌন্দর্য দুই-ই দেখতে পেয়েছি। আপনার সঙ্গে যখন দেখা তার পরে আমি বিয়ে করেছি, আমার দু'টি ছেলে মেয়েও আছে। আমি এখন জীবনের সঙ্গে নিবিড়তর ভাবে যুক্ত বোধ করি। যা জীবন নয় যা জটিল গ্রন্থি, যা যান্ত্রিক, তা থেকে নিজেকে যখনই আমি আলাদা করে দেখেছি তখনই জীবন আমার কল্পনায় এশীয় রূপ নিয়েছে। এই রূপ আমি প্রথম দেখতে পাই আপনার বইগুলোতে, পরে কতগুলো চীনা কবিতায় এবং জাপানী লেখকের গদ্য রচনায় আপনার কবিতা যখন প্রথম পড়ি কী উদ্দীপনাই না অনুভব করেছিলাম, মনে হয়েছিল এ যেন মাঠ আর নদী থেকে বেরিয়ে এসেছে তাদের অপরিবর্তনীয় সুষমা নিয়ে।' (৪১)

কেউ হয়তো বলবেন, এ চিঠির পরও তো রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও কবিতা সম্পর্কে ইয়েটস অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এর জবাবে বলা চলে যে রবীন্দ্রনাথের যে গুণ তাঁকে আকর্ষণ করেছিল তার সম্পর্কে তাঁর কখনও মত বদলাতে হয় নি—অন্ততঃ তার কোনও প্রমাণ নেই—কেননা আইরিশ কবির কাছে এ সাহিত্যের এক বহুপ্রার্থিত গুণ।

আরও মনে রাখতে হবে যে ইয়েটস জীবনের এশীয় রূপের অন্বেষণ করলেও তিনি এশিয়াকে ভয়ও করতেন। কারণ প্রাচী ও প্রতীচি পরস্পরের প্রতিপক্ষ, তারা মানবজীবনের অন্তিম বৈপরীত্যের বিশাল ভৌগোলিক প্রতিভূ। কালের যে অমোঘ আবর্তনে ইয়েটস বিশ্বাস করতেন, তার ফলে তারা নিকটবর্তী হতে পারে, এশিয়া য়ুরোপীয় হতে পারে, য়ুরোপ এশীয় হতে পারে—নিজ নিজ সত্তা অক্ষুণ্ন রেখে কিংবা একে অন্যকে গ্রাস করে। দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি শেষ জীবনে ইয়েটসকে বিচলিত করেছিল। তাঁর ধারণায় য়ুরোপের গৌরবোজ্জ্বল কীর্তি সম্ভব হয়েছে এশিয়াকে দমন করে—খৃষ্টধর্মের 'নিরাবয়ব অন্ধকারকে'(৪২) অনুপাতে রেখায় আলোতে সীমিত

চিহ্নিত ও মূর্ত করে। তিনি বিশ্বাস করতেন সালামিসের নৌ যুদ্ধে এশিয়ার 'আকারহীন বিশালত্ব'কে পরাজিত করেছিল গ্রীসের নৌশক্তি নয়, পাইথেগোরাসের গণিতের উপর প্রতিষ্ঠিত ফিডিয়াসের ভাস্কর্যের অনুপ্রেরণা। এশিয়ার অন্ধকার গর্ভাশয় থেকে নির্গত হয়ে সুবিন্যস্ত গ্রীক-রোমক সংস্কৃতিকে বিপর্যস্ত করেছিল বলে ইয়েটস খৃষ্টধর্মকে কখনও প্রীতির চোখে দেখেননি। অপরদিকে তিনি বাইজেন্টিয় ও রিনেসাঁস যুগের শিল্প ও স্থাপত্যের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত ছিলেন অন্যান্য কারণের মধ্যে এ কারণে যে তাতে তিনি অতীন্দ্রিয় ও অবিমূর্তকে দেখেছেন অবয়বে তীক্ষ্ম ও দ্যুতিমান।(৪৩) য়ুরোপীয় শিল্প সাহিত্যের প্রকৃতি ও প্রবণতা লক্ষ্য করে ইয়েটস শঙ্কিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে আবার বুঝি য়ুরোপের মনে একটা এশীয় বিপর্যয় ঘনিয়ে আসছে, প্রাচীর মন্দ দিক বুঝি প্রতীচ্যের ভালো দিককে গ্রাস করবে। এ যুগের তিনটি প্রতিনিধিত্বমূলক রচনায়, জয়েসের 'ইউলিসিস,' ভার্জিনিয়া উলফের 'ওয়েভস' এবং এজরা পাউণ্ডের 'ক্যান্টোজ'-এ ইয়েটসের মতে 'অভিজ্ঞতার প্লাবন যেন ভেঙে পড়ছে সমস্ত রেখা ও রঙের সীমা গুলিয়ে'। তাঁর মনে হয়েছে এ নতুন সাহিত্যে 'মানুষ কিছুই নয়।'(৪৪) বলা বাহুল্য এ পরিস্থিতি তাঁর কাছে মনে হয়েছে এশীয়। সুতরাং শঙ্কা এবং আত্মরক্ষার তাগিদে তিনি তাঁর য়ুরোপীয় ঐতিহ্য সংস্কার ও সত্তার উপর উগ্রভাবে জোর দিয়েছেন ; সেই সঙ্গে তিনি মানুষের মূল্যহানি ও সচেতন মনের কর্তৃত্ব হারানোকে, অস্পষ্টতা সৃষ্টি ও সাধারণীকরণের প্রবণতাকে, তিরস্কার করেছেন। অস্পষ্টতার অপরাধে এ তিরস্কারের কিছু অংশ রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যেও জুটেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতি ইয়েটসের অসহিষ্ণুতাকে এ পরিপ্রেক্ষিতেই বুঝতে হবে।

১ রবীন্দ্র-জীবনকথা, কলিকাতা, ১৯৬০, পৃ. ১১৫।

২ Autobiographies, London, 1955, p. 333.

৩ The Pathway,' Gollected Works, Stratford, 1908, Vol. VIII, p. 195.

৪ Autobiographies, p. 92.

৫ John Eglinton, A Memoir of A. E., London, 1937 p. 20.

৬ Pages From a Diary Written in 1930, Dublin, 1944, pp. 49-50.

৭ 'Thd Pathway,' Collected Works, Vol. p. 191.

৮ A Vision, London, 1925, p. 251.

৯ Gitanjali, London, 1943, p. xx.

১০ Ibid., pp. XIII-XIV

১১ Ibid., p. 35.

১২ Ibid., p. XIX.

১৩ 'The Pathway', Collected Works, Vol. VIII, pp. 193 & 195.

১৪ Gitanjali, p. 3.

১৫ Shri Purohit Swami, An Indian Monk (His Life and Adventures), London, 1932, p.XV.

১৬ Ibid., pp. XVII—XVIII.

১৭ Ibid., p. XVIII.

১৮ The Letters of W. B. Yeats, London, 1954, pp. 834-5.

১৯ Ibid., pp. 572-73. (ইয়েটস এডমণ্ড গসকে লিখেছেন : 'আমি ইণ্ডিয়া সোসাইটিকে বলেছি রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলো আপনার কাছে পাঠাতে। এগুলো পড়ে আপনি আমার একটা কথা ভেবে দেখবেন। আমার মতে তাঁকে আমাদের সংসদে নির্বাচিত করলে বিশেষ

কল্পনাশীলতার পরিচয় দেয়া হবে। তিনি বাংলা দেশের মহান কবি, তাহলেও শুধু তাঁর ইংরেজী অনুবাদের জন্যেই তিনি নির্ব্বাচনযোগ্য।)

২০ ঐতিহ্যানুগ জাপানী কারুকৃতির নিদর্শন এ প্রাচীন তরবারিটি ইয়েটসের প্রিয় ছিল। তিনি এটি সাটো নামক এক জাপানী ভদ্রলোকের কাছ থেকে উপহার পেয়েছিলেন। কবি তাঁর Resurrection নাটকটি এঁকে উৎসর্গ করেন।

২১ Joseph Hone, W. B. Yeats, London 1942, pp. 458-59.

২২ Essays : 1937, p. 21.

২৩ 'সাহিত্য চিন্তা'য় শিবনারায়ণ রায় রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলাকে তাঁর অন্তর জীবনের যে গূঢ় রহস্য ও দ্বন্দ্বের প্রতিফলন বলে দাবী করেছেন তার প্রকাশ কবির ব্যবহৃত অন্য কোনও শিল্পমাধ্যমে সন্দেহাতীত রূপে স্পষ্ট নয়। এর সঙ্গে ইয়েটসের শেষ লেখার এ অকুণ্ঠ স্বীকৃতি তুলনীয় ঃ

You think it horrible that lust and rage
Should dance attention upon my old age ;
They were not such a plague when I was young ;
What else have I to spur me into song ?

(The Spur)

অথবা

Those masterful images because complete
Grew in pure mind, but out of what began ?
A mound of refuse or the sweepings of a street,
Old kettles, old bottles, and a broken can,
Old iron, old bones, old rags, that raving slut
Who keeps the till. Now that my ladders gone,
I must lie down where all the ladder's start,

In the foul rag and bone shop of the heart.

(The Circus Animal's Desertion)

২৪ ইয়েটস ইডিথ সিটওয়েলের 'Ass Face' কবিতাটি তাঁর Essays : 1931-36 বইতে উদ্ধৃত করেছেন।

২৫ W. B. Yeats, Collected Poems, London, 1952, p. 235.

we who seven years ago
Talked of honour and of truth
Shriek with pleasure if we show
The weasel's twist, the weasel's tooth.

২৬ A Vision, New York, 1955, p. 214.

২৭ The Autobiographies, New York, 1928, p. 165.

২৮ The Collected Poems, p. 329.

There all the barrel-hoops are knit,
There all the serpent-tails are bit,
There all the gyres converge in one
There all the planets drop in the Sun.

২৯ Ibid., p. 262.

৩০ Ibid., p. 295

৩১ A. N. Jeffares এর W. B. Yeats : Man Poet (London 1949) দ্রষ্টব্য। এ গ্রন্থের শেষে উদ্ধৃত ইয়েটস লিখিত 'Genealogical Tree'-তে এ উক্তিটি দেখা যাবে।

৩২ Letters on Poetry from W. B. Yeats to Dorothy Wellesley, Oxford, 1940, p. 91.

৩৩ Collected Poems, p. 398.

৩৪ A Vision, p. 210.

৩৫ ইয়েটসের Essays-এ একটি মরমী অভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে (পৃঃ ৫৪০), সেটি তাঁর 'Vacillation' কবিতার চতুর্থ অংশে কাব্যিক রূপ নেয় এবং 'A Dialogue of

Self and Soul'-এ আবার কিঞ্চিৎ আত্মপ্রকাশ করে। অনুরূপ অভিজ্ঞতার প্রতিভাস 'Stream and Sun at Glendalough' কবিতায় দেখা যায়। ১৯৩১ সনের নভেম্বরে মিসেস অলিভিয়া সেক্‌স্‌পীয়রকে লিখিত চিঠিটিও এখানে উল্লেখযোগ্য: 'সন্ধ্যার পরে আমি একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম, কতগুলো বিরাট গাছের নীচ দিয়ে যেতে যেতে উঁচু দার্শনিক চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ি……মনে হল হঠাৎ অবশেষে যেন আমি বুঝতে পেরেছি, তারপর গোলাপের গন্ধ পেলাম। আমি কালাতীত সত্তার প্রকৃতি এখন বুঝতে পেরেছি।" The Letters, p. 785.

৩৬ এর অন্যতম প্রমাণ 'উৎসর্গে'র কবিতাগুলো।

৩৭ Collected Poems, p. 330.

৩৮ ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি'র অনেক কথার মধ্যে এগুলো এখানে স্মরণযোগ্য:

Ornaments would mar our union,
they would come between thee and me. (7)
Thou art that truth which has kindled
the light of reason in my mind. (4)
And give me the strength to surrender
my strength to thy will with love. (36)
In my life thy will is ever taking shape. (56)

৩৯ Sir William Rothenstein, Men and Memories, 1900-22, London, p. 263.

৪০ Collected Poems, p. 328.

৪১ The Golden Book of Tagore, Calcutta, 1931, p. 269.

৪২ W. B. Yeats, On the Boiler, 1939, p. 28.

৪৩ A Vision, pp. 291-92.

৪৪ Wheels and Butterfies, London, 1934, p. 73.

ইংরেজীর ভবিষ্যৎ

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

কিছুদিন যাবৎ ইংরেজী খেদা আন্দোলনটা তীব্র হয়ে উঠেছে।

ইংরেজ আমলে ইংরেজীর যে মর্যাদা ছিল, ইংরেজ বিদায় হবার পর সে মর্যাদা তার থাকবেনা—এ সম্ভাবনা সবাই আমরা মেনে নিয়েছি। স্বাধীনতার পর প্রথম দশ বারো বৎসর আমরা তাড়াতাড়ি ইংরেজীকে বিদায় করবার জন্য ততোটা উতলা হইনি, যতোটা হয়েছি ইংরেজীর ওয়ারিশ স্থির করবার জন্য। আমরা সবাই জানি এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়নি। প্রচুর উত্তেজনা ও উপপ্লব, অকারণ তিক্ততা ও রক্তক্ষয়ের বিনিময়ে পাকিস্তানের গঠনতন্ত্রে উর্দু ও বাংলার সমান মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে।

ভবিষ্যতের প্রশাসন কাজে ইংরেজীর স্থান দখল করবে বাংলা ও উর্দু—আপাততঃ এইটুকু আমরা জানি। একই সাথে উর্দু ও বাংলা, না প্রদেশে উর্দু বা বাংলা এবং কেন্দ্রে উর্দু ও বাংলা, না আর কিছু—এ-সব খুটিনাটি প্রশ্নের মীমাংসা বোধহয় আমরা আপাততঃ মূলতবি রেখেছি। আভাসে এ-ও বুঝে নিয়েছি যে জাতীয় ভাষা দুটির প্রবর্তনের পরও ইংরেজী সহসা বিদায় হচ্ছেনা, সহকারী ভাষা বা সহযোগী ভাষা, একটা না একটা সুবাদে ইংরেজী আরও বেশ কিছুদিন থাকছে। কারণ ইংরেজী শুধু আমাদের আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ভাষাই নয়, দেশের দু-অংশের মধ্যে সংলাপের ভাষাও ইংরেজী। পরিস্থিতিটা অদ্ভুত হলেও নির্জলা সত্য। পূর্ব-বাংলায় উর্দুর ও পশ্চিম পাকিস্তানে বাংলার বহুল প্রচার ত দূরের কথা, সীমিত প্রচারের আয়োজনটাও অনিশ্চিত ও দ্বিধাগ্রস্ত। এ-ব্যাপারে সাধু সঙ্কল্পের অভাব অবশ্য কোন দিনই ছিলনা। তবে এ প্রস্তাবের গুরুত্ব আমরা এখনও নিশ্চয়ই বুঝিনি—বুঝলে এতদিন এ সম্বন্ধে একটি জাতীয় প্রস্তুতি ও প্রচেষ্টার কথা নিশ্চয়ই শোনা যেত।

এমন সন্দেহ হয়ত অমূলক নয় যে শীর্ষ মহলে বাংলার আলাদা অস্তিত্ব এখনও একটা বিস্বাদ সত্য। অনেকেরই মনে পড়বে, উর্দু ও বাংলা এই দুইটি ভিন্নধর্মী ভাষার একীকরণের বহুবিধ উদ্ভট প্রস্তাব একদা ব্রহ্মপুত্র প্লাবনের মতোই অনর্গল ধারায় এসেছিল। বাংলাভাষার লিপি-পরিবর্তনের জন্য প্রচুর অশিক্ষিত উৎসাহ এক সময় দেখা গেছে। বাংলা শব্দাবলীর জাত বদলে দেওয়ার পরিকল্পনাও এক সময়ে উর্দ্ধ-মহলের সাহায্যে পুষ্ট হচ্ছিল। উনিশ শ আটচল্লিশের এক সুপ্রভাতে জাতীয় রেডিওর সংবাদ ইশতিহারে বিজাতীয় বাংলা শুনে চমকে উঠেছিলাম অনেকেই। এখনও এই সংস্থাটি ভাষা সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নে স্বয়ংসিদ্ধ আদালত। বেতারের চিন্তা-ভাবনার উৎস কোথায়, একটু তলিয়ে দেখলেই আমরা আমাদের বর্তমান সন্দেহকে নিছক সন্দেহ বলে উড়িয়ে দিতে পারব না।

সুতরাং রাষ্ট্রপরিচালনায় উর্দু ও বাংলা ইংরেজীর জায়গা দখল করবে, এ-ব্যাপারে পরিস্কার সিদ্ধান্ত ও গঠনতন্ত্রে স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও, এর প্রবর্তনে দীর্ঘসূত্রীতার কারণটা হয়তো উপরিউক্ত সন্দেহের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে। বাংলা ভাষার প্রতি পাকিস্তানী বাঙালীর আনুগত্যকে দুর্বল করবার চেষ্টা হয়েছে বিস্তর এবং যাকে সৎমা প্রতিপন্ন করবার যুক্তি এখনও একেবারে নিশ্চেষ্ট নয়।

তথাকথিত রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাস মোটামুটি সবাই জানেন। বর্তমান ইংরেজী খেদা আন্দোলনের সংগে এর যোগসূত্রটা কোথায়? কিংবা আদৌ আছে কি না? একদিক দিয়ে দেখতে গেলে দুটি আন্দোলনই পাকিস্তান আন্দোলনের দুটি পরবর্তী পর্যায়। একটির লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্র পরিচালনায় উর্দুর পাশাপাশি বাংলার সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা; অন্যটির লক্ষ্য হল পূর্ব্ব-পাকিস্তানে শিক্ষার সর্বস্তরে বাংলাকে মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি। প্রথম নজরে দুটিই

অত্যন্ত সংগত দাবী, গণতান্ত্রিক দাবী। তাহলে আপত্তিটা কোথায়?

কারণ অস্বীকার করে লাভ নেই, সত্যিই কোন কোন মহল থেকে দ্বিতীয় আন্দোলনকে প্রতিরোধ করবার চেষ্টা হয়েছে। দেশের সরকার, বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কর্তৃপক্ষ, দাবীটিকে প্রথমেই পুরোপুরি মেনে নিতে পারেননি। সত্যিই আপত্তিটা কোথায়? যাঁরা আপত্তি করেছেন বলে মনে হয়, তাঁরা যথার্থ কি বলছেন? বলছেন, ইংরেজীকে বাতিল করে, শুধু বাংলার মাধ্যমে বর্তমানে উচ্চতর শিক্ষা সম্ভব নয়। তাছাড়া ইংরেজী বর্জনের অর্থই দাঁড়াবে বহির্বিশ্বের সংগে আমাদের যে সহজ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তার ছেদ। রাষ্ট্রগত ও শিক্ষাগত কোনদিকেই এই সম্পর্কচ্যুতি বাঞ্ছনীয় নয়। পরিবর্তন একদিন আসবেই, তবে এমনভাবে আসুক যাতে এটা অনাবশ্যক ক্ষয়, ক্ষতি ও বেদনা বাদ দিয়েই হয়। দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আগেই যদি বাংলা-ভাষার কাঁধে দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে ক্ষতি আমাদেরই, কারণ অসম্ভবকে সম্ভব করতে গেলে ফল হবে মারাত্মক। আমরা পিছিয়ে পড়ব—এমনিতেও আমরা এমন কিছু এগিয়ে নেই—এবং আজকে এই বিজ্ঞানের যুগে আরও পিছিয়ে পড়ার অর্থই হবে জাতীয় আত্মহত্যা।

যাঁরা এ-যুক্তি মানছেন না, তাঁরা বলেন, আমরা এগুতেই চাই, এবং অগ্রগতির পথে ইংরেজীটা বাধা বলেই বাধাটাকে তাড়াতাড়ি হঠাতে চাই। মাতৃ-ভাষায় আমাদের ছেলেরা বেশী শিখবে, ভালো শিখবে ও অনায়াসে শিখবে। তা-ছাড়া বাংলাকে দুর্বল বলে যে প্রচারণা চলেছে তা দুরভিসন্ধিমূলক না হলেও ভ্রান্ত বা হীনমন্যতাজাত। কিছুটা কায়েমী স্বার্থ হয়তো কাজ করছে এই আপত্তির পেছনে। যাঁরা ইংরেজী শিখে নিয়েছেন তাঁরা দেশের অজ্ঞতার পুরোপুরি সুযোগটা নিচ্ছেন ও সুবিধেটা পাচ্ছেন। প্রচলিত অবস্থাটা তাঁদের স্বার্থের অনুকূল, পরিবর্তনের জোয়ারে তাঁদের বৈশিষ্ট্য ভেসে যাবে বলেই তাঁরা সাধু সেজে সদুপদেশ বিলোচ্ছেন।

ইংরেজী খেদা আন্দোলনটা পপুলার, তবে আপাত দৃষ্টিতে যে কারণে এর জনপ্রিয়তা, তার আসল পরিচয়টা জানা প্রয়োজন। এ-আন্দোলনের সায় নেই এমন ব্যক্তির সংখ্যা নেহাত কম নয়। অনেকে আছেন যাঁরা আস্তে চলো নীতিতে বিশ্বাসী। এঁরা সব সময় সরব নন বলে এঁদের সংখ্যা নির্ণয় করা মুশকিল। কিন্তু আসল প্রশ্ন সেটাও নয়। মত গরিষ্ঠতার চেয়েও যেটা দরকারী কথা সে হ'ল মত-সুস্থতা। আমরা মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষা চাই—সবাই একমত। এখনই চাই—এখানেই দ্বিমত। শিক্ষার উচ্চতম পর্যায় বলতে এ-দেশে বর্তমানে আমরা অনার্সসহ ডিগ্রী ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা বুঝি। যাঁরা এই পর্যায়ে বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে চান, তাঁরা কিন্তু প্রায় সবাই ছাত্র—এর মধ্যে অভি-ভাবকের সংখ্যাও অনিশ্চিত। আন্দোলনটা ছাত্র আন্দোলন। অবশ্য প্রবীন শিক্ষাবিদের অভিজ্ঞতা ও ভুয়োদৃষ্টি নিয়ে ডক্টর কুদরৎ ই-খুদাও এ দাবীর সমর্থক। ছাত্রদের দাবীও কি তাঁর মতই নিঃস্বার্থ, না একটা সাময়িক ও কাল্পনিক শ্রেণী স্বার্থ বোধ অলক্ষ্যে এর শক্তির যোগান দিচ্ছে ?

শিক্ষার প্রশ্নে ছাত্র সমাজের মতের অবশ্যই একটা মূল্য আছে। কিন্তু বর্তমান প্রশ্নটি নিছক যুক্তির আলোয় দেখা ছাত্রদের পক্ষে সম্ভব নয়; সুবিধা অসুবিধার চেয়েও মান-সম্মানের আবেগ-জড়িত দৃষ্টিভংগী প্রথম থেকেই প্রশ্নটিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সভ্য সমাজের চিরাচরিত নিয়ম এ-সব প্রশ্নের বিচারের ভার প্রবীন শিক্ষাবিদগণের সুচিন্তিত অভিমতের উপর ছেড়ে দেওয়া। দুর্ভাগ্য বশতঃ অবিলম্বে বাংলা প্রবর্তনের সমর্থকদের মধ্যে যাঁরা এ-গোষ্ঠীতে পড়েন, তাঁরা এ পর্যন্ত কোন যুক্তিসহ দলিল উপস্থাপিত করতে পারেননি। বরং সরকারী বেসরকারী ভাবে বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ যা বলেছেন তার সারার্থ এই দাঁড়ায় যে পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া শিক্ষার মাধ্যম পরিবর্তন করার ফল অশুভ হতে বাধ্য। শুধু যে এতে

শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে তাই নয়, এ-আন্দোলনের মধ্যে যে একটি অনুক্ত কিন্তু স্পষ্ট নেতিবাচক দিক আছে, ইংরেজীর অপসারণ, সেটা কার্যকর হলে, উচ্চশিক্ষার প্রধান মূলেই কুঠার পড়বে। মাটির নীচের প্রাণরসের ধারা রুদ্ধ হয়ে গেলে উপর থেকে অবিশ্রান্ত জলবাতাস দিয়েও উচ্চশিক্ষার সজীবতাকে আমরা টিঁকিয়ে রাখতে পারবনা।

ছাত্র-সমাজ প্রশ্নটিকে এ-ভাবে তলিয়ে দেখবেনা এইত স্বাভাবিক। অবান্তর আবেগের হাওয়ায় তাড়িত হয়ে প্রশ্নটি জাতীয় সম্মানের প্রশ্ন হিসেবে দেখা দিয়েছে। কিন্তু ন্যায় সঙ্গত ভাবেই আমরা একটা জিনিষ লক্ষ্য করছি—আন্দোলনটা সর্ব্বাত্মক নয়, এর নিশানা প্রধানতঃ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। অফিস আদালতে, ট্রেনে, বিমানে, যেখানে ইংরেজী ভাষা পরাজয়ের ও পরাবলম্বনের জ্বলজ্বলে প্রতীক, দাবীটা সেখানে পৌছচ্ছে না পৌছচ্ছে এমন কয়েকটি শিক্ষাপরিষদে যেখানে ইংরেজী ভাষা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রতীক, আন্তর্জ্জাতিকতা ও বিশ্বজনীনতার প্রতীক, উন্নতি, উপলব্ধি ও অগ্রসরতার প্রতীক। সেখানে ইংরেজীর ললাটে য়্যুনিয়ন জ্যাকের চিহ্নমাত্র নেই।

স্বভাবতই সন্দেহ জাগে ইংরেজীখেদা আন্দোলনের পেছনে যে শক্তি সক্রিয় তার উৎস শিক্ষাতত্ত্বে নয় সমাজ তত্ত্বে।

পূর্ব্ব বাংলায় গত দশ বৎসরে শিক্ষার ক্ষেত্রে যা ঘটেছে, গুণগতভাবে নয়, সংখ্যাগত ভাবে, তাকে অনেকেই বলেছেন শিক্ষাবিস্ফোরণ। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র সংখ্যা বিস্তর বেড়েছে এবং পরীক্ষায় সাফল্যের হার নীচু হলেও সংখ্যার দিক দিয়ে, এই অনুন্নত দেশে শ্রদ্ধাজনক নিশ্চয়ই।

গত দশ বৎসরে কলেজের দরজায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রের ভীড় যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক,

এই সব ছেলেমেয়েদের আর কোন পথ দেখাতে না পেরে আমরা প্রতিটি শহরে গঞ্জে ষ্টেশনে কিছু ইট কাঠ ঢেউ তোলা টিন সংগ্রহ করে নতুন নতুন কলেজের পত্তন করেছি। মহানুভব সরকার মহত্তর কাজে অন্যত্র ব্যস্ত থাকায় গরীব দেশবাসীকেই কাজটি করতে হচ্ছে।

এবারে এ-প্রদেশে স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় একলাখ ছেলে-মেয়ের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার বা কিছু বেশী পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। এটা একটা মোটামুটী হিসাব। যাঁরা সত্য ঘটনা জানেন ও সত্য স্বীকারে যাঁদের কুণ্ঠা নেই তাঁরা স্বীকার করবেন, এর মধ্যে ন্যূনপক্ষে চল্লিশ হাজার ছেলে-মেয়েকে কলেজের পথ না দেখিয়ে আর কোন সম্মানজনক সাফল্যের পথ দেখিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল সমাজের।

সে-পথ নেই বলেই আজ হাট-বাজারে ইটকাঠ ও ঢেউতোলা টিনের আয়োজন উচ্চশিক্ষার নামে বিভৎস প্রহসন। এই প্রহসন শুধু ইটকাঠ ও ঢেউতোলা টিনের পেছনে যে হীনতা, ছলনা ও অত্যাচার তার মধ্যেই নয়, যে নিরীহ ও নিরপরাধ ছেলে-মেয়েদেরকে এই ক্লান্তিকর পণ্ডশ্রমের পথে ঠেলে দেওয়া হল, তার মধ্যেও নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ডিগ্রী সংগ্রহ করে যাঁরা অনন্যোপায় হয়েই এই নীরসকর্কশ শিক্ষকতার উঞ্ছবৃত্তি গ্রহণ করলেন, প্রহসনের শিকার তাঁরাও।

আমাদের উচ্চশিক্ষার দশভাগের নয় ভাগই হল এক প্রহসন। এবং এটা যে প্রহসন তা সবাই আমরা বুঝে ফেলেছি। ঠাট্টার পাত্র হতে কেউ আমরা চাইনি আর হওয়াতেও আমাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেছে। ইত্যবস্থায় সচরাচর একজনকে অন্যের অপরাধের বোঝা বইতে হয়, এবং সেই পুরাণপ্রসিদ্ধ ছাগের সন্ধান আমরা পেয়েছি, আমাদের সব ব্যর্থতার গ্লানি ও অপরাধের বোঝা ইংরেজীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছি।

এখানে একটা জিনিষ পরিষ্কার করে বলা দরকার যে চল্লিশ

হাজারকে আমি উচ্চশিক্ষার জন্য অনাবশ্যক বলে বিবেচনা করছি তা কোন উন্নাসিকতার বশে নয়; কিংবা এরা ইংরেজী ভাষায় অপটু বলেও নয়, বা এতগুলি ছেলেমেয়ে সাধারণভাবে অযোগ্য বলেও নয়। পাছে কেউ মনে করেন, আমি কিছু নতুন কথা বলছি, তাই দেশ-বিদেশের হকিকৎ যাঁদের জানা তাঁদের কথাই বলছি। শিক্ষাবিদেরা বলেন, দুনিয়ার উন্নত দেশগুলিতেও এইটেই পরিস্থিতি। মাধ্যমিকের বেড়া অনেকেই পার হবে কিন্তু কলেজের দরোজা সঙ্কীর্ণ। উন্নত দেশে এর জন্য ব্যর্থতা বোধ আমাদের মত তীব্র নয়, কারণ সে-সব দেশে কলেজী শিক্ষা জীবনে সার্থকতার একক পন্থা নয়। এদেশেও ইসমাইলী সম্প্রদায়, লৌকিক বিচারে যাঁরা বোধহয় সবচেয়ে কৃতী সম্প্রদায়, কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছেন উচ্চশিক্ষাকে সম্পূর্ণ পাশ কাটিয়ে। উন্নত দেশে এই ছেলে-মেয়েরা বহু বিচিত্র কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষা পেয়ে থাকে—আনন্দ বা সার্থকতা কোন দিক দিয়েই সে-শিক্ষা কোন অংশে খাটো নয়। তথাকথিত লিবারাল এডুকেশন বা চিত্ত-প্রসারী শিক্ষা চিত্তের প্রসার কতটা ঘটাচ্ছে সে প্রশ্ন মুলতবী থাক। কিন্তু এইটেই এ-দেশের ঢালাই ব্যবস্থা বলে গুণাগুণ, রুচি-অরুচি নির্বিচারে সবাইকে এই বারোয়ারী জোয়ালে বেঁধে ফেলার তাগিদ। যারা বাঁধা পড়ল তারা টানতে পারে না, যারা পড়ল না তারা দাবী ছাড়ে না। ফলে চিত্তের বা মননের কর্ষণ যত না হল, অশ্রুবর্ষণ হল অনেক বেশী। দেশব্যাপী এই উত্তুঙ্গ অন্যায়, শত-সহস্র সুস্থ-স্বাভাবিক তরুণের সময়, সাধনা ও বুদ্ধির এই অপব্যয়ের কোন প্রতিকার আমরা করতে পারিনি। কলেজের দরোজায় যে ভীড়, সেটা উপায়ান্তরহীন জনতার বেপরওয়া ভীড়। ঠেলেঠুলে প্রবেশপত্র লাভ করে যেহেতু আমরা ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ফিরে আসতে চাই না, তাই সাফল্যের পথে প্রধান বাধা ইংরেজীকে সরিয়ে দেওয়া যুক্তি-সংগত বিবেচনা করছি।

ম্পর্কিত করে বিবেচনা করি। বাষ্পের চাপের মত এই ছাত্র-চাপ ; এটা উর্দ্ধমুখী। কারণ জীবনের বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ার পথ নেই। পিরামিডের মতো শিক্ষার কাঠামোটা-চওড়া বুনিয়াদ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হয়ে বিন্দুতে মিশেছে। ভেতরের চাপে এই যদি আমরা এটাকে গত দশ বৎসরের শিক্ষা-বিস্ফোরণের সাথে

অর্থাৎ ইংরেজী-খেদা আন্দোলনের অর্থ পরিষ্কার হয়ে ওঠে

ক্রমসূক্ষ্মতার রেখা এখন বিপর্যস্ত। পিরামিডের উর্দ্ধাঞ্চলে যে স্বাভাবিক সঙ্কীর্ণতা, অন্যায়, অযৌক্তিক ও অগণতান্ত্রিক বলে তার নিন্দা হচ্ছে, কোন তত্ত্বগত কারণে নয়, সামাজিক কারণে। উচ্চ-শিক্ষার, অর্থাৎ এদেশে বর্তমানে প্রাপ্তিসাধ্য উচ্চশিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে যারা বাহুল্য তারা ঠাঁই চায়, এবং তাদের শর্তে। ঠাঁই চায়, যেহেতু তারা অনন্যোপায়।

আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির এই এক করুণ দিক। কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বৎসর ক্রমবর্ধমান ভীড় কিন্তু যাদের ভীড় তাদের দিকে তাকান,—এক দিশেহারা, বিভ্রান্ত জনতা—এক প্রচণ্ড, অন্ধ-শক্তি যাদেরকে ঠেলে নিয়ে এসেছে এই বিমুখ প্রান্তরে। ইংরেজী খেদা আন্দোলন এই হতবুদ্ধি প্রতারিত জনতার আন্দোলন।

তবে আন্দোলনটি ছাত্র-সমাজের হলেও প্রকৃতি ও গুরুত্বের বিচারে সমস্যাটি সারা দেশের, সমগ্র জাতির। এর সমাধানের ক্ষেত্রও বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্ত্রণাকক্ষ নয়, যেখানে দেশের মূল সমস্যা-গুলির মীমাংসা হয়ে থাকে, সেইখানে।

শিক্ষার বিস্ফোরণ : কথাটা গালভরা। স্যার আশুতোষ চেয়েছিন বাংলার ঘরে ঘরে গ্রাজুয়েট—সে লক্ষ্যে না পৌঁছলেও বাংলার গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় এখন গ্রাজুয়েট মিলছে। কিন্তু এই সার্থকতার সুধাপাত্রে এক বিন্দু গরল বোধহয় মিশেছে, যার জন্য শিক্ষা-বিস্ফোরণের পরিতৃপ্ত দাবীর মধ্যেও একটা বেয়াড়া অতৃপ্তিকে কিছুতেই বশ করা যাচ্ছে না। এটা আনন্দের কথা প্রদেশের

ইংরেজীর ভবিষ্যৎ

চারটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিবৎসর কয়েক সহস্র গ্রাজুয়েট আমরা পাচ্ছি—এবং এটা তৃপ্তির কথা আজ দেশের ছেলেমেয়েরা ইংরেজীর নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে পরীক্ষাপত্র লিখে ডিগ্রীলাভ করতে পারছে। এতেই কি গ্রাজুয়েটের মান বেড়েছে না মাতৃভাষা বাংলার মর্য্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। কোন উন্নত সমাজে এত শস্তায় গ্রাজুয়েট বিকোয় না যেমন আমাদের দেশে। মাতৃ-ভাষার মর্যদা নিয়ে চলেছে আর এক প্রবঞ্চনা। প্রকাশ্যে যখন বাংলার মান বাড়ছে, অপ্রকাশ্যে একটা ধূম্রজালের আড়ালে, একটি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থে ও নব্য কুলীনদের কৌলিন্য পাকা করবার তাগিদে সাধারণ জনগণের টাকায় অসাধারণ বালকদের জন্য গড়া হচ্ছে গুটি কত ইংরেজী বিদ্যালয়। একটা বিশিষ্ট শিক্ষার খানদানী আয়োজন করা হচ্ছে। সমস্ত দেশের আশা ও আদর্শবাদকে নিষ্ঠুর কৌতুকে হাস্যাস্পদ করে জাতীয় শিক্ষার আসরে এই ব্যঙ্গ নাটকের অবতারণা। শিক্ষা-সৌধের উঁচুতলাতেও এই কৌলিন্যের পরিবেশ সৃষ্টির তোড়জোড় চলেছে। পূর্ব্বপাকিস্তানে নব্য আলিগড় প্রতিষ্ঠার কথা যাঁরা ঘোষণা করেন, সজ্ঞানে কিংবা অবচেতনায় এই শুভ-কল্পনাই যে তাঁদেরকে উদ্বুদ্ধ করছে এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। মাটির পিরামিড বাড়ছে, টলমল করছে, এতে ফাটল ধরেছে; আমরা দলেবলে এটাকে খাড়া রাখতে ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু লক্ষ্য করবার ফুরসৎ পাইনি যে পাশেই এই পলিমাটির দেশে আমদানী দামী পাথরে আর একটি শক্ত, মসৃণ ছোট্ট পিরামিডের পত্তন হয়ে গেছে।

একই দেশে পাশাপাশি দুটি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের এই চেষ্টার ভবিষ্যৎ ফল ভয়াবহ। এর পেছনে একটা পাকা ও কায়েমী শাসকশ্রেণী তৈরীর পরিকল্পনা সক্রিয়; একই জাতিকে দ্বিখণ্ডিত করবার সম্ভাবনা নিহিত; এবং আম-দরবার থেকে ইংরেজীকে নির্বাসিত করে খাসদরবারে তার আসন পাকা করার ষড়যন্ত্র।

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

যাঁরা বাংলার স্বার্থরক্ষার মহৎ ভূমিকায় নেমেছেন ও ইংরেজী খেদা আন্দোলনের আগেভাগে আছেন তাঁরা জাতীয় শিক্ষার এই বিপদের দিকটা সম্বন্ধে যে সচেতন, তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। বরং পরোক্ষে তাঁরা একটা অখণ্ড সমতল জাতিকে খণ্ডিত ও অসমতল করবার দুষ্ট পরিকল্পনার সহযোগিতাই করছেন। কারণ যাঁরা ইংরেজী শিক্ষার নীরব ও অকলঙ্ক সমর্থক তাঁরা ক্ষমতাশীল ব্যক্তি; শ্রেণী স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা পাকা করে তাঁরা জনসাধারণের জন্য সহজ সরল বেদনাহীন জনপ্রিয় শিক্ষা ব্যবস্থা, চাইকি অনায়াসে ও বিনা অশ্রুপাতে উচ্চতম ডিগ্রীর ব্যবস্থা করতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

এঁরা বাংলা প্রবর্তনের বিরোধী নন, ইংরেজী বিতাড়নেও এঁদের জোরালো আপত্তি নেই, কারণ দ্বিতীয় ঘটনাটির অশুভ ফল থেকে আপন অপত্যগণের বাঁচাবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

উচ্চতম পর্য্যায়ে শিক্ষা মাধ্যমের প্রশ্নে যাঁরা আকস্মিক রদ-বদলের বিরোধীতা করছেন তাঁরা সমগ্র জাতির জন্য একটি ব্যবস্থাই চান। শিক্ষার এই সঙ্কটকালে তাঁরা একটি বিশেষ শ্রেণীর মুক্তির উপায় খুঁজছেন না, তাঁরা চান সর্ব্বসাধারণের জন্য একটি মুক্তির পথ বের করতে। তাঁদের প্রধান দুশ্চিন্তা বোধহয় এই যে বর্তমান সময়ে, যখন আমরা ইংরেজী ভুলতে বসেছি অথচ মাতৃভাষাও আয়ত্ব করতে পারিনি, তখন শিক্ষার মাধ্যম বদলাতে গেলে একটা দারুণ বিশৃংখলার সৃষ্টি হবে। প্রতিটি প্রক্রিয়ার একটা পরিণতির ধারা আছে। সেটা অগ্রাহ্য করলেই অকল্যাণ। পরিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মেই একদিন মাতৃভাষা তার যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু তাদের লক্ষ্য এই নয় দেশের ছাত্র-সমাজকে একটা সাধারণ পাইকারী উচ্চশিক্ষার প্রহসন দিয়ে জীবন-যুদ্ধে পংগু করে রাখা হোক। বরং তাঁরা চান উচ্চতর শিক্ষা বহুমুখী হোক, এবং প্রত্যেকে নিজের যোগ্যতা ও প্রবণতা বুঝে শিক্ষার সাথে জীবনের

সামঞ্জস্য খুঁজে পাক। ইংরেজী খেদার ডামাডোলে এই আসল সমস্যাটি হারিয়ে যাচ্ছে।

একটা কাল্পনিক শ্রেণীস্বার্থ থেকে এর উদ্ভব বলেই ইংরেজী খেদা আন্দোলনের দুর্ব্বলতা। বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধির পথে ইংরেজী কোন বাধা নয়। যাঁরা মাতৃভাষার উন্নতি কামনা করেন, বিদেশী ভাষার চর্চা তাঁদের কাছে বরং আদরণীয়। কথাটা এমন কিছু নতুন নয়। বাংলা গদ্য গড়ে উঠেছে বাংলার নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী যখন ইংরেজীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করল তখন থেকে। বীরবল ফরাসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ না করলে তাঁর গদ্যের তীক্ষ্ম উজ্জ্বল গতিময়তা আসত কোথা থেকে? এ-সব কথা এখন আপ্তবাক্য। একাধিক ভাষার সশ্রদ্ধ অনুশীলনের পথেই আসবে মাতৃভাষার সৌকর্য। অশিক্ষিত ও অনুন্নত দেশের কথা থাক। য়ুরোপ, আমেরিকায় উন্নত দেশগুলিতেও শিক্ষা-ব্যবস্থায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাষা হিসেবে একটি বা দুটি বিদেশী ভাষা শিখতে হয়। ইংরেজী বা ফরাসী বা জার্মান যাদের মাতৃভাষা কথাটা তাদের বেলাতেও সত্য। অথচ এরা একটিমাত্র ভাষার মাধ্যমেই জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে অবাধ গতিবিধির সুযোগ পেতে পারে। এশিয়া আফ্রিকার যে-সব দেশে কোন আধুনিক উন্নত পশ্চিমীভাষার প্রচলন নেই, সেখানে এই ঘাটতি পূরণের প্রবল চেষ্টা চলেছে। জ্ঞান চর্চার পথে যে প্রাথমিক অসুবিধা দূর করতে তারা হিমসিম খাচ্ছেন, আমরা-কি সেই অসুবিধা নতুন করে সৃষ্টির পথ খুঁজব? জ্ঞানের অনুশীলনে ইংরেজী ভাষা একটি অস্ত্র মাত্র, একটি আধুনিক, ব্যবহারোপযোগী, নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার। সুতরাং ইংরেজীকে যদি অনাবশ্যক ভার মনে হয় তবে এর ব্যবহার আমরা শিখিনি। এ-অবস্থায় অস্ত্রটিকে অধৈর্য্য হয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে আমাদের অসহায়ত্বই বাড়বে, অবস্থার প্রতিকার হবে না।

আরও এক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা ভাষার প্রশ্নটিকে বিবেচনা

করে দেখতে পারি। মুসলমান আমলে উপমহাদেশে শিক্ষাব্যবস্থার যে চিত্র আমরা পাই, তার সাথে বর্তমান চিত্রের কোন মিল নাই। প্রতিষ্ঠানভিত্তিক শিক্ষার ধারণাটাই এসেছে পশ্চিম থেকে। সে আমলের শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন দেখা দেয়নি—যদিও প্রাচীনতর যুগে, তক্ষশীলা ও নালন্দাই প্রমাণ করে যে ভারতীয় ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ধারণা অতি সনাতন। সে যাই হোক, ঐতিহাসিক কারণে ফার্সী ভাষায় দক্ষতা লাভ করতে হতো, তা ছাড়া ধর্মগত কারণে আরবী অথবা সংস্কৃত ভাষার চর্চা ছিল অপরিহার্য। রাজভাষা, পবিত্র ভাষা ও দেবভাষার ত্রিকোণীয় চাপে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা, আপাত দৃষ্টে, শিকড় ছাড়বার ফুরসৎ পায়নি। ইংরেজ-যুগের প্রারম্ভে দেশীয় ও আধুনিক ভাষাগুলির মধ্যে একটিও ভাষা বা সাহিত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বলা চলে না। ইংরেজদের সাথে এদেশে ইংরেজী ভাষা এল, আর নতুন পশ্চিমী শিক্ষা প্রবর্তনের সাথে সেটি জাঁকিয়ে বসল। যেদিন এক কলমের খোঁচায় ফার্সী ভাষার প্রতিপত্তি কর্পূরের মত উবে গেল, সেদিন শিক্ষিত ভারতবাসীর চেতনায় সেটা বিপর্যয়ের পূর্বাভাস বলে মনে হয়েছিল। এমনকি ইংরেজ-অনুগ্রহপুষ্ট উন্নতিশীল বাঙালী হিন্দু উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। দেওয়ান কার্তিকের চন্দ্র রায় তাঁর "আত্মজীবন চরিতে" লিখেছেন, "বহু যত্নের ও শ্রমের ধন অপহৃত হইলে অথবা উপার্জনক্ষম পুত্র হারাইলে যেরূপ দুঃখ হয়, সেইরূপ দুঃখ এই সংবাদে আমাদের মনে উপস্থিত হইল। অনেক পরিশ্রমপূর্ব্বক যে কিছু শিখ্যাইয়াছিলাম, তাহা মিথ্যা হইল, এবং বিদ্বান বলিয়া যে খ্যাতিলাভের আশা ছিল, তাহা নির্মূল হইয়া গেল।"*১

---

*১ মুনীর চৌধুরী রচিত "মীর মানস" গ্রন্থের উদ্ধৃতি থেকে নিয়েছি।

ইংরেজী ভবিষ্যৎ

কি পরিস্থিতিতে ফার্সী কাব্যজগত থেকে, গুলিস্তাঁ ও বুস্তাঁর সৌগন্ধময় পরিবেশ থেকে রূঢ় বাস্তবের প্রয়োজনে আকস্মিকভাবে স্বেচ্ছানির্ব্বাসিত হয় বয়স্ক কিশোর তার অপমান ও অভিমানকে হজম করে নিম্নমানের ইংরেজী বইকে নতুনভাবে ও একনিষ্ঠভাবে অবলম্বন করলেন, তার বিবরণ দেওয়ানজীর আত্মজীবন-চরিতে স্মরণীয় ভাষায় লেখা রয়েছে। একজন ব্যক্তির শিক্ষার সম্পূর্ণ ধারাটাই কিভাবে বদলে গেল, সেটাই স্পষ্ট, নিরাভরণ গদ্যে তিনি বলেছেন : এক্ষণে পারস্যবিদ্যার আলোচনায় এককালে বিরত হইয়া ইংরাজী বিদ্যাশিক্ষায় মনোনিবেশ করিলাম।*২

অবশ্য ভারতে ক্ষমতালাভের দ্বন্দ্বে যদি ফারসী শক্তি জয়ী হতো তাহলে আমরাও তিউনিসিয়া আলজিরিয়ার মতো ইংরেজীবিদ্ না হয়ে ফরাসীবিদ্ হতাম, ফরাসী বুলি বলতাম। কিন্তু ফলটা গড়েসড়ে বোধহয় সমানই হতো। পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন ও বিস্ময়কর জগতেই আমরা ঢুকতাম, তবে অন্য এক দরোজা দিয়ে। কিন্তু উপমহাদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানস গত দেড়শ' বছরে যেভাবে গড়ে উঠছে, সেভাবেই গড়ে উঠ্‌ত। হয়তো আমাদের চিন্তাভাবনায় ফরাসী যুক্তিবাদ ও মুক্তমানসিকতার ছাপটা বেশী পড়তো, ইংরেজীর প্রভাবে যা অতোটা পড়েনি······হয়তো বাংলার কাব্য দুর্বল হ'তো এবং উপন্যাস হতো শক্তিশালী। কিন্তু একটি অনুমান নিছক অনুমান নয়। আমাদের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় একটি বিদেশী ভাষার জায়গা থাকতো, এবং এটা হ'তো একটা অলংঘনীয় ঐতিহাসিক নিয়মে।

সে ঐতিহাসিক নিয়মটা কি? সে হ'ল জাতির উন্নতির একটা গুরুত্বপূর্ণ পর্বে একটি উন্নততর বিদেশী ভাষার অনিবার্য ভূমিকা। লাতিন ভাষার শৈশবে এই ভূমিকা ছিল গ্রীক ভাষার; আধুনিক প্রায় সমস্ত য়ুরোপীয় ভাষার শৈশবে এই সহায়তা করেছে ইংরেজী

*২ দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় : পূর্বোক্ত।

ও ফরাসী ভাষা। রাজশক্তির ভাষা বলে, বা তুলনায় শ্রেষ্ঠতর ভাষা বলেই ইংরেজী ও ফরাসীর জন্য এই ভূমিকা রচিত হয়নি। ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে দেখা যায়, সমকালীন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি শ্রেষ্ঠতর ভাষা বাকী সবাইকে অতিক্রম করে তার নির্দিষ্ট সীমানার বাইরেও প্রভাব বিস্তার করেছে। সেই প্রভাব চক্রের মধ্যবর্তী নতুনতর, দুর্ব্বলতর, ভাষাগুলি তখন নতুন উর্ব্বরতা রসের সন্ধান পায়। যে-সব উপভাষার প্রাণশক্তি অতি ক্ষীণ, তারা হয়তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, কিন্তু যার মধ্যে বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে, সে দ্রুত বেড়ে ওঠে। ষোল, সতের ও আঠারো শতকে ভারতের মানসকে সরস ও সজীব করে রেখেছিল সে-যুগের সবচেয়ে প্রাণবন্ত ভাষা ফার্সী, কারণ সমস্ত দেশটাই তখন ফার্সীর প্রভাব-মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে ইংরেজীর কাছে ফার্সী নতি স্বীকার করল। য়ুরোপে প্রায় হাজার বৎসর ধরে ছিল লাতিনের সর্ব্বাত্মক প্রভাব। ধীরে ধীরে ফরাসী ভাষা তাকে স্থানচ্যুত করল। ঐ মহাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে তিন শতাব্দী ধরে (১৬শ, ১৭শ, ১৮শ) ফারসীর প্রতিপত্তি রইল অপ্রতিহত। যদিও রাষ্ট্রশক্তি হিসেবে উনিশ শতকে বৃটেনই অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ফরাসীর জায়গায় ইংরেজী ভাষার প্রাধান্য ১৯১৮র ভার্সাই চুক্তির আগে পর্যন্ত নিঃসংশয় হতে পারেনি। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটির পর থেকেই গত কিঞ্চিদধিক চল্লিশ বৎসর ধরে সারা জগতে ইংরেজীর প্রভাব ক্রমাগত বিস্তৃত হচ্ছে। কিছুদিন আগেও যে সব প্রাচ্য দেশে ফরাসী ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট, আজ সেখানে ফরাসী স্থানচ্যুত ও ইংরেজী ভাষা প্রতিষ্ঠিত।

উপরে যা বলা হল, তা শ্লাঘার কথা নয় লজ্জার কথাও নয়, সত্য কথা। আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ধাত্রী এই ইংরেজী ভাষা, এ-ও শ্লাঘা বা লজ্জার কথা নয়, সত্য কথা। বিদেশের বহু অধুনা শক্তিশালী ভাষার ক্ষেত্রে যা হয়েছে, বাংলার ক্ষেত্রেও তাই হবে,—

ইংরেজীর ভবিষ্যৎ

একটা শক্তিশালী বিদেশী ভাষার আশ্রয়ে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠে একদিন সে স্বাবলম্বী হবে। বিদেশী ভাষাটি তখন আর কেবল অবলম্বন নয়, প্রতিবেশী ভাষা মাত্র, এবং উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক তখন দানের ও গ্রহণের সমান সম্পর্ক। এখনও যেমন ইংরেজীর কাছে, বা শিক্ষিত ইংরেজের কাছে ফরাসীর প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি, তেমনি বাংলার কাছে, বা শিক্ষিত বাঙালীর কাছে ইংরেজীর প্রয়োজনও ফুরোবে না বরং শিক্ষার গভীরতার সাথে প্রয়োজনের তীব্রতা বাড়বে। আমাদের বৃহত্তর ও অশিক্ষিত জনসমাজের কাছে ইংরেজী অবান্তর, অবাস্তব ও অসার্থক। কিন্তু শিক্ষার পিরামিডে যে যতো উঁচুতে, ইংরেজীর প্রয়োজন তার ততো বেশী। এই পরিস্থিতির মধ্যে এমন কিছু বিশিষ্টতা নেই। বিশিষ্টতা এইটুকু যে গ্রহণের জন্য শুধু ইংরেজীর দরোজাই আমাদের কাছে খোলা। আরও দু'চারটি ভাষার দরোজা খোলা থাকলে আমাদের উন্নতি ত্বরান্বিত হতো।

একটা প্রশ্ন সহজেই উঠতে পারে: বাংলা ভাষার যোগ্যতা সম্বন্ধে রায় দেবে কে? বাংলা এর মধ্যেই পূর্ণযোগ্যতা অর্জন করেনি এ-সন্দেহই বা কেন?

এর উত্তর একটু বাঁকা পথে দিতে হয়। উন্নততর ভাষাগুলির বৈশিষ্ট কি? বিচিত্রতর বিষয়ে অধিকতর বইএর প্রাপনিয়তা বাংলার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে না, বা ফরাসীর উপরে ইংরেজীর। ভাষার পূর্ণতার মাপকাঠি তার প্রকাশ ক্ষমতা। বহুমনের বহুদিনের অনুশীলনের ফলে ভাষা একটা স্বচ্ছতা, নমনিয়তা ও সূক্ষ্মতা লাভ করে—সব মিলিয়ে তার প্রকাশ ক্ষমতা। যেদিন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহুধাবিভক্ত পথের অগ্রসরতম পথিকেরা তাঁদের সূক্ষ্মতম চিন্তাগুলিকে সহজে বাংলায় প্রকাশ করতে পারবেন, কোন বিদেশী ভাষার সাহায্য ছাড়াই, তিনি প্রকৃতির সহজ নিয়মেই বাংলাতেই তা করবেন; বিদেশী এক বা একাধিক ভাষায় তাঁর পূর্ণ দখল থাকা সত্ত্বেও

করবেন। যখন মননের ক্ষেত্রে আমাদের জীবনে উচ্চশিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে এইটেই নিয়ম হয়ে আসবে, ব্যতিক্রম নয়,—তখনই বাংলা আপন দাবীতে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হবে, ছাত্র-সমাজের স্লোগানের পথে নয়।

সেদিন সকলেরই কাম্য। আমরা জানি পঞ্জিকার নির্দিষ্ট দিনের মতো এ সব দিন অমোঘ নিয়মে আসে না, আসে প্রতিজ্ঞা ও সাধনার পথে। ভাষা মানুষের সৃষ্টি, এবং উন্নত ভাষা সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি। বাংলা ভাষাকে শ্রীবৃদ্ধির বর্তমান পর্যায়ে আনতে হিন্দুবাংলার দেড়শ' বৎসরের সাধনা লেগেছে, আর এই সাধনার একটা বড় দিক ছিল, একটি অবোধ্য, দুঃসাধ্য বিদেশী ভাষাকে, ইংরেজীকে, পুরোপুরি দখলে আনা। আমরা, বাঙালী মুসলমানেরা, গত দেড়শ' বছরে কোন ভাষাই আয়ত্ব করতে পারিনি। দু'চারজন উজ্জ্বল ব্যতিক্রম এ-সিদ্ধান্তকে খণ্ডায় না, প্রমাণ করে। এর আগে যখন ফার্সী ভাষায় আমাদের (কারও কারও) ব্যুৎপত্তি ছিল, আধুনিক বাংলার পত্তন পর্ব্ব তখনও শুরু হয়নি। যখন হল, আমরা তখন বিমূঢ়, দ্বিধাগ্রস্ত, অধঃপতিত। অনেক দেরীতে সেই দ্বিধা ও অবসাদকে জয় করে ভাষা নির্মাণের ব্রতে আমরা ব্রতী হয়েছিলাম। এখন, স্বাধীন দেশে আমরা নতুনভাবে বাংলা ভাষার স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হ'তে চাই। স্বচ্ছ ও সংস্কারমুক্ত মনে আমাদের এই কর্মে নিবিষ্ট হতে হবে। আমাদের অভীষ্ট বাংলাকে নির্মাণ করে নিতে হবে। দেড়শ' বৎসরের উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করে নয়, আত্মস্থ করেই আমাদের এই সাধনা চলবে। ইংরেজী খেদার নেতিবাচক অন্ধগলির পথে নয়, পৃথিবীর সমস্ত উন্নত ভাষার সাথে সহজ পরিচয়ের রাজপথ ধরেই আমরা অগ্রসর হবো।

সাহিত্যে ব্যক্তিত্ব

কাজী মোতাহার হোসেন

বহির্জগতে যেমন নানা বৈচিত্র্যের সমাবেশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিকশিত হয় অন্তর্জগতেও সেইরূপ চিন্তা-ভাবনা বা ধ্যান ধারণার অপরূপ বিচিত্রতায় মানস লোকের অসীম রহস্য উৎসারিত হয়। অন্তঃপ্রকৃতি কাহারও শেফালির ন্যায় স্নিগ্ধ, কাহারও বা হাস্নাহানার ন্যায় উগ্র, কাহারও বেতশলতার ন্যায় নমনীয়, কাহারও বা শৈল-শৃঙ্গের ন্যায় সুদৃঢ়; কাহারও নক্ষত্রখচিত গগনের ন্যায় প্রশান্ত গম্ভীর, কাহারও বা বাত্যাতাড়িত বনানীর ন্যায় শতধা বিক্ষুব্ধ। দৃশ্যমান জগতের বৈচিত্র্য যেমন মনোহর, অন্তর্জগতের ভাবপুঞ্জও সেইরূপ বিস্ময়কর।

বাহ্য জগতের ঘটনা ও অভিজ্ঞতা আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারে আঘাত করিয়া বোধ শক্তি জাগ্রত করে। প্রত্যেকের মানসিক প্রবণতা বা বিশিষ্ট ভঙ্গী, প্রত্যক্ষ ভাবেই হউক আর পরোক্ষ ভাবেই হউক, ইহারাই বিচিত্র প্রকাশ। মানব জীবনের প্রতিচ্ছায়া সাহিত্যে মূর্ত হইয়া উঠে; এজন্য সাহিত্যের ভিতর আমরা অনন্ত বৈচিত্র্যের সন্ধান পাই। এই বৈচিত্র্য যে কেবল ভাষাগত তাহা নহে —ইহার মূলীভূত কারণ লেখকের চিত্ত-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিহিত থাকায় ইহা রুচিগত বা প্রকৃতিগত।

সাহিত্য পাঠ করিয়া পাঠকের মনে আনন্দের সঞ্চার হয় কেন? এ কথার উত্তরে বোধ হয় বলা যায়, ইহা সাহিত্যিকের চিত্তের সহিত পরিচয়ের আনন্দ। আমাদের স্মৃতিমূলে যে সকল মনোহর চিত্র সমাবিষ্ট হইয়া আছে, সাহিত্যিকের চিত্তের স্পর্শে তাহা জীবন লাভ করিয়া আনন্দের হেতু হয়। ইহাই সাহিত্যের রস। জীবনের সহিত সাহিত্যের নিবিড় যোগ থাকা সত্ত্বেও, ইহা অবসর কালের বিবৃতি, প্রত্যক্ষ ঘটনা নহে। সংঘটনকালে যে ব্যাপার আমাদের

অত্যধিক আনন্দ বা পীড়াজনক হয়, বিস্মৃতিকালে তাহারই উগ্রতা কমিয়া গিয়া স্মৃতিমূলে সঞ্চিত চিত্তের সংস্পর্শে আসিয়া সাহিত্য-রসের সৃষ্টি করে। এই কারণেই আমরা সাহিত্যে একদিকে যেমন মিলন, প্রেম, যৌবন ও সফলতার স্তবগানে আনন্দ উপভোগ করি, অন্যদিকে তেমনই বিচ্ছেদ, বিদ্বেষ, বার্দ্ধক্য এবং অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসের চিত্রেও সাহিত্যিক আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে।

মনের বিক্ষুব্ধ অবস্থায় সাহিত্যিক আনন্দ উপভোগ করা যায় না, তাহার জন্য নৈর্ব্যক্তিক স্থৈর্য ও প্রশান্তি আবশ্যক। পাঠকের পক্ষে যাহা সত্য, রচয়িতার পক্ষেও তাহাই সত্য। সাহিত্যস্রষ্টা ঘটনার ফটোগ্রাফার বা গ্রামোফোন মাত্র নহেন। সাহিত্যিকের মনে ঘটনার যে চিত্র অঙ্কিত হয়, তাহাতে তাঁহার ব্যক্তিগত রুচি অনুসারে কোন কোন অংশ প্রধান এবং কোন কোন অংশ অপেক্ষাকৃত অপ্রধান বলিয়া মনে হয়। এই নির্বাচনেই সাহিত্যিকের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং ইহাতেই সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা। অতএব দেখা যাইতেছে, ঘটনার যে প্রযোজনা বা রূপসংস্থান সাহিত্যে স্থান পায় তাহা বাস্তব ঘটনার সহিত (অন্ততঃ সম্ভাব্যতার দিক দিয়া) সংশ্লিষ্ট থাকিলেও তাহা বহুলাংশে সাহিত্যিকের নিজস্ব সৃষ্টি—তাঁহার আপন মনের রঙে অনুরঞ্জিত।

অনেক সময় জিজ্ঞাসা করা হয়, বিষয়-বস্তুর কিরূপ পার্থক্যে সাহিত্য শ্লীল বা অশ্লীল হইয়া থাকে? এ প্রশ্নের সদুত্তর এই যে বিষয়-বস্তুতে সাহিত্য শ্লীল বা অশ্লীল হয় না—বিষয়-বস্তুর ব্যবহার দ্বারাই এরূপ প্রভেদ ঘটিয়া থাকে। আইনকানুন দ্বারা সাহিত্যের রুচি নির্দেশ করা চলে না; ইহা সাহিত্যিকের নিজস্ব সম্পদ—তাঁহার সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের স্বতঃ উৎসারিত প্রকাশ। চিত্তরসে অভিষিক্ত বলিয়াই সাহিত্য মধুর ও প্রাণস্পর্শী হয়।

এই কষ্টিপাথরে সাহিত্যের মেকি সহজেই ধরা পড়ে। যাঁহার প্রকৃত পক্ষে কিছু বলিবার আছে এবং সেই সঙ্গে অন্তরের প্রেরণায়

প্রকাশ ব্যকুলতা আছে, তিনিই সাহিত্য সৃষ্টির যথার্থ অধিকারী। চিত্তের সহিত সংযোগ ব্যতিরেকে সাহিত্যে রস সঞ্চার হয় না। এজন্য নিকৃষ্ট লেখকের শত বিস্ময়কর শব্দ-চাতুর্য এবং চমকপ্রদ ভাব-সংগ্রহও পাঠকের চিত্তজয় করিতে পারে না। ভাবের উৎস-মুখ হইতে অবলীলাক্রমে প্রকৃত সাহিত্যিকের ভাষা নিঃসৃত হয়; কিন্তু অনধিকারীকে অনুকরণ, আতিশয্য, কষ্ট কল্পনা প্রভৃতি দ্বারা ভাষার দেহ-সজ্জা প্রস্তুত করিতে হয়। অনাড়ম্বর ঐশ্বর্যের নিকট কপট সমারোহের দৈন্য সহজেই অনুভূত হয়।

সাহিত্য উপভোগ করিতে হইলে রচয়িতার মনোরাজ্যের সন্ধান করিয়া তাঁহার দৃষ্টি ভঙ্গীর সহিত পরিচিত হইতে হয়। এই পরিচয় লাভ করিবার জন্য তাহার কুল-কুষ্ঠীর প্রয়োজন হয় না। রচনার মধ্যেই তাঁহার মনোবৃত্তির বা দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষত্বের সন্ধান মিলে। উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হইবার পূর্বে উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তির সৃষ্টি হওয়া চাই, এ কথা সহজ যশোপ্রার্থী নবীন লেখকের পক্ষে কঠিন হইলেও ইহা পরম সত্য। সম্প্রতি বাস্তবতার দোহাই দিয়া কেহ কেহ সাহিত্যে কদর্যতার সমর্থন করিতেছেন। বাস্তব জগতে কদর্যতা আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু বাস্তব সাহিত্য হইলেই যে তাহা কদর্য অশ্লীল বা জঘন্য হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে সাহিত্য নির্বাচন-ধর্মী। সুষ্ঠু নির্বাচন এবং পরিমাণ-সামঞ্জস্যের সহজ বোধ দ্বারা, যে কোন পরিবেশ হইতে ঘটনা-সংস্থান করিয়া সাহিত্যে রস-সিঞ্চন করিতে পারা যায়—এবং সে রসও যে কেবল শৃঙ্গার বা বীভৎসকেই আশ্রয় করিয়া থাকিবে এমন নহে। সাহিত্যে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। সহজ রুচিজ্ঞান কাহাকেও শিক্ষা দেওয়া যায় না—ইহা প্রত্যেকের আপন মানস-বৃত্তির সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। এ কথা ঠিক যে, সুরুচি- কুরুচির আদর্শ ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইতেছে; কিন্তু ইহাও ঠিক যে, ভদ্র সমাজে অলিখিত ভাবেও সর্বদা রুচির একটি সাধারণ মাপ কাঠি থাকে।

কেহ যদি চেষ্টা করিয়াও এই আদর্শ হৃদয়ের মধ্যে স্থাপন করিতে পারেন, তবে তাঁহার লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই—বরং সর্বসম্মত রুচির আদর্শ লঙ্ঘন করিবার সাহসিকতা হঠকারিতাই নিন্দনীয়।

সাহিত্যের ভিতর সুরুচি বা নীতির মাপকাঠি ব্যবহার করিতে অনেকে আপত্তি করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে সাহিত্য নীতি-দুর্নীতির বাহিরে; ইহাতে কেবল রসার্থেই রস-চর্চা, সাহিত্যে কিছু শিক্ষণীয় বিষয় নাই, অতএব এ ক্ষেত্রে নৈতিক হিতমূলক আদর্শের কোন প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু এই মতবাদ অতি ভয়াবহ। রস পরিবেশন ও উপভোগ অবশ্যই সাহিত্যের লক্ষণ। কিন্তু রস-বস্তু অতি অনাবিল, পঙ্কিলতার সহিত ইহার সম্পর্ক নাই, আবার সুরুচি ও সুনীতির সহিতও বিরোধ নাই। রসোপলব্ধির সময় রুচি ও নীতির প্রশ্ন মগ্ন চৈতন্যে অপ্রত্যক্ষ ভাবে অবস্থান করে, —এক দিকে ইহা যেমন অকারণে মাথা উঁচু করিয়া রসভঙ্গ করে না, অন্য দিকে তেমন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া রস-ভোক্তাকে মনুষ্যত্বের স্তরে অবনীত করে না। সচরাচর নানা উপমা সহযোগে বলা হয়, সাহিত্যের ক্ষেত্র প্রয়োজনের ক্ষেত্র নহে, বরং নিতান্ত অপ্রয়োজন অবসর-বিনোদনের ক্ষেত্র। আমার মনে হয়, এ কথা ভ্রমাত্মক। জীবন ধারণের জন্য সহজগোচর অন্নজল অত্যাবশ্যক বটে, কিন্তু দৃষ্টি অগোচর আলো-বাতাসও অনাবশ্যক নয়। বর্তমান জগতে অর্থোপার্জনের নানা প্রচেষ্টাকে আমরা প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করি, কারণ ইহার অভাবে জীবন ধারণ করিতে যে ক্লেশ হয় তাহা সহজগোচর। অথচ সাহিত্য-রসভোগকে আমরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলিয়া মনে করি, কারণ ইহার অভাবে মনুষ্যপ্রকৃতির মূলদেশ শুষ্ক হইয়া যে ক্ষতি উৎপন্ন করে, তাহার গুরুত্বের দিকে আমরা তেমন করিয়া দৃষ্টি-পাত করি নাই। কিছু দিন পূর্বে ক্রীড়া-কৌতুক প্রভৃতি আমাদের দেশে অনাবশ্যকের কোঠায় অবজ্ঞাত

ভাবে পড়িয়াছিল, সম্প্রতি এ সবের আবশ্যকতা স্বীকৃত হইতেছে। সাহিত্যের আবশ্যকতা সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই কার্যতঃ স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে, নতুবা এত সাহিত্য-সৃষ্টি কিসের জন্য? কিন্তু ইহা যে জীবনের অপ্রধান অংশ অধিকার করিয়া আছে—এই ধরনের একটি চিন্তা অনেকের মনেই বদ্ধমূল হইয়া আছে। মনে হয়, মানব-সভ্যতার অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিক রসাস্বাদনকেও মানুষের অবশ্য-প্রয়োজনীয় অধিকার-রূপে গণ্য করা হইবে। সাহিত্যে মানুষের সৌকুমার্য বর্ধিত হয়, গদ্যময় জীবনের পদ্যাংশের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় জীবনের বিভিন্ন দিকের মধ্যে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়—এক কথায় জীবনের ছন্দ-পতন পীড়াদায়ক বলিয়া মনে হওয়াতে চরিত্রে মাধুর্যের সঞ্চার হয়। অতএব এ সমস্তকে মানব সভ্যতার প্রয়োজনের ক্ষেত্র হইতে পৃথক করিয়া ভাবা সহজ হয় না। মানুষের প্রচেষ্টায় মানুষের জন্যই যে সাহিত্য রচিত হয়, তাহা যদি মানব হিতের এবং মানব সভ্যতার ক্রমোন্নতির দিকে নির্দেশ না করে তবে বড়ই আক্ষেপের কথা। সাহিত্যের ভিতর শিক্ষণীয় বিষয় আছে। ইহার মধ্য দিয়া যে শিক্ষা অন্তঃকরণে প্রবেশ করে, তাহা জীবনের উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। তবে স্কুল কলেজের শিক্ষা এবং সাহিত্যের শিক্ষার রীতি সম্পূর্ণ পৃথক। স্কুল কলেজে শিক্ষাই মুখ্য ব্যাপার, এবং সে সম্বন্ধে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই অত্যন্ত সজাগ। সাহিত্যের শিক্ষা সাহিত্য-রসিকের অজ্ঞাতসারে একেবারে মর্মস্থানে গিয়া সঞ্চিত হয়। সাহিত্যরস উপভোগ করিতে করিতে পাঠক যখন তন্ময়, ঠিক সেই সময়ই সাহিত্যের বিচিত্র ঘটনাবলী নিষিক্ত করিয়া স্রষ্টার মনের সহিত পাঠকের মনের যে নিবিড় যোগ স্থাপিত হয়, তাহাই সাহিত্যের মূলবস্তু; এইরূপ করিয়াই লেখকের ব্যক্তিত্ব পাঠকের চিত্তে সংক্রামিত হয়। এই শিক্ষাই বড় শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথকে যাঁহারা গুরুদেব বলিয়া সম্বোধন করেন, তাঁহাদেরই

অনেকেই বলিয়া থাকেন "সাহিত্যের কোনো উদ্দেশ্য নাই।" গুরুর কাজই কিন্তু শিক্ষা দেওয়া। তবে রবীন্দ্রনাথ গুরুমহাশয়ী ভঙ্গীতে শিক্ষা দেন নাই—তিনি আপন মনের রঙে অভিষিক্ত সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া পাঠকের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, আর পাঠক তাঁহার সহিত রসাশ্রিত মানসিক যোগ-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। ইহা অতি নিগূঢ় এবং সঙ্গোপন গুরুশিষ্য সম্বন্ধ। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতির উপাখ্যান ভাগ বা কথাংশই প্রধান ব্যাপার নয়—এই সমস্ত ছাপাইয়া এবং ইহার ভিতর দিয়া তাঁহার চিত্ত-ভঙ্গীর যে মাধুর্য পূর্ণ প্রকাশ হইয়াছে, তাহাই মূল জিনিষ। ক্ষুদ্র জিনিষের প্রতিও তিনি কিরূপ রস-সিক্ত দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া তাহার মনোহারিত্ব বাড়াইয়াছেন, চিরাচরিত মিথ্যাচারের দিকে তিনি কিরূপ মুক্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া অটল ধৈর্য এবং পৌরুষের সহিত কল্যাণ পথ কাটিয়া চলিয়াছেন, এক কথায় নিজের সহিত বিশ্বজগতের তাবৎ সম্বন্ধকে তিনি কি প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, ইহারই (তত্ত্বমূলক নয়) রসমূলক পরিচয় আমরা তাঁহার রচনার মধ্যে লাভ করি। ইহা লাভ করিতে আমাদের মাথা ঘামাইতে হয় না, রস-সহযোগে অবলীলাক্রমে এই সমস্তের একটা সমগ্র ছবি আমাদের চিত্ত-পটে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। ইহাই সাহিত্যের বিশেষত্ব। সাহিত্য শিল্পীর মনঃসৌন্দর্য এক প্রকার বিনা আয়াসে রস ভোগের মধ্য দিয়া সমঝদার পাঠকের চিত্তপটে মুদ্রিত হইয়া যায়। শৎচন্দ্রও বাঙালী সমাজের শিক্ষাগুরু, কিন্তু গুরু মহাশয় নহেন। তিনি উপন্যাস লিখিয়াছেন, আপন মনের প্রাচুর্যে গল্পের পর গল্প লিখিয়া গিয়াছেন; তাহার চিত্তরসে অভিষিক্ত হইয়া সজীব চরিত্র-সৃষ্টী হইয়াছে। সমস্ত চরিত্রের ভিতর দিয়া তিনি যে মাধুর্যের সঞ্চার করিয়াছেন, তাহার মূলে রহিয়াছে তাঁহার বিশিষ্ট দৃষ্টীভঙ্গী। যে ঔদার্যপূর্ণ দৃষ্টির ফলে তিনি মন্দের মধ্যেও নিছক মন্দ দেখিতে পান

নাই, (বরং সেখানেও মহত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছেন;) এবং যে পরিপূর্ণ সহানুভূতির দৃষ্টিতে তিনি পরিত্যক্তার প্রতি সমাজের মর্মন্তুদ অত্যাচার লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহার এই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান। যথার্থ সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গীই এক মূল্যবান সম্পদ—বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য সাহিত্যিক এই দৃষ্টিভঙ্গীই উপহার দিয়া থাকেন, ইহাই তাঁহার অমরতার কারণ। আত্মশ্রিত সাহিত্যই উৎকৃষ্ট, না বহিরাশ্রিত সাহিত্যই উৎকৃষ্ট ইহা লইয়া অনেক বাদানুবাদ আছে। এ সমস্ত বাদানুবাদ প্রায়শঃ কথার ঘোরফেরের উপরই হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সাহিত্য লেখকের চিত্ত-রসে সিঞ্চিত, অতএব ইহা অবশ্যই সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্ব, অনুভূতি বা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভর করে। এই হিসাবে সাহিত্য অবশ্যই আত্মশ্রিত। যাঁহারা বলেন, সাহিত্য আত্মশ্রিত হইলে নিম্নাঙ্গের হয়, তাহাদের কথার মূল লক্ষ্য হইতেছে এই যে, আপন মনের বিক্ষোভ বা অনুভূতি নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার, অতএব তাহাতে সর্বজনের কৌতূহল বা আনন্দের কি হেতু থাকিতে পারে? আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, সাহিত্য বিক্ষুব্ধ অবস্থার নিখুঁত বর্ণনা নহে। বরং তাহা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির স্মৃতি রসাশ্রিত শান্ত-সমাহিত অবস্থায় স্বতঃউৎসারিত বাণী। সাহিত্যিক যে দৃষ্টিতে ঘটনা বা ভাব-পুঞ্জের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন, তাহার ফলে ও গুলো তাহার অন্তঃকরণে পরিপুষ্টী লাভ করিয়া এক অনির্বচনীয় সর্বজনম-নোহারী রূপ পরিগ্রহ করে। এই অন্তর-রসের অভিষেকেই যাহা ব্যক্তিগত তাহা সার্ব্বজনীন হইয়া উঠে, যাহা ক্ষণকালীন অনুভূতি তাহা চিরকালীন সৌন্দর্যে রূপান্তরিত হইয়া যায়। সাহিত্যিক সত্যদ্রষ্টা তিনি ঘটনা ও ব্যক্তির অন্তঅস্থলে প্রবেশ করিয়া অন্যের অপরিদৃষ্ট অতি নিগূঢ় সম্বন্ধাদি নির্ণয় করিয়া পরিচিতকে অভিনবত্ব এবং অকিঞ্চিৎকরকে অসাধারণত্ব দান করিয়া থাকেন। সাহিত্যিকের তুলি-স্পর্শেই পাঠকের মনের অস্পষ্ট চিত্র, সৌন্দর্য সৌষ্ঠবে পুষ্টাঙ্গ

হইয়া অভাবনীয় সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে। এ জন্য উচ্চাঙ্গের সাহিত্য দৃশ্যতঃ বহিরাশ্রিত হইলেও, গভীর ভাবে আত্মশ্রিত, এবং গভীর ভাবে আত্মশ্রিত বলিয়াই সর্বজনের অন্তঃগ্রাহ্য হইবার মর্যাদা লাভ করিয়া থাকে। দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতরেই সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয়। সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে, এই কারণেই তিনি নব নব সৌন্দর্য আবিষ্কার করিতে পারেন। সাধারণ লোকের চক্ষুতে জগতের শোভা তেমন করিয়া ধরা পড়ে না। এজন্য যদি বলা যায়, সাহিত্যিকেরা শোভা ও সৌন্দর্য শুধু আবিষ্কার নয়, সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে তাহা অত্যুক্তি হয় না। পৃথিবীর ভাবপুঞ্জের কুঞ্জিকা সাহিত্যিকের হস্তেই ন্যস্ত। তাঁহারাই জগৎকে আদর্শ হইতে আদর্শান্তরে লইয়া গিয়া প্রগতির পথে চালিত করিতেছেন। সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গীই ক্রমশঃ পরিণত হইতে সমগ্র জাতির দৃষ্টিভঙ্গী বা ভাব-বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। এজন্য জগৎ সাহিত্যিকবর্গের নিকট চির ঋণে আবদ্ধ। সভ্যতার অগ্রদূত স্বরূপ সাহিত্যিক পরিদৃষ্টি ক্রমশঃ নির্মল হইতে নির্মলতর হইয়া সাময়িক যাবতীয় সমস্যা সমাধান করিয়া প্রেম ও প্রীতিমূলক আদর্শ মানব সভ্যতার পত্তন করিতে পারিবে, এ আশা বোধ হয় দুরাশা নয়।

ইতিহাস

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ

ইতিহাসের সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য নিয়ে বিতর্কের শেষ নাই। ইতিহাস কি বিজ্ঞান, না দর্শন, না সাহিত্য? যুক্তি ও প্রমাণ-নির্ভর জিজ্ঞাসা যদি বিজ্ঞান হয় তাহলে ইতিহাসও বিজ্ঞান, কেননা জিজ্ঞাস্য বিষয়ের সাক্ষ্য প্রমাণকে যুক্তি দিয়ে যাচাই করে তথ্যের প্রতিষ্ঠা ও ব্যাখ্যা করা ইতিহাসেরও কাজ। এই জন্যই ঐতিহাসিক জে-বি বিউরি ঘোষণা করেছিলেন যে ইতিহাস বিজ্ঞান বই আর কিছু নয়। কিন্তু বিজ্ঞানত Phenomenon বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে তার অন্তর্নিহিত সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করতে চেষ্টা করে, যে নিয়ম জানা থাকলে অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি করে সেই ইন্দ্রিয়-গোচর বস্তু বা ব্যাপারকে পরীক্ষামূলক ভাবে আবার ঘটানো যেতে পারে, বা যার পুনরাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। ইতিহাসের বিষয়বস্তু মানুষ, মন নামক এক আশ্চর্য বস্তুর অধিকারী, যার সীমারেখা নির্ণয় করা অসম্ভব, যার বহিঃ-প্রকাশের বৈচিত্র্য বর্ণনাতীত। এই মানব সমাজের ঘটনা কি পর্যবেক্ষণের জন্য কৃত্রিম ভাবে আবার ঘটানো যায়? প্রাকৃতিক Phenomenon এর মত মানুষের ব্যবহার ও প্রতিক্রিয়া কি অমোঘ ও দুর্নিবার? ইচ্ছা ও এ্যাক্সিডেন্ট বলে যে দুটি ব্যাপার মানবীয় কর্মে ব্যতিক্রম ঘটায়, তার গতি-প্রকৃতি কি বৈজ্ঞানিক আইনের মত আগে থেকে বলে দেওয়া যায়? প্রকৃতির মত মানুষ নিরুত্তাপ, আবেগহীন যন্ত্রের মত কাজ করে না বলে তার প্রতিটি কর্মই এক ও অনন্য। সে জন্য, তার নিখুঁত পুনরাবৃত্তি সম্ভব নয়। লর্ড এ্যাক্টন্ তাই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন—ইতিহাস বিজ্ঞান হতে পারে না।

তাহলে কি ইতিহাস দর্শনের পর্যায়ভুক্ত? মানুষের চিন্তা ও অভিজ্ঞতা অনুধাবন করে ইতিহাস থেকে সৃষ্টি-রহস্যের কোনও

বিশেষ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়? এ রহস্য জানার তৃষ্ণা অবশ্য মানুষের চিরন্তন। বাস্তব পরিবেশের সাথে তার মৌল সম্পর্ক নির্ণয়, এবং সে পরিবেশকে আয়ত্ত করে, তার সীমাকে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য তার চিরন্তন প্রয়াস। এ প্রয়াসের কাহিনী ও অভিজ্ঞতা ইতিহাস অভিষ্ট তত্ত্ব দর্শন। এই প্রয়াসে মানুষ তার দুইটি পরম সম্পদ প্রয়োগ করে এসেছে; মস্তিষ্ক বা বুদ্ধি প্রয়োগ করে যে অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয়েছে তাকে আমরা ক্ষেত্র অনুযায়ী ভাগ করে বলি বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, দর্শন, অর্থনীতি, সমাজবিন্যাস ইত্যাদি; আর হৃদয় বৃত্তি—আশা আকাঙ্ক্ষা, ভয়, প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস, আবেগ প্রযুক্ত যে প্রয়াস, তা হোল ধর্ম এবং তারই by product সাহিত্য, শিল্প, ইত্যাদি। ইতিহাস তাই সম্পূর্ণ মানুষের অভিজ্ঞতার রেকর্ড, বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তি—কলিংউড্‌ এর ভাষায়, objective and absolute mind—এর সক্রিয়তার কাহিনী।

এ কাহিনী থেকে যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, তার দিকে কোরানের উপরোক্ত বাণীতে ইঙ্গিত করা হয়েছে; 'তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য শিক্ষা নিহিত আছে; সে কাহিনী মনগড়া নয়, ভবিষ্যৎ পরিণতির সাক্ষ্য, সমস্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা, আর বিশ্বাসী লোকদের জন্য পথের দিশারী ও পরম কৃপা'। ১৭ শতাব্দীতে বলিংব্রোক এই কথারই প্রতিধ্বনি করে বলেছিলেন History is Philosophy teaching by examples। ভুলভ্রান্তি, কর্তব্য, অকর্তব্যের দৃষ্টান্ত দেখে স্বীয় লক্ষ্য পথে সতর্কতার সাথে এগিয়ে যাওয়ার শিক্ষা ইতিহাসের। কিন্তু লক্ষ্যটি কি? মুসলমান বলে, আল্লার অভিপ্রেত পরিণতিতে ব্যক্তি ও সমাজ সত্তার আত্মসমর্পণ এবং তার ফলে আল্লার সান্নিধ্য লাভ। খৃষ্টান বলে, পৃথিবীতে Civitas Dei এর স্থাপন—যার দিকে আদমের স্বর্গচ্যুতি থেকে মানুষের ইতিহাস ঐশ্বরিক পরিকল্পনা মত পরিচালিত হচ্ছে। হিন্দু-বৌদ্ধ মতে ধর্ম (অর্থাৎ অনুমোদিত সনাতন রীতি-নীতি) ত্রুটিহীন ভাবে পালন করে অবশেষে

'সংসার' বা ইতিহাস থেকে ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেকের মোক্ষ বা নির্বাণ লাভ, অর্থাৎ জন্মান্তর চক্র থেকে মুক্তি। আর মানবতাবাদী গ্রীকরা মনে করত, এই পৃথিবীতেই পূর্ণতম ও শ্রেষ্ঠতম বিকাশের দিকেই মানুষের গতি, তার সর্ব্ববিধ মুক্তি সাধন, তার অনন্ত সম্ভাবনাকে সফল করতেই মানুষ ইতিহাসের পথে যাত্রা করেছে। রেনেসাঁসের পর থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গি সিভিলাইজেশনের মাপকাটি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই কথাকেই ইকবাল একটু ঘুরিয়ে বলেছেন যে আল্লার পরিকল্পিত সৃষ্টির পূর্ণতম প্রকাশের, তার নিরন্তর সৃষ্টি কার্যের অংশীদার হওয়ার জন্য প্রয়াসই মানুষের নিয়তি।

এ সব মতবাদের যথার্থ পরীক্ষা করাও দর্শনের কাজ, ইতিহাসের নয়। ইতিহাস কেবল মানুষের চলার পথের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে, তার চিন্তা ও কর্মের সম্পর্ক নির্ণয় ক'রে তার অর্থ ও ফলশ্রুতির অনুসন্ধান করে। কিন্তু তবু প্রশ্ন ওঠে, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের অজস্র ঘটনার প্রত্যেকটি ত আর লিপিবদ্ধ করা যায় না, করা হয়ও না; যা ইতিহাসে বিধৃত হয় তা এই সব অসংখ্য ছোট বড় ঘটনা থেকে নির্বাচিত কয়েকটির Universalised বা সামান্যীকৃত রূপ। এই নির্বাচন ও সামান্যীকরণ লেখক বা রচয়িতার নিজস্ব কর্ম। সে কর্মে তাঁর চিন্তা ও বিচার প্রযুক্ত হয়। আর সে প্রয়োগে তার ব্যক্তিগত নীতিবোধ, বিশ্বাস ও আবেগের প্রভাব এসে যেতে বাধ্য। তার ব্যক্তি মানস পারিপার্শ্বিকতাকে অতিক্রম করিতে পারে না, স্থান ও কালের রুচি ও প্রয়োজন তার তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশ ও ব্যাখ্যায় প্রতিফলিত না হয়ে পারে না। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইয়োরোপীয় চিন্তারীতিতে রোমান্তিকতার যে প্রবল জোয়ার এসেছিল ঐ যুগে লিখিত ইতিহাসে তার সুস্পষ্ট লক্ষণ বিদ্যমান। মসিয়ো থিয়ের এর নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জীবনী ফ্রান্সের নবজাগ্রত বোনাপার্ট কাল্‌ট্‌কে পুষ্ট করে ১৮৩০ সালের দ্বিতীয় (জুলাই) বিপ্লব সংঘটনে প্রেরণা জুগিয়েছিল। আমাদের দেশেও সাম্প্রতিক কালের

ইংরাজ বিরোধী মনোভাব বা নবজাগ্রত ইসলামি উদ্দীপনা-সংক্রমিত ইতিহাসের নজির প্রচুর। লেখকের বর্তমান তার উপস্থাপিত অতীতের ইতিহাস ও ব্যাখ্যাকে অনিবার্য ভাবে প্রভাবিত করে বলেই বেনেদেত্তো ক্রোচে বলেছেন, All history is contemporary history ; ইতিহাস মাত্রই সমকালীন মানসিকতার ইতিহাস।

সংবেদনশীল মন নিয়ে নির্বাচিত তথ্য বা ঘটনাকে নিজ কল্পনায় জীবন্ত বা নিজেকে সে ঘটনার অংশীদার মনে করতে পারলে যে অন্তর্দৃষ্টি ও বিচার ক্ষমতা জন্মায়, তার গুণেই ঐতিহাসিক অতীতের নিরস মৃত ঘটনার সূত্রগুলিকে বর্তমানে উপলব্ধ সত্যে পরিণত করতে পারে। কল্পনা, প্রকাশভঙ্গি ও ভাষার কৌশলে এই সত্য পাঠকের কৌতুহল উদ্রেক করে ও জাগরূক রাখে, তার মনে রেখাপাত করে। এসব গুণ কিন্তু শিল্পী-সাহিত্যিকের, বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকের নয়। সত্যান্বেষণে সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে ইতিহাস যেমন বিজ্ঞান, পতন-অভ্যুদয়ের কাহিনী থেকে মানুষের যাত্রাপথের দিক নির্ণয় যেমন দর্শন, তার লিপিবদ্ধরূপ তেমনই সাহিতকর্ম।

ইতিহাস শাস্ত্রের এই বহুমুখীনতা বর্তমান যুগে স্বীকৃত। কেবল রাজনীতি, ধর্ম প্রচার বা অর্থনীতিই ইতিহাসের যেমন একমাত্র উপজীব্য নয়, সকল কালের সকল দেশের মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও কর্মের দ্বারা মানব সভ্যতার যে বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি বা ক্ষতি সাধিত হয়েছে তার কোনও কিছুই যেমন ইতিহাসে বর্জনীয় নয়, তেমনই ইতিহাস কোন বিশেষ বিষয়বস্তুতে-ও আবদ্ধ নয়। বলা চলে যে ইতিহাস একটি দৃষ্টিভঙ্গি, অনুসন্ধানের এক বিশেষ পদ্ধতি মাত্র ; যে কোনও বস্তু বা বিষয়ের কালানুক্রমিক পরিচয় ইতিহাসের সাহায্যে দেওয়া যায়। "The sphere of history is as wide as the sphere of human interests itself."

ঐতিহাসিক মানুষের এই বহুমুখীনতা কখনও বিস্মৃত হয় না।

মানুষ ফেরেস্তা নয়, স্থান, কাল ও ঐতিহ্যের দ্বারা তার শরীর ও মন গঠিত; তার চিন্তা ও কর্ম এই স্থান-কাল ও ঐতিহ্য প্রভাবিত বহুমুখীন ব্যক্তিত্বেরই সামষ্ঠিক প্রকাশ। রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় বা শৈল্পিক প্রভৃতি কোনও কাজই সে বিচ্ছিন্ন ভাবে করেনা; যে মুহূর্তে এবং যে পরিমাণে সে ধার্মিক, সংস্কারক, রাষ্ট্রকর্মী বা শিল্পী, সেই মুহূর্তে সে জীবিকান্বেষী, জ্ঞান সাধক বা জৈবক্ষুধায় তাড়িত পশুও বটে। মানুষের কর্মের উৎস তাই বিচিত্র। একথা ব্যক্তি জীবনে যেমন সত্য, সমাজ, জাতি বা রাষ্ট্র জীবনে ঠিক তেমনই সত্য। এই জন্য ঐতিহাসিক ঘটনা এত জটিল, তার ব্যাখ্যা এত কঠিন।

অথচ, কেবল ঘটনার কালানুক্রমিক বর্ণনা দিলেই ঐতিহাসিকের কাজ সম্পুর্ণ হোল না। মানুষ বা সমাজ কি করেছে, তা জানাই যথেষ্ট নয়। সে কাজের পিছনে যে চিন্তা, যে চেতনা থাকে তা বোঝার চেষ্টাই ঐতিহাসিকের আসল দায়িত্ব। কেননা, এই চিন্তাই কর্মের কারণ আর কারণের বর্ণনা ও ব্যাখ্যাই ইতিহাসের প্রধান কথা। এই অর্থেই হেগেল এর মতবাদের যাথার্থ্য, All history is history of thought.

কিন্তু তাই বলে মানুষের চিন্তা যে একটি মাত্র ভাবের সরল সূত্র ধরে গিয়ে কোনও বিশেষ কর্মে প্রকাশ পায়, তা ঠিক নয়। বহুবিধ ভাব বা বোধি একই সঙ্গে সে চিন্তাকে উদ্বুদ্ধ করে, যেমন জাতির বা সমাজ জীবনের কোনও বিশেষ ঘটনায় বহুবিধ প্রভাব একই সঙ্গে কার্যকরী হয়। সেজন্য ইতিহাসের ধারাকে কেবল একটি মাত্র ভাব দিয়ে ব্যাখ্যা করা বৈজ্ঞানিক ইতিহাস সম্মত নয়। এক্টন এর বুদ্ধিবাদ (intellectualism) বা Plekhanov এর বস্তুবাদ (materialism) বা (Karl Lamprecht এর social psychology দিয়ে যেমন মানব ইতিহাসের প্রকৃতি নির্ণয় করা যায় না, তেমনই, প্রাকৃতিক বিবর্তনবাদের নিয়ম প্রয়োগ করে হেগেল ও বাক্‌ল্ যে মানব মুক্তির প্রসার বা সভ্যতার ক্রমবিকাশকেই

ইতিহাস ব্যাখ্যার একমাত্র সূত্র মনে করেছিলেন, তার যুক্তিও অভ্রান্ত নয়। অবশ্য কোনও একটি ভাব বা বিষয়ের কালানুক্রমিক ধারা ইতিহাসে অনুসরণ করা যায়, কিন্তু ঐ একটিমাত্র সূত্র অনুসরণ করে কোনও দেশ, কাল বা ঘটনার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া ঐতিহাসিকের নীতি নয়। ধর্মানুভাবের ইতিহাস হতে পারে, কিন্তু ক্রুসেড' বা আরব সাম্রাজ্য বিস্তারের ঘটনাকে ঐ একটি মাত্র ভাব দিয়ে ব্যাখ্যা করলে ইতিহাসকে বিকৃত করা হবে। পেলোপোনেসিয়ান যুদ্ধের ইতিহাস বলতে গিয়ে থিউসিডিডিস ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করেছেন কেবল ব্যক্তি বিশেষদের কার্যকলাপ, ইচ্ছা অনিচ্ছার ভিতর। এ দৃষ্টিভঙ্গি ঐতিহাসিকের পক্ষে এখন আর সত্যানুসন্ধানের একমাত্র উপায় নয়। ইউরোপে রিফর্মেশান এর প্রসার কেবল ধর্ম চেতনার বলে, না তাতে লাতিন ও জার্মানি জাতির দ্বন্দ্ব ও নবগঠিত বুর্জোয়ার সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের বিবাদও কার্যকরী ছিল, তার অনুসন্ধান করা তাই এখন ঐতিহাসিকের অন্যতম লক্ষ্য।

মানব কর্মের এই বিচিত্র ও জটিল উৎসের সন্ধান যেমন ঐতিহাসিকের কর্তব্য, ইতিহাসের ব্যাপকতা ও সামগ্রিকতা সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন ও সজাগ দৃষ্টি থাকাও তেমনই তার লক্ষণ। দৃষ্টির এই স্বচ্ছতা ও বিস্তার না থাকলে তার উপস্থাপিত বিবরণ, অশুদ্ধ, বিকৃত ও একদেশদর্শী হতে বাধ্য। এই কর্তব্য পালন করতে তাকে ইতিহাসের সহকারী মানববিদ্যার আরও বহু শাখার শরণাপন্ন হতে হয়; সাহিত্য, শিল্প, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, টেকনোলজী, ভাষাতত্ত্ব, ভূগোল, ধর্ম্মতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, দর্শন, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি থেকে তাকে উপকরণ সংগ্রহ করে তার অনুসন্ধানের পথকে আলোকিত করে অগ্রসর হতে হয়। এ যুগের ঐতিহাসিককে তাই বিভিন্ন বিদ্যার সথে যোগাযোগ না রাখলে চলে না। আর প্রত্নতত্ত্ব ইতিহাসেরই অস্ত্র বিশেষ, যার দ্বারা মানুষের ইতিবৃত্তকে লিখিত

রেকর্ডের সময়-সীমা অতিক্রম করে বহু সহস্র লক্ষ বৎসর পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া বর্তমান যুগে সম্ভব হয়েছে। পিকিঙ ম্যান থেকে নিয়ে পাঁচ লক্ষ বৎসরেরও অধিক কাল ধরে মানুষ যে অভিজ্ঞতার সূত্র ধরে এযুগে এসে পৌঁছেছে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ-নির্ভর তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ ও কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় এ যুগে ইতিহাসের লক্ষ্য। History is study of man in action, Harold Wheeler এর এই উক্তিতে ইতিহাসের আধুনিক সংজ্ঞা বিধৃত। স্বর্গ-বিতাড়িত মানুষ কি করেছে, কেন করেছে ইতিহাস কেবল এই জিজ্ঞাসারই উত্তর খোঁজে, নিষিদ্ধ ফল তার খাওয়া উচিত ছিল কি না, সে প্রশ্ন ঐতিহাসিকের কাছে অবান্তর।

উর্দু ইতিহাস-সাহিত্য

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ

এক

বাঙলা ও উর্দু গদ্য প্রায় সমবয়স্ক ; 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' বা 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদের' কথা ধরলে বাঙলা গদ্য কিছুটা বড়ই হবে। এই দুই ভাষায় গদ্যসাহিত্যের প্রসার কিন্তু এক পথে হয়নি। বাঙলা গদ্যের গৌরব তার কল্পনানির্ভর গল্প-উপন্যাস-নাটক ও রম্য রচনার প্রাচুর্যে, ভাবসমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যে, আর উর্দু স্বকীয়তা অর্জন করেছে তার তথ্য নির্ভর গবেষণামূলক ও তত্ত্ববহুল রচনার সঙ্কলন ও অনুবাদ সাহিত্যে। যেমন কাব্যে, তেমন গদ্যেও ফার্শি সাহিত্যের উত্তরাধিকার নিয়েই উর্দু সম্পদশালী হয়েছে। তাই বিষয়বস্তু, বাচনভঙ্গি রচনারীতির classical tradition উর্দুকে যেমন প্রাণশক্তি ও ঐশ্বর্য দিয়েছে বাঙলার ক্ষেত্রে তেমন হয়নি। বাঙলা কথাসাহিত্যের আদি প্রেরণা ইয়োরোপীয় তথা ইংরেজি সাহিত্যের চিন্তা ও প্রকাশরীতি। পাশ্চাত্য রীতির আদর্শ উৎসাহের সঙ্গেই বাঙলা গদ্য মেনে এসেছে। সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্য বাঙলা গদ্যের প্রসাদগুণ ও আলঙ্কারিক সৌন্দর্য বাড়িয়েছে সন্দেহ নাই, কিন্তু চিন্তা, প্রকাশভঙ্গি বা সাহিত্যরুচির নিয়ামক হতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক tradition কে ঐতিহাসিক তথ্য হিসেবে বাঙালী যেরূপ উৎসাহের সঙ্গে সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনে অনুশীলন করে এসেছে, বাঙলা গদ্য সাহিত্যে তার প্রতিফলন সে অনুপাতে হয়নি।

বাঙলা দেশের মত সমুদ্রমুখি অঞ্চলে উর্দুর প্রসার হলে তাতেও হয়ত সমুদ্রবাহিত পাশ্চাত্য শিল্প-সাহিত্যের আদর্শ বাঙলার মতই সমন্বিত হোত। কিন্তু উর্দুভাষী অঞ্চল সমুদ্র থেকে দূরে ত বটেই, সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত সে অঞ্চল ইয়োরোপীয় বাণিজ্য ও শাসন

ব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হ'তেও পারেনি। উত্তর ভারতের সামাজিক কাঠামোও চিন্তাপ্রণালীতে পাশ্চত্য ভাবধারার অনুপ্রবেশ অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক ; সে অঞ্চলের সাহিত্যে তার প্রতিফলন আরও সাম্প্রতিক, প্রায় বিশ শতকীয়। বাঙলা, তামিল, মারাঠীর মত উর্দুকে Classical tradition ইতিহাসের তথ্যের মত আবিষ্কার করতে হয়নি ; উর্দুভাষী উত্তর ভারতের মানসিকতায় সে ঐতিহ্য-ই ছিল জীবন্ত আদর্শ। ফার্শি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলি যেমন অনুকরণ ও অনুবাদের প্রেরণা যুগিয়েছে তেমনই তার প্রকাশরীতি, রুচি ও বিষয়বস্তু উর্দু সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। স্যার সৈয়দের উৎসাহে যখন ইংরাজি শিক্ষিতরাও উর্দু গদ্যের ব্যবহার করতে আরম্ভ করে, তখন ও ফার্শির এই সর্বাত্মক প্রভাব অব্যাহতই ছিল। উত্তরকালে পাশ্চাত্য শিল্পাদর্শের সংক্রমণ উর্দুতে বেড়েছে বটে, কিন্তু তাও শুধু অলঙ্কারের ক্ষেত্রে। বামপন্থী উর্দু সাহিত্য থেকেও ফার্শি Classicism এর জের এখনও যায়নি।

ইতিহাস বা ইতিবৃত্ত ফার্শি সাহিত্যের অন্যতম প্রধান শাখা। ইতিহাস সচেতনতা মুসলমান মানসেরও এক বিশিষ্ট লক্ষণ। ফার্শির মাধ্যমে এই মানসিকতা যে সাহিত্যের প্রেরণা যুগিয়েছে আরবীর মতই তা বিপুল ও বিচিত্র। রোম্যান্টিক উপাখ্যান, ধর্মতত্ত্ব ও বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলি বাদে ফার্শি গদ্য সাহিত্যের প্রায় সবটাই ইতিকথা, জীবনী নীতিমূলক পুরাতত্ত্ব ও রাজন্যকাহিনী। ফার্শি ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি রাজকেন্দ্রিক, এবং রচনাগুলি উপাখ্যান-ধর্মী ; ঘটনার ব্যাখ্যার চেয়ে বিস্তৃত বিবরণের প্রতি বেশী মনো-যোগী। এ দৃটিভঙ্গি অনুযায়ী ইতিহাসের অর্থ রাজা বা ব্যক্তির কীর্তিকাহিনী। ফার্শি ইতিহাসগুলির গঠন তাই প্রধানতঃ বংশানু-ক্রমিক (dynastic) কিংবা জীবনীমূলক (biographical)। ইস-লামের শক্তি ও সভ্যতার স্বর্ণযুগে ফার্শি ইতিহাসের মনোভঙ্গি তৈরী হয়েছিল বলে অমুসলমান জগৎ বা যুগের প্রতি ঐতিহাসিক-

দের অলস কৌতূহল কিছুটা ছিল বটে, শ্রদ্ধা বা অনুসন্ধিৎসা তেমন জাগেনি। বিশ্বের ইতিহাস-জাতীয় রচনাগুলিও ইসলামের আবির্ভাব ও মুসলিম জগতকে কেন্দ্র করেই লিখিত হোত। ফলে, তথ্যের বিচার বিশ্লেষণে ইসলামের মূল্যমানই ইতিহাস ব্যাখ্যার একমাত্র রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ আরবদের প্রভাবে ফার্শি ইতিহাসগুলিতেও সঞ্চারিত হয়েছিল, তার দরুণ কবি-সাহিত্যিক-পণ্ডিত-গ্রন্থকারদের বিবরণ ও জীবনী সম্বলিত এক ধরণের bio-bibliographical রচনা আরবী-ফার্শী ভাষায় গড়ে উঠেছিল যার নজীর মধ্যযুগের কোন ভাষাতেই পাওয়া যায় না। বলা চলে যে মুসলমানদের ইতিহাস চেতনা সাধারণতঃ রাজবৃত্ত ও সাহিত্য কর্মকে কেন্দ্র করেই প্রকাশ পেয়েছে। ভূগোল, সমাজ, রাষ্ট্রব্যবস্থা, ধর্ম, আইন-কানুন, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে ফার্শিতে প্রচুর রচনা আছে বটে, কিন্তু ইতিহাসের কালানুক্রমিক ধারাবাহিকতা দেখান সে সব রচনার লক্ষ্য নয়। কাব্য, সাহিত্য ও ভাষার ক্ষেত্রেও বিষয়বস্তু, রচনাভঙ্গী, চিন্তাধারা ইত্যাদির বিবর্তনের মূলে কোন নৈর্ব্যক্তিক বা সামাজিক কারণ থাকা সম্ভব, ফার্শি ইতিহাসকার (এক আধটি ব্যতিক্রম ছাড়া) সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন না। ব্যক্তির ইচ্ছা বা যোগ্যতা-অযোগ্যতার দ্বারাই ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত হয়, মানুষের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিবর্তনের মূলে আকস্মিকতা থাকে, প্রাচীন গ্রীকদের এই দৃষ্টিভঙ্গি মধ্যযুগের আরবী, ফার্শি ইতিহাস-গুলিতেও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়।

এই দৃষ্টিভঙ্গি ও সীমিত বিষয়বস্তুর উত্তরাধিকার নিয়ে উর্দু ভাষায় ইতিহাস রচনা আরম্ভ হয় উনিশ শতকের গোড়ায়। প্রথম পর্বের রচনাগুলি প্রায় সবই ফার্শি ইতিহাসের তর্জমা, নয়তো, সার সঙ্কলন। ১৮০৪ সালে Fort William College এর মীর শের আলী আফসোস আঠারো শতকের লেখা সুজন রায়ের ফার্শি ইতিহাস 'খুলাসাতুত-তওয়ারিখের' যে সারানুবাদ 'আরায়েশে মাহফিল'

নাম দিয়ে প্রকাশ করেন তাকেই উর্দু ইতিহাস-সাহিত্যের প্রথম পদক্ষেপ বলা চলে। সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত মৌলিক ইতিহাস রচনার রেওয়াজ তেমন প্রসারলাভ করেনি তার জন্য ফার্শির ব্যবহার অব্যাহত ছিল বহুদিন পর্যন্ত। ১৮৭২ সালে যখন তথ্য ও তত্ত্ববহুল (serious) বিষয়ের জন্য উর্দু গদ্যের বহুল প্রচলন আরম্ভ হয়েছে, তখনও ভূপালের নবাব সেকান্দার বেগম তাঁর 'ভূপালের ইতিহাস' উর্দুতে রচনা করে সন্তুষ্ট হতে পারেন নিঃ উর্দুর সাথে তার একটা ফার্শি সংস্কারণ ও প্রকাশ করেছিলেন। Methodology ও তথ্য প্রয়োগের দিক দিয়ে এই যুগের রচনাগুলি মধ্যযুগীয় ফার্শি ঐতিহাসিকতারই ভাষান্তরিত রূপ। কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে প্রাচীন দলিল-দস্তাবেজ-ইতিবৃত্তের উদ্ধার ও তথ্যের বিচার বিশ্লেষণের যে পদ্ধতি এশিয়ার ইতিহাসে প্রযুক্ত হচ্ছিল তার সঙ্গে পরিচয়ের স্বাক্ষর এযুগের ফার্শি ও উর্দু ঐতিহাসিকদের নাই বললেই চলে। লিখিত বিবরণের উপর একান্ত ভাবে ভরসা করা, প্রত্নতত্ত্ব ভূগোল, ভাষা, সমাজ ও অর্থনীতির আলোকে সে বিবরণের সত্যাসত্য যাচাই না করে তাকে নির্ভুল. তথ্য হিসাবে ব্যবহারের রীতি ফার্শি ইতিহাস থেকে উর্দুতে সঞ্চারিত হল। বিশ্ব মানবের ইতিহাসকে সামগ্রিক ভাবে না দেখে শুধুমাত্র আরবী-ফার্শি ইতিবৃত্তের মুসলমান-কেন্দ্রিক ঘটনা গুলির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার ফলে ইতিহাসের ক্ষেত্র স্বভাবতঃই সঙ্কীর্ণ হয়ে গেল। ইতিহাসের গতি ও মর্মোপলব্ধির গভীরতা সেজন্য উর্দুতে তেমন লক্ষণীয় হয়নি। উত্তর কালে যখন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের আবিষ্কৃত তথ্য সিদ্ধান্তের প্রয়োগ আরম্ভ হলো, তখনও ফার্শি ইতিহাসের নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচিত কয়েকটি বিষয়ের তথ্যসম্ভার ও সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসাবে তার ব্যবহার হয়, ইতিহাসের সামগ্রিকতার উপর জোর দেওয়ার জন্য নয়।

দুই

উর্দুতে মৌলিক ইতিহাসের প্রাচীনতম নিদর্শন বোধহয় সৈয়দ আহমদ খানের (পরে স্যার সৈয়দ আহমদ খান) ১৮৪৭ সালে প্রকাশিত 'আসারুস-সানাদীদ' নামক রচনাটি। এ গ্রন্থটি রাজো-পাখ্যান নয়; শিলালিপির নকল'সহ দিল্লীর পুরাতন ইমারতগুলির সচিত্র ঐতিহাসিক বিবরণ। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাসে এ বইটি পথিকৃতের দাবী রাখে। ভারতের সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ স্থাপিত হওয়ার প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্বের লেখা এই বইটি সে সময়েই ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সৈয়দ আহমদের জীবদ্দশাতেই এর ফরাসী তর্জমা হয়, এবং কলিকাতা ও লণ্ডনের এসিয়াটিক সোসাইটি লেখককে 'অনারারি ফেলো, নির্বাচিত করে সম্মানিত করে। যে অপরিসীম শ্রম ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে লেখক একাই সে সময়ের শ্বাপদসঙ্কুল জীর্ণ ইমারতগুলি পর্যবেক্ষণ ও শিলালিপিগুলির নকল করেছিলেন ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানে সেরূপ একাগ্রতা ও নিষ্ঠা ভারতীয়দের মধ্যে অল্পই দেখা গেছে। সৈয়দ আহমদ ইংরাজি জানতেন না, তবে দিল্লীর ইংরাজ মহলে তাঁর বন্ধু বান্ধব ছিল, এবং মূল উপাদান পরীক্ষা করার এই আগ্রহ সম্ভবতঃ ইংরাজ সংস্পর্শেরই ফল।

তা সত্ত্বেও এ বইটি ফার্শি ইতিহাসের প্রভাব এড়াতে পারেনি। এইটির শেষাংশে দিল্লীর কবি-সুফী-শিল্পী-পণ্ডিত প্রভৃতি বিদগ্ধ সমাজের একটি বিবরণ দেওয়া হয়েছিল। এদের রচনা থেকে উদ্ধৃতি সহ আদর্শায়িত জীবন-বৃত্তান্ত ও গুণকীর্ত্তনের এই পরিচ্ছেদটি পরে অবশ্য তাঁর বন্ধু, মুদ্রাতাত্ত্বিক Edward Thomas এর পরামর্শমত ১৮৫৪ সালের সংস্করণ থেকে গ্রন্থকার বাদ দিয়েছিলেন। এ ধরণের

বিবরণ মোগল আমলের ফার্শি ইতিকথাগুলির অপরিহার্য অংশ ছিল। এর পূর্বে সৈয়দ আহমদ ফার্শিতেও একটি ইতিহাস রচনা করেছিলেন 'জাম-এ-জম' নামে, যাতে তৈমুর থেকে বাহাতুর শাহ পর্যন্ত মোগল বাদশাদের জন্ম-মৃত্যু, সিংহাসন আরোহণ, শাসনকাল ও বিশেষ ঘটনার তারিখের তালিকা আকারে সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হয়েছিল। এটিও মধ্যযুগীয় ফার্শি ইতিহাসের এক বিশেষ রচনারীতির সাক্ষাৎ ও সজ্ঞান অনুকরণ।

পাশ্চাত্য methodologyর সাথে সৈয়দ আহমদের পরিচয় অবশ্য পরে আরও গভীর হয়েছিল। ফার্শির মূল ঐতিহাসিক পুঁথিগুলির নির্ভুল সংস্করণ প্রকাশে তাঁর যত্ন ও শ্রমস্বীকার থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৫৫ সালে লখ্‌নৌ থেকে তিনি নিজ ব্যয়ে 'আইন-এ-আকবরী'র প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করেন এবং ১৮৬২ সালে কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির জন্য 'তারিখ্‌-এ-ফিরোজ শাহী' সম্পাদনা করেন। তু'বছর পরে, জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরীর'রও একটি সংস্করণ তিনি দিল্লী থেকে প্রকাশ করেন। এ জাতীয় লিখিত উপাদানকে পাশ্চাত্য রীতিতে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করে ইতিহাসের প্রচলিত ধারণাকে পুনর্বিচার করার দৃষ্টান্তও আছে তাঁর 'খুতবাত-এ-আহমদীয়া' নামক ১৮৭০ সালে প্রকাশিত হজরত মুহম্মদের জীবনীসংক্রান্ত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে। এটি আসলে Sir Wm. Muir এর সদ্য প্রকাশিত 'Life of Mohammad' এর সমালোচনা। ইয়োরোপীয় বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত তথ্য ও যুক্তিবাদের মাপকাঠিতে মুসলমান রচিত গ্রন্থে বর্ণিত হজরতের জীবনের অলৌকিক ঘটনাগুলি বিচার করে সৈয়দ আহমদ Wm. Muirএর বক্রোক্তির জবাব দিতে চেষ্টা করেছেন। হজরতের চরিত্রে ও কার্যকলাপে অলৌকিকতা আরোপ করে মুসলমান লেখকরা যা বলেছেন, তার সবই আক্ষরিকভাবে সত্য, এমন মনে করার কোনও হেতু নাই বরঞ্চ আতিশয্যের ভাষা

হিসাবেই সে বর্ণনাগুলি ব্যাখ্যা করা উচিত। প্রতীকে বর্ণিত সূক্ষ্মতত্ত্বকে প্রকৃতিবিজ্ঞানের (Natural Science) ইন্দ্রিয়ানুভূত স্থূল তথ্যের মত ধরে নিয়ে খৃষ্টান পাদরীরা মুসলমানদের বিশ্বাসকে বিদ্রূপ করার যে সুযোগ তৈরী করে নিয়েছিল সৈয়দ আহমদের এই লেখাটি তার প্রথম যুক্তিসম্মত প্রতিবাদ। মুসলমান লেখকদের মানসাভ্যাস ও তাদের লেখায় পারিপার্শ্বিক বিশ্বাস ও আচারানুষ্ঠানের প্রভাবের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। প্রবন্ধের শেষে সমকালীন ইয়োরোপীয় Humanism এর আদর্শে, হজরতের মানবতার উপর জোর দিয়ে তাঁর প্রারম্ভিক জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও দিয়েছেন তাঁর চরিত রচনার নমুনা হিসেবে।

উর্দুর ইতিহাস-সাহিত্যে সৈয়দ আহমদ খানের দান অপরিমেয়। মৌলিক ইতিহাস অবশ্য তিনি লেখেননি, এবং ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁর কৃতিত্বও তেমন নাই। তবে, সমাজ ও ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় ইয়োরোপীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ প্রয়োগ করে যে চিন্তামূলক প্রবন্ধ-সাহিত্যের তিনি সূত্রপাত করেন, তাঁর অনাড়ম্বর গদ্যরীতি ও সাক্ষ্য প্রমাণ ব্যবহারের কৌশল উর্দুতে যুক্তি ও তথ্য নির্ভর ইতিহাস রচনা সহজতর করে দেয়। সিপাহী বিদ্রোহ সংক্রান্ত সৈয়দ আহমদের নিজের লেখা দুইটি পুস্তিকা 'আসবাব-এ-বাগাওয়াত' আর 'ওয়াকিয়াত-এ-বিজনৌর, এই নূতন রীতিতে সমকালীন ইতিহাস রচনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ইতিহাসের যে ধারণা (Conception) এই নূতন রীতির গদ্যে ও তথ্য সম্ভারে পূর্ণ হয়ে প্রকাশ হতে থাকল তা অবশ্য মধ্যযুগের মুসলমান লেখকদের ঐতিহ্য অনুসারী অর্থাৎ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক, বর্ণনাত্মক (narative) ও উপদেশমূলক (didactic)। রাজৈশ্বর্য, যুদ্ধবিগ্রহ, সাহিত্য ও শিল্পকীর্তি এইরূপ কয়েকটি নির্বাচিত বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার সঙ্গে রাজবংশের উত্থান পতনে পার্থিব সম্পদের নশ্বরতা ও কালচক্রের অমোঘ গতি নির্দেশ করার দিকে প্রবণতা

এই ঐতিহ্যের প্রধান লক্ষণ। সৈয়দ আহমদ খানের যুক্তিবাদ এ মনোভাবের তেমন কোনও পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। বরঞ্চ তাঁর অনুসৃত আলীগড় আন্দোলনের সুযোগে এ মনোভাব আরও পুষ্ট ও সৃজনক্ষম হোল। উর্দুর ইতিহাস-সাহিত্য তার প্রসার গভীরতা ও নির্দেশের (direction) জন্য এই আন্দোলন-প্রসূত বুদ্ধিবৃত্তিমূলক উদ্দীপনার কাছে যতটা ঋণী উর্দু সাহিত্যের অন্য কোনও শাখা তেমন ঋণী নয়। উর্দু ঐতিহাসিকদের চিন্তাবৃত্তির অনেক ক্ষেত্রে সে আন্দোলনের প্রভাব এখনও লক্ষ্য করা যায়। সে জন্য আলীগড় আন্দোলনের মূল চিন্তাসূত্রগুলির উল্লেখ এখানে করা প্রয়োজন।

তিন

মোটামুটিভাবে বলা চলে যে, ইংরাজ শাসনের সঙ্গে উত্তর ভারতীয় মুসলমানদের একটা আপোষ মীমাংসার আশু প্রয়োজন থেকে এ চিন্তাসূত্রের উদ্ভব হয়। সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতায় ওহাবীদের সংগ্রামী প্রচেষ্টার নিস্ফলতা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার পর মুসলমানদের আত্মরক্ষার জন্য কোন উপায় ছিল না। একদিকে অভিজাতরা প্রভাব ও প্রতিপত্তি হারাতে বসেছিল। আর অন্যদিকে শিক্ষক-উকীল-আমলা চিকিৎসক প্রভৃতি বুদ্ধিজীবিদের জীবিকার ক্ষেত্র পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রাধান্যের ফলে ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। এ অবস্থায় বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বাঙলা দেশের হিন্দুরা ইংরাজের উপর আস্থা স্থাপন করে যে সহযোগ ও আনুগত্যের নীতি গ্রহণ করে লাভবান হয়েছিল, উত্তর ভারতীয় মুসলমানদেরও সেই একই নীতি গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। খৃষ্টান শাসনকে গ্রহণ ও তার সঙ্গে সহযোগের মনোভাব মুসলমানদের মধ্যে জাগাতে হলে অবশ্য তাদের মনের অভ্যাসের আমূল

পরিবর্তন এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে নূতন পথে চালিত করা প্রয়োজন। একটি সম্প্রদায়কে তার অভ্যস্ত চিন্তা-রীতি ও কর্মপদ্ধতির ঐতিহ্য ছাড়াতে হলে শুধু নূতন চিন্তাসূত্র (set of ideas and principles) ও দিক্‌দর্শনেরই প্রয়োজন নয়, তার সঙ্গে পরম আত্মপ্রত্যয়, একটি অনন্যতাবোধ ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধিরও প্রয়োজন ছিল।

সৈয়দ আহমদ খানের প্রচেষ্টা যুগের এই দাবীকেই রূপ দিয়েছিল। একদিকে তিনি মুসলমান সমাজে ইংরাজ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুকূল মনোভাব তৈরী করতে চেষ্টা করেন। আর অন্য দিকে মুসলমানকে বিশ্বাষঘাতক মনে করার যে অভ্যাস ইংরাজ সরকার মহলে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তা দূর করতে সচেষ্ট হন। ইংরাজ শাসন ও সভ্যতার আদর্শকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করার পক্ষে রাজনীতি শাস্ত্র, সমাজনীতি, ইতিহাস ও বিজ্ঞান ইত্যাদি থেকে যুক্তি সংগ্রহ করে চিন্তা ও আচরণের যে আদর্শ তিনি প্রচার করেন—তাতে মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের একটি নৈতিক ভিত্তি রচিত হোল। এই আদর্শ সমকালীন ইয়োরোপীয় সমাজ ও সংস্কৃতির মূল্যমান থেকে সঙ্কলিত ; যেখানে এর সঙ্গে মুসলমানের অভ্যস্ত ধর্ম-বিশ্বাস ও আত্ম-মর্যাদার বিরোধ দেখা দিয়েছে, সেখানেই সৈয়দ আহমদ কোরানের সূত্র ও ইতিহাসের তথ্যকে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানের সাহায্যে পুনর্ব্যাখ্যা করে ইসলামের সঙ্গে তার সমন্বয় করতে চেষ্টা করেছেন। নূতন আদর্শ প্রচারের এই আন্দোলনের ভিতর দিয়ে মুসলমানের চিন্তা জগতে যে বিপ্লব সাধিত হোল—চিন্তা ও কর্মের নানাক্ষেত্রে এখনও তার স্বাক্ষর রয়েছে। এখানে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, এই আন্দোলনের দ্বারা সৈয়দ আহমদ ইসলাম ও মুসলমান সংস্কৃতিকে যুগোপযোগী করে উপস্থাপিত করার বুদ্ধিগ্রাহ্য উপায় (intellectual method) সৃষ্টি করেছিলেন, যাকে জীবনবেদের মত ব্যবহার করে আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে ভারতের মুসলমান সমাজ

মধ্যবিত্তরূপে গঠিত ও সম্প্রসারিত হতে পারে।

ঐতিহাসিক চিন্তার দিক দিয়ে আলীগড় আন্দোলন তেমন কোনও নূতন ভাবনা বা সূত্রের প্রবর্তন করতে পারেনি। গণতন্ত্র, আত্মনিয়ন্ত্রণ বা সামাজিক ন্যায় বিচার (Social Justice) প্রভৃতি আদর্শের সঙ্গে আন্দোলনের Motive forceএর তেমন যোগ ছিলনা বলেই হয়ত সে যুগের উর্দু ঐতিহাসিক রচনাগুলিতে এসব ভাবনার স্বীকৃতি বা গভীর প্রতিফলন দেখা যায় না। সৈয়দ আহমদের এক প্রধান সহকর্মী এবং উত্তরকালে এ আন্দোলনের নেতা মৌলুবী মুশতাক্ হোসেন (পরে, নবাব ভিকারুল মুল্‌ক্) ১৮৭২ সালে ইংরাজি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের একটি ইতিহাস প্রণয়ন করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে বইটির ৩।৪টি সংস্করণ হয়েছিল। এবং লেখকও সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছিলেন। এতে ফরাসী বিপ্লবের মূল কারণগুলির গুরুত্ব ব্যাখ্যা না করে রাজবংশের পতনকে কেন্দ্র করেই বিপ্লবের ঘটনাগুলি বর্ণনা করা হয়েছে। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা মন্ত্রের উল্লেখ আছে অবশ্য তথ্যের মত, কিন্তু তার ঐতিহাসিক তাৎপর্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা নাই। মুখবন্ধে লেখক বলেছেন, "মানব কীর্ত্তির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম দেখিয়ে পাঠকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করার জন্য এ ইতিহাস লেখা হলো। এই পুস্তক থেকে আরও প্রমাণ হবে যে জননী শিক্ষিতা হলে সন্তানের শিক্ষা ও চরিত্র গঠন কত সহজ ও কত ভালভাবে হতে পারে।" (১)

প্রায় ৭০ বৎসর আগে মির্জা আবু তালেব খান নামক মুর্শিদাবাদ দরবারের অবসর প্রাপ্ত একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী তাঁর ইয়োরোপ ভ্রমণের একটি বৃত্তান্ত ফার্শিতে লিখেছিলেন। ইনি ফরাসী বিপ্লবের দশ বৎসর পর ইয়োরোপ গিয়েছিলেন এবং নেপোলিয়নের First Consul থাকাকালে লণ্ডন থেকে প্যারিস গিয়ে দ্বিতীয় Consul Tallyrand এর সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগও পেয়েছিলেন।

লণ্ডনে থাকা কালেও তিনি বিশিষ্ট রাজপুরুষদের সাথে মেলা মেশা করেছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের ঘটনা জানার ও তার তাৎপর্য লিপিবদ্ধ করার ঘনিষ্ঠ সুযোগ তিনি যতটা পেয়েছিলেন এশিয়ার আর কোনও লেখক তেমন পেয়েছিলেন বলে জানা যায়নি। অথচ তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে এ বিপ্লবের যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে তাতে ফ্রান্সের রাজপরিবার ও অভিজাতদের দুর্গতি ও প্রজাদের নৃশংস আচরণের কাহিনীই বেশী, বিপ্লবের গুরুত্ব উপলব্ধির পরিচয় নাই। (২)

ইতিহাসকে এই ভাবে নীতিশিক্ষা ও চরিত্রগঠনের উপায় রূপে দেখায় মধ্যযুগীয় রীতির তেমন পরিবর্তন আলীগড় আন্দোলনের দ্বারা হয়নি। এই দৃষ্টিকোণের অন্তর্গত কয়েকটি বিশেষ দিক (aspect) ও চিন্তাসূত্রগুলি নবাবিষ্কৃত ঐতিহাসিক তথ্যের আলোকে উদ্ভাসিত ও পরিণত হবার সুযোগ পেল মাত্র। ফার্শি ইতিহাসগুলিতে মধ্যযুগের মুসলমান রাজাদের সাম্রাজ্যলিপ্সার কোনও নিন্দা ত' থাকতইনা, রাজধর্মের নামে বিজয়ীদের অকুণ্ঠ সমর্থন-ই করা হতো। এ মনোভাবের যতটুকু ব্যতিক্রম উর্দু ইতিহাসে দেখা গেল তা উনিশ শতকের উপযোগী যুক্তির অবতারণায়। ইংরাজরা তাদের উপনিবেশ-নীতি ও সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে যেমন শ্বেতজাতির সভ্যতাবিস্তারের গুরুদায়িত্বের দোহাই পাড়ত, উর্দু ঐতিহাসিকরাও তেমনই অতীতের মুসলমান সাম্রাজ্যগুলিকে সংস্কৃতি-সভ্যতা বিস্তারের সহায়ক রূপে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হলেন। হিন্দু সমাজ ইংরাজ ব্যবস্থায় যে সব সুবিধা ভোগ করছিল, তার অংশীদার হওয়ার দাবী থেকে আলীগড় আন্দোলন গড়ে ওঠে বলে এর ঐতিহাসিক চিন্তারীতিতে হিন্দুদের প্রতি বিরোধ, ঈর্ষা ও অবিশ্বাসের ভাব অবচেতন ভাবেই জমে ওঠে। এ চিন্তারীতির রাজনৈতিক কাঠামো ছিল ইংরাজের প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা, কিন্তু এর সাংস্কৃতিক লক্ষ্য হোল ইসলামের নীতি ও কীর্তিকে পাশ্চাত্য মূল্যমান অনুযায়ী

ব্যাখ্যা ও প্রচার করা। তাই মুসলমানের সংস্কৃতিক ইতিহাসে অমুসলমান বা ভারতীয় উপাদানের গুরুত্বকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করা যেমন অভ্যাসে পরিণত হোল, তেমনই বিশ্ব মুসলিম সমাজের সাথে যে সব ক্ষেত্রে ভারতীয় মুসলমানদের যোগ আবিষ্কার করা যায়, সেগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া ঐতিহাসিকের একমাত্র কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল। ধর্ম সংস্কৃতিতে বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় মুসলমানকে তার গৌরবোজ্জ্বল অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে বর্তমান অধঃপতন সম্বন্ধে তাকে সচেতন করার প্রেরণা এই ভাবে উর্দু লেখকদের ঐতিহাসিক চিন্তার স্থায়ী লক্ষণ হয়ে রইল।

১৮৭৯ সালে আলতাফ হোসেন হালীর সুবিখ্যাত 'মুসাদ্দাসে' এই মনোভাব সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয়, যাতে বিশ্ব-মুসলিম শক্তির উত্থান পতনের কাহিনী আবেগময় কাব্যের ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছিল। সমাজের চিন্তা ভাবনা, আশা আকাঙ্ক্ষাকে ইতিহাসের মাধ্যমে রূপ দেওয়ার জন্য এ কাব্যটি সঙ্গে সঙ্গেই বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। এবং লক্ষণীয় এই যে, উর্দুভাষীদের মধ্যে সে জনপ্রিয়তা আজও কমেনি। যে দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসকে দেখার রীতি এ সময়ে উৎসাহের সঙ্গে প্রচারিত হতে থাকল তার স্পষ্টতর ইঙ্গিত পাওয়া যায় হালীর আর একটি ছোট কবিতা 'শেকোয়-এ-হিন্দে,' যার আবেগের আন্তরিকতা মুসলমান সমাজকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। সে ইঙ্গিত কবিতাটির প্রস্তাবনাতেই আছেঃ "হে চিরবসন্তের দেশ হিন্দুস্থান, বিদায়! বিদেশ থেকে এসে বহুদিন তোমার আতিথেয়তা ভোগ করে গেলাম"। 'হজরত মুহম্মদের দরবারে আর্জি' এই শিরোনামায় হালীর আর একটি ছোট কবিতা আছে যার প্রথম ক'টি লাইনে ভারতের দুর্গত মুসলমানদের দিকে হজরতকে দৃষ্টিপাত করতে অনুরোধ জানান হয়েছে কেননা, "যারা একদিন স্বদেশ থেকে মহা সমারোহে বেরিয়ে দিকে দিকে তাঁর

জয় ঘোষণা করেছিল, আজ তারা বিদেশ বিভূঁয়ে অনাত্মীয়ের মধ্যে দীনহীনভাবে পড়ে রয়েছে"।

এই ঐতিহাসিক মনোভাবের দু'টি ফল অনিবার্য ছিল। ভারতবর্ষ যে মুসলমানের দেশ নয়, এ অনুভূতি প্রসারের ফলে ভারত-ইতিহাসের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতায় অংশ গ্রহণে বা তার সাথে আত্মীয়তাবোধে অনিচ্ছা, আর তারই সঙ্গে ইসলামের জন্মভূমি ও বিশ্ব-মুসলিমের সমৃদ্ধির যুগের প্রতি মুসলমানের টান নিরন্তর বাড়তে লাগল। ইসলামের সার্বজনীনতার পরিপ্রেক্ষিতে এই Extraterritorialism উর্দুভাষী মুসলমানদের মনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়াবার ফলে প্যান্ ইসলামের আদর্শ তাদের মনে গভীরভাবে আঁকা হয়ে গেল। মুসলিম রাষ্ট্রশক্তির জীবন্ত প্রতীক হিসাবে তুর্কীর খলিফার প্রতি আনুগত্যের ভাব এই কারণে এত বেড়ে গেল যে উত্তর ভারতের অনেক মসজিদে সুলতান আবদুল হামীদের নামে খুতবা পড়ার কথাও ব্রিটিশ সরকারের কানে এল। প্যান ইসলামের বিখ্যাত মন্ত্রগুরু জামালুদ্দিন আফগানি এ সময়ে কিছু দিনের জন্য ভারতে নজরবন্দি হয়ে বাস করেছিলেন—তাঁর প্রভাবে এ উদ্দীপনা এত তীব্র হয়ে দাঁড়াল যে আলীগড় আন্দোলনের মূল রাজনৈতিক আদর্শ—ইংরাজ সরকারের উপর অবিচলিত ভক্তি—সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠল এবং এই পরিণতি রোধ করার জন্য স্যার সৈয়দ আহমদকে প্যান্ ইসলামের বিরোধিতাও করতে হয়েছিল। (৩)

চার

এ আন্দোলনের প্রেরণায় রচিত ইতিহাসের সংখ্যা অবশ্য তেমন বেশী নয়। মুসলমানের অতীতকে কীর্তিগাথা ও নীতিমূলক

জীবনচরিতের (commemorative and didactic) মাধ্যমে উপস্থিত করা এসব রচনার প্রধান রীতি। জীবনচরিতের বিষয় নির্বাচনে ও গুরুত্ব আরোপনে সাহিত্য ও সংস্কৃতিই ছিল মাপকাঠি। যেমন হালীর ক্ষেত্রে দেখা যায়। ইনি কবি গালিব ও শেখ সাদীর স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন। এঁর রচিত স্যার সৈয়দের জীবন চরিত 'হায়াত্-এ-জাবেদ উর্দুর ঐতিহাসিক জীবনী সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট অবদান। ইতিহাস চেতনাকে এইভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক রূপ দেওয়ার ফলে উর্দু ভাষায় জীবন চরিত ও আত্মজীবনী রচনা যত প্রচুর সংখ্যায় হয়েছে, ভারতের অন্য কোনও ভাষায় তেমন হয়েছে কিনা সন্দেহ।

উর্দুতে ইতিহাসের এই রূপায়ন ও মানোন্নতি সাধনে আলীগড় কলেজের অধ্যাপক শিব্‌লী নোমানীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। তাঁর ইতিহাস সচেতন রচনাগুলিই মুসলিম কীর্তির তথ্যনির্ভর মূল্যায়ণে দিক্‌নির্দেশ ও গতিসঞ্চার করেছিল। শিবলীর মন ছিল কাব্যধর্মী কিন্তু তাঁর গভীর ইতিহাসবোধ ছিল। তিনি ইংরাজী জানতেন না এবং ধর্মতত্ত্ব ও সাহিত্য-প্রধান পুরাতন শিক্ষারীতিতে তাঁর মানস গঠিত হয়েছিল। তাঁর চোখে, সাহিত্যে প্রতিফলিত মানুষের সংস্কৃতিবোধের ক্রমবিকাশই হোল ইতিহাসের একমাত্র অন্বিষ্ট, আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মানুভূতি যার শক্তির মূল উৎস। তাঁর সহকর্মী অধ্যাপক T. W. Arnold তাঁকে পাশ্চাত্য গবেষণা-রীতি ও আবিষ্কৃত ঐতিহাসিক তথ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন বটে, কিন্তু একমাত্র বিবর্তনবাদ (Evolution) ছাড়া তাঁর ঐতিহাসিক ধারণায় পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালীর আর কোনও প্রভাব তেমন লক্ষণীয়ভাবে পড়েনি। তাঁর চিন্তায় সমসাময়িক ইংরাজ লেখক Carlyle এর আদর্শবাদের, বিশেষকরে Heroes and Hero-worship এর সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষণীয় যার একটি আরবী তর্জমা তিনি পড়েছিলেন। ১৮৮৯ সালে শিবলী দুইখণ্ডে আব্বাসীয় খলিফা আল-মামুনের জীবন চরিত

প্রকাশ করেন। আল-মামুনের ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে যে তিনি এ গ্রন্থ লিখেছিলেন তা নয়; সে যুগের সাংস্কৃতিক গৌরবই তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। গ্রন্থের মুখবন্ধে তিনি বলেছেন: "হারূনল-রশীদ যদি বারমাক বংশের হত্যায় লিপ্ত না থাকতেন তাহলে এ গ্রন্থের নায়ক হিসাবে তাঁকেই আমি নির্বাচন করতাম।" (৪) তথ্যের যাথার্থ্য স্বীকার ও নিরপেক্ষ বর্ণনার দাবী করা সত্ত্বেও আলোচ্য চরিত্র ও যুগকে আদর্শায়িত করে দেখাবার চেষ্টা এ গ্রন্থের সর্বত্র দেখা যায়। দশ বৎসর পরে প্রকাশিত তাঁর আর একটি ঐতিহাসিক জীবন-চরিত 'আল ফারূকে' এ প্রবণতা কিছুটা সংযত রূপ নিয়েছে কেননা খলিফা ওমরকে আবেগ উত্তেজনাময় রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ হিসাবে তিনি দেখেছেন, ভুল প্রমাদ যার পক্ষে অসম্ভব নয়। তবু, ওমরের প্রতি শিবলীর প্রগাঢ় শ্রদ্ধার স্বাক্ষর এ বইটির প্রতি ছত্রে রয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে সমকালীন ভারতের সরকারী পরিভাষায় ওমরের প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থার একটি সোৎসাহ বর্ণনা আছে। কিন্তু আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয় যে, লেখক শাসনব্যবস্থার ন্যায়বিচার, কর্মদক্ষতা ও সাম্যবাদের ওপর জোর দিয়েছেন, অথচ আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার, প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন-আদর্শের প্রতি তেমন মনোযোগ দেননি। শিবলীর আর দুইটি জীবনীগ্রন্থ 'আল গাজ্জালী' ও 'সিরাতুন নোমানে' ও আদর্শায়িত ব্যক্তিচরিত্রের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক কীর্তির ইতিহাস লেখার রীতি পালিত হয়েছে। 'আল ফারূক'কে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা মনে করতেন এবং প্যান-ইসলামী উদ্দীপনার ফলেই এ গ্রন্থটি জনপ্রিয়ও হয়েছিল সবচেয়ে বেশী। তাঁর শেষ জীবনের রচনা 'সিরাতুন নবী'ই তার সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক কীর্ত্তি। এ গ্রন্থটির মাত্র দুইখণ্ড তিনি লিখে যেতে পেরেছিলেন; পরে তাঁর শিষ্য সুলেমান নাদ্‌ভী, শিবলীর চিন্তাসূত্রকে অনুসরণ করে এটি সম্পূর্ণ করেন। শিব্‌লী ইতিহাসে পারিপার্শ্বিকের প্রভাব স্বীকার করতেন কিন্তু স্যার সৈয়দের

বিজ্ঞান ও বিবর্তনবাদ প্রসূত বস্তুতান্ত্রিকতার সাথে গভীর ধর্মীয় আদর্শবাদ মিলিয়ে তিনি সমতা রক্ষার চেষ্টা করেছেন। 'সিরাতুন নবী'তে হজরতের জীবনের অলৌকিক ঘটনাগুলিকে বাদ দিয়ে তাঁকে মানবতার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন; স্যার সৈয়দের 'খুত্‌বাত –এ- আহমদীয়া'র মত, ইয়োরোপীয় সমালোচনার জবাব দেওয়ার তেমন প্রয়োজন মনে করেননি। ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানের মনে মুসলিম ইতিহাসের ধারণা যেমন আমীর আলীর History of the Saracens ও Spirit of Islamকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে প্রাথমিক ইসলাম সম্বন্ধে সাধারণ উর্দু পাঠকের মনও তেমমই শিব্‌লীর ঐতিহাসিক জীবনীগুলিকে আশ্রয় করেই গঠিত হয়েছে। তাঁর আর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ 'শের্‌-উল-আজম্‌,' ফার্শি কাব্যের ইতিহাস। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতরাও এর মৌলিকতার সুখ্যাতি করেছেন। এটিও কিন্তু জীবনীমূলক; কাব্যের ভাব ও রীতি বিবর্তনের ধারাবাহিক ইতিহাস নয়, বিভিন্ন কবির কাব্যজীবনের পর্যালোচনা।

পাঁচ

ইতিহাসের একমাত্র বিষয়বস্তু হিসাবে মুসলিম জাহান, বিশেষ করে তার সাংস্কৃতিক কীর্তির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা আর সে কীর্তিকে আদর্শায়িত করে বর্ণনা করার অভ্যাস শিব্‌লীর দৃষ্টান্তে সমস্ত উর্দু ঐতিহাসিকদেরই বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াল। যে দেশ বা জাতি ইসলামের রাজনৈতিক আওতায় আসেনি, উর্দু লেখকদের চোখে তার কোন নিজস্ব গুরুত্ব নাই। মুসলমান প্রভাবিত দেশ গুলির ইতিহাসও আবার ইসলামের আবির্ভাব থেকে আরম্ভ করা হয়, যেন তার পূর্বে মানব সমাজ ও সভ্যতার কোনও উল্লেখযোগ্য

অস্তিত্বই ছিল না। মুসলিম জাহানের ইতিহাসও কেবল মাত্র মুসলমানের শক্তি ও গৌরবের ইতিহাস, অবনতির বর্ণনা নয়। সে জন্য বাগদাদের, স্পেনের ওমাইয়া খিলাফতের ও ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের সভ্যতা ঐশ্বর্য নিয়ে উর্দুতে যত ঐতিহাসিক রচনা আছে, এদের পতনের যুগ নিয়ে লেখা রচনার সংখ্যা তত নয়। পতন বা অবনতির কথা এলেই, ইসলামের মূল আদর্শ বর্জন ও অনৈসলামিক আচার ব্যবহারের প্রসারকে সে পতনের জন্য দায়ী করা, আর তারই অনুসিদ্ধান্তের (corollaryর) মত, মধ্যযুগের মুসলমান শাসনপ্রণালী রীতিনীতি ও সাংস্কৃতিক মানের উৎকৃষ্টতায় অহেতুক ও অযৌক্তিক বিশ্বাস, এই ইতিহাসগুলির বিশিষ্ট লক্ষণ। বিশ্ব ইতিহাসের মানদণ্ডে মুসলমানের এই কার্যকলাপকে বিচার করার অনিচ্ছা এই বিশ্বাসেরই আর এক দিক। অ-মুসলিম, বিশেষ করে অ-মুসলমান ভারতীয়দের, আইন কানুন, চিন্তারীতি, আচার অনুষ্ঠানে মর্যাদা যোগ্য কিছু থাকতে পারে, তা বিবেচনা করাও নিষ্প্রয়োজন। অবশ্য প্রাচীন সভ্যতার প্রতি এই অবজ্ঞার ভাব এখন অনেকটা কমেছে, তবু উর্দুর ঐতিহাসিক চিন্তার এ মনোভাব কিরূপ ব্যাপক ছিল বর্তমান যুগের এক শ্রেণীর রচনায় তার পুনরাবির্ভাব থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

এ মনোভাবের প্রতিফলন বিশেষ করে ভারতবর্ষের ইতিহাস সংক্রান্ত লেখাগুলিতে দেখা যায়। উনিশ শতকের শেষ দশকে দশ খণ্ডে প্রকাশিত জাকাউল্লার 'তারিখ-এ-হিন্দুস্থান' উর্দু ভাষায় ভারতবর্ষের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার সর্বপ্রথম দৃষ্টান্ত। এটিকে অবশ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস না বলে ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস বলাই উচিত। কারণ, এর আরম্ভ আরবদের সিন্ধু বিজয় থেকেও নয়—একেবারে আরবদেশে ইসলামের আবির্ভাব থেকেই, আর শেষ হয়েছে—সিপাহী বিদ্রোহ ও বাহাদুর শাহের নির্বাসনের সঙ্গে। উপক্রমণিকায়, ফার্শি ইতিহাসের রীতিতে, প্রাচীন ও

আধুনিক ঐতিহাসিকদের রচনা থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি সহ ইতিহাস শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও নীতি শিক্ষার জন্য তার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থটি মধ্যযুগীয় রীতি পালনের প্রকৃষ্ট নমুনা। ফার্শি ইতিবৃত্তের মত বিভিন্ন সাক্ষ্য ও তথ্যের সঙ্কলনকেই ইতিহাস হিসাবে পেশ করা হয়েছে, তথ্যের অনুবদ্ধ ব্যাখ্যা বা নৈতিক মূল্যায়ণ হিসাবে নয়। যুদ্ধবিগ্রহ, রাজকীয়-আড়ম্বর উৎসবে সূক্ষ্ম ও জীবন্ত (minute and vivid) বর্ণনা রাজ-পুরুষদের আচরণে একান্ত মানোনিবেশ ঘটনার তুচ্ছতা উপেক্ষা করে ঘটনামূলক বেগবান কাহিনী রচনা করা প্রভৃতি ফার্শি ইতিহাসের সমস্ত লক্ষণই বর্তমান। আলাউদ্দিন খিলজী বা তৈমুরের নৃশংসতার মত মুসলমান রাজাদের নিন্দনীয় আচরণের কোনই সমালোচনা ত' নাই-ই বরঞ্চ তাদের দৃঢ়তা ও শত্রুদমনে দক্ষতার প্রশংসাই করা হয়েছে। আওরঙ্গজেবের প্রতি জাকাউল্লার সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা খুবই প্রকট ; শরীয়ত পালনে সম্রাটের নিষ্ঠা ও সাহসের উচ্ছ্বাসময় বর্ণনা দিয়েছেন। ব্যক্তিকেন্দ্রিত এই ইতিহাসকে এতই সঙ্কীর্ণ পথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে, ১৮ শতকের শেষের দিকে ইংরাজ-কোম্পানী যে সর্বভারতীয় শক্তি রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করছিল তার কোনও বিবরণ ত' নাই-ই, আভাসে-ইঙ্গিতেও তার উল্লেখ করা হয়নি। সমসাময়িক ঘটনার বর্ণনাতেও জাকাউল্লার ব্যক্তিকেন্দ্রিত অনুবীক্ষণি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় আছে। বাহাদুর শাহের নির্বাচন প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ ঘটনার তাৎপর্য বর্ণনা বা মুসলমান শক্তির এই চরম পতনের কারণ বিশ্লেষণ করার কোন প্রয়োজন তিনি বোধ করেননি।

জাকাউল্লার মানসিকতার আর একদিকের পরিচয় গ্রন্থটির শেষ অধ্যায়ে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনের একটা মূল্যায়ণ হিসাবে হিন্দুরা মুসলমান রাজত্বের ফলে কী ভাবে উপকৃত হ'য়েছে তার আলোচনা করতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন যে হিন্দু শাসন-

ব্যবস্থার কোনও সংবাদ তেমন জানা যায় না। তাঁর যুগে এ কথা আংশিক সত্য ছিল বটে, কিন্তু এ মন্তব্য করার পরই তিনি হিন্দু শাসন ব্যবস্থার একটা কাল্পনিক বর্ণনা দিয়ে তার সঙ্গে মুসলমান শাসনের তুলনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এবং উপসংহারে ফার্সি ঐতিহাসিকদের আত্মতৃপ্ত (self cnmplacent) ভঙ্গিতে তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন এই বলে যে রীতি, নীতি, আইনকানুন, শিল্পসাহিত্য, কোন ক্ষেত্রেই হিন্দুদের তেমন উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ছিল না, আর থাকলেও তা মুসলমানদের সাথে তুলনা করার যোগ্য নয়। কাজেই মুসলমান শাসনের ফলে যে ভারতবর্ষ সভ্য হয়েছে তাতে সন্দেহ নাই। (৫) শিবলী নোমানিও তাঁর একটি প্রবন্ধে এইরূপ মন্তব্য করেছিলেন : "অন্যের দেশ আক্রমণ করে দখল করা তেমন দোষের কথা নয় ; আসলে, সভ্যতাবিস্তারের যোগ্যতা ও আগ্রহ দিয়েই বিজয়ীকে আমাদের বিচার করা উচিত।" (৬)

এ যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাসেও এই মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসে এ ধারার প্রবর্তক ছিলেন সাংবাদিক আবদুল হালিম শরর। দুনিয়া থেকে মিথ্যা ও অসুন্দরকে দূর করে ন্যায়বিচার ও বিশ্বমানবতার প্রতিষ্ঠা করতে, সাম্যবাদের পতাকাবাহী ইসলামের মহান প্রচেষ্টাই তাঁর উপন্যাসের মূল সুর। স্পেনে, ভারতবর্ষে ও খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইসলামের ক্ষাত্রশক্তি, মহত্ব ও সৌকর্যকে আদর্শায়িত করে দেখানোর উৎসাহে শরর কাহিনী বা চরিত্রাঙ্কনকেও উপেক্ষা করেছেন। ইনি সিন্ধুতে মুসলমান শাসনের একটি ইতিহাসও প্রণয়ন করেন। তার উপাদান বেশীর ভাগই Elliot এর সঙ্কলিত ইংরাজি ইতিহাস থেকে নেওয়া হয়েছিল। এতে, জাকাউল্লার 'তারিখের' মত, বিভিন্ন বিবরণ ও সাক্ষ্যকে ফার্শি ইতিহাসের রীতি অনুযায়ী, অত্যন্ত যত্নের সাথে লিপিবদ্ধ করা হলেও ঘটনার মূল্যনিরূপণে ঐতিহাসিক গুরুত্ব ব্যাখ্যার চেষ্টা আছে এবং সেজন্য এ রচনাটি উর্দুর ইতিহাস-সাহিত্যে একটি মূল্যবান

সংযোজনা। নীতি প্রচারের মহৎ উদ্দেশ্যে নিযুক্ত থাকলেও শররের চিত্তবৃত্তি ছিল আসলে রোমান্টিক কাহিনী কারের। সেজন্য লখনৌএর শেষ বাদশাহকে নিয়ে লেখা তার আর একটি রচনা 'মাশ্‌রেকি তামাদ্দুন কা আখরী বাহার্‌' এই পতনোন্মুখ রাজত্বের ইতিহাস না হয়ে ওয়াজিদ আলি শাহের দরবারী ঐশ্বর্য ও সংস্কৃতি-চর্যার একটি আদর্শায়িত আবেগময় বর্ণনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ছয়

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে, ভারতের ভাষাগুলির মত, উর্দু ইতিহাস-সাহিত্যেও রাজনৈতিক আন্দোলন-সৃষ্ট মনোভাব প্রতিফলিত হতে থাকে। প্যান্‌ ইসলামী আদর্শের টানে মুসলমানরা ক্রমেই ইংরাজবিরোধী ও মুক্তি আন্দোলনের সমর্থক হয়ে ওঠে। মুক্তির জন্য হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি সর্বাগ্রে প্রয়োজন, সেজন্য ইতিহাস থেকে এই দুই জাতির মধ্যে অতীত সৌহার্দ্যের প্রমাণ সংগ্রহ ও বিবরণ দেওয়া ঐতিহাসিকের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। যে সব অতীত ঘটনা হিন্দু মুসলমান সম্পর্কে ফাটল ধরাতে পারে, সেগুলির পুনর্ব্যাখ্যা ও কৈফিয়ৎ দেওয়া ঐতিহাসিকের দায়িত্ব বলে গণ্য হোল। ইংরাজ যেহেতু মুক্তি আন্দোলনের একমাত্র প্রতিবন্ধক হিন্দু-মুসলমান বিরোধকে জিইয়ে রাখার জন্য ইংরাজ লেখকদের দুরভিসন্ধিকে সেজন্য দায়ী করে নিশ্চিন্ত মনে ইতিহাসকে সময়ের তাগিদানুযায়ী ব্যাখ্যা করা ঐতিহাসিকের পক্ষে সহজ ছিল। চিন্তার প্রসার ও যুক্তি প্রমাণের সমৃদ্ধি থাকা সত্ত্বেও এ যুগের ইতিহাস বিষয়ক রচনাবলীতে এই সাময়িকতার ছাপ খুবই বেশী। তাছাড়া আর্য সমাজীদের শুদ্ধি আন্দোলন, হিন্দি-উর্দু বিবাদ, নূতন ও পুরাতনপন্থী মুসলমানের চিরন্তন বিরোধ প্রভৃতি

সাময়িক প্রশ্নের দরুন উর্দু-ভাষী মুসলমানের মনে যে জটিলতা ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, তার ফলে ঐতিহাসিক চিন্তার লক্ষ্যও অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। এ সময়ে শিবলীর লেখা কয়েকটি প্রবন্ধ থেকে এ দ্বন্দ্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মুসলমানদিগকে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিবার উৎসাহ দিয়ে তিনি ১৯১৩ সালে লক্ষ্ণৌএর উর্দু 'মুসলিম গেজেটে' কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তার একটিতে ইতিহাস থেকে মুসলমান বাদশাদের ধর্মান্ধতা সত্ত্বেও তাদের প্রতি হিন্দুদের অকুণ্ঠ আনুগত্য ও সহযোগিতার নজীর দেখিয়ে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও তাদের বন্ধুত্বে আস্থা স্থাপন করতে তিনি মুসলমানদেরকে উপদেশ দেন। চার বছর পরে, ঘটনাপ্রবাহ তাঁকে এ মত পরিবর্তন করতে বাধ্য করে এবং আর একটি প্রবন্ধ লিখে তাঁকে স্বীকার করতে হয় যে, হিন্দুদের আনুগত্যের মূলে তাদের উদারতার চেয়ে মুসলমান বাদশাদের সহৃদয় ব্যবহারই ছিল বেশী কার্যকরী। (৭)

এ যুগের রচনাগুলিতে সাময়িকতার প্রতিফলন আর একদিক দিয়েও দেখা যায়। ইতিহাস থেকে মুসলমানদের সমকালীন কর্মনীতির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করার আগ্রহ লেখাগুলিতে স্পষ্ট। 'আওরঙ্গজেব আলমগীর পর একনজর' নামক দীর্ঘ প্রবন্ধটি তার দৃষ্টান্ত। এটি খিলাফত নেতা মওলানা মুহম্মদ আলীর অনুরোধক্রমে লেখা এবং যুক্তি ও তথ্যের গুণে উর্দু ইতিহাস-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট রচনা। এতে আওরঙ্গজেবের সম্পূর্ণ ইতিহাস নাই। তাঁর যেসব কার্যের ন্যায়-অন্যায় নিয়ে ইংরাজ ও সাম্প্রদায়িক হিন্দু লেখকরা বক্রোক্তি করে থাকে, এবং যা হিন্দু-মুসলমানের মনে বিদ্বেষের সঞ্চার করতে পারে, তারই এক তথ্য-নির্ভর ব্যাখ্যা। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি রক্ষার উদ্দেশ্যে লিখিত হলেও প্যান-ইসলামি জাতীয়তার দৃষ্টিকোণ থেকেই আওরঙ্গজেবকে বিচার করা হয়েছে। তাঁকে ভারতীয় নৃপতির চেয়ে মুসলমান বাদশা হিসাবে

দেখার দরুন, শাসন কাজে শরীয়তের নীতি প্রতিষ্ঠা, দারা শুকোহের ধর্ম সমন্বয় প্রচেষ্টার বিরোধ, আকবরের ধর্ম নিরপেক্ষ শাসন-নীতি বর্জন প্রভৃতি কয়েকটি কার্যের জন্য শিব্‌লী তাঁকে সমালোচনা করেননি। যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্যের সততা প্রমাণ করেছেন মাত্র। বিশ্বমুসলিম সমাজের ভারতীয় শাখা, স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীদের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে যে সৌহার্দ্য ও প্রীতির সূত্রে আবদ্ধ ছিল, আওরঙ্গজেবের নীতি তার পরিপন্থী ত নয়-ই, বরঞ্চ মুসলমানকে স্বধর্ম রক্ষায় প্রবৃত্ত করার ফলে উভয়ের মধ্য দিয়ে যে সমতা বিধান করার চেষ্টা এ নীতির মূলে ছিল, তার দরুন সে সূত্র আরও দৃঢ় হবারই কথা। (৮) শিব্‌লীর যুক্তিতে তাঁর সমকালীন ধর্মানুপ্রাণিত ইংরাজবিরোধী মুসলমান আন্দোলনের ছায়াপাত সুস্পষ্ট।

সাত

খিলাফত আন্দোলন ব্যর্থ হবার পর উর্দুর ঐতিহাসিক চিন্তা-বৃত্তির আরও স্বচ্ছতর প্যাটার্ণ চোখে পড়ে। শিব্‌লীর চিন্তাধারা অবশ্য এ প্যাটার্ণের ভিত্তি। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত আজমগড়ের 'দারুল মুসান্নেফী'নের উদ্যোগে তাঁর শিষ্য ও সহকর্মী সুলেমান নাদ্‌ভী সে চিন্তার সূত্রগুলিকে আরও প্রসারিত করেন। ঐতিহাসিক হিসাবে উর্দু-সাহিত্যে শিব্‌লীর পরই সুলেমান নাদ্‌ভীর স্থান। উর্দু ইতিহাস-সাহিত্যে শিব্‌লীর সবচেয়ে বড় দান এই যে তিনি মূল দলীল-দস্তাবেজগুলির উদ্ধার ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তার পরীক্ষা ও ব্যবহারের ধারা প্রবর্তন করেছিলেন। এ ধারা আজমগড় গোষ্ঠী অব্যাহত রেখেছেন। এঁদের চিন্তায় শিব্‌লীর প্রভাব ত আছেই ওহাবী মনোবৃত্তির রেশও দুর্লভ নয়; জাতীয়তাবাদ, পাশ্চাত্য শিক্ষা

সভ্যতার প্রতি বিদ্বেষ ও সাহিত্য ও ধর্মতত্ত্বের দিকে ঐকান্তিক ঝোঁক তার দৃষ্টান্ত। মুসলমান ও তাদের সংস্কৃতি যে ভারতের জীবনে প্রধানতঃ বিদেশাগত উপাদান, যার পৃথক সত্তার স্বীকৃতি ও সংরক্ষণ দেশীয় উপাদানের তুল্য মর্যাদায় ও সহযোগিতায় হওয়ার দরকার, এ বিশ্বাসের দৃঢ়তা এই লেখক গোষ্ঠির আর একটি বৈশিষ্ট্য। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনে এঁরা বিশ্বাসী ও সচেষ্ট কিন্তু বাঞ্ছিত পরিণতি হিসাবে এদের সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের কল্পনা এঁদের চিন্তারীতির বিরোধী। এঁদের ঐতিহাসিক রচনাগুলি প্রধানতঃ সাহিত্য ও ধর্মতত্ত্ব নিয়ে; রাজনৈতিক ইতিহাস-রচনায় এঁদের উৎসাহ নাই। কেবলমাত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের চাপে পড়ে ভারতবর্ষকেও এঁরা সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, নয়ত এঁদের ইতিহাসবোধ ভারতবর্ষ-সচেতন নয়। আরবী ইতিহাসপ্রণালী অনুসরণ করে জীবনী আকারে রচিত সাহিত্য ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে এঁদের ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলি গবেষণার মৌলিকতা ও রচনাশৈলীর গুণে ইয়োরোপীয় Orientalistদেরও শ্রদ্ধা অর্জন করেছে।

হিন্দু-মুসলমানের এক জাতিত্বের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রচিত ইতিহাসের সংখ্যা উর্দু ভাষায় বেশী নাই। ১৯৩৫ সাল থেকে এ মনোভাবের তেমন অকুণ্ঠ প্রকাশও দেখা যায় না। ১৯৩১ সালে সুলেমান নাদভী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে পুষ্ট করার জন্য "আরব ও হিন্দ কে তা আল্লুকাত" লিখেছিলেন, যাতে ভারতবর্ষ ও আরবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ঐতিহাসিক নজীরগুলি মূল আরবী-ফার্শি থেকে সংগ্রহ করে হিন্দু মুসলমানকে সেই স্বর্ণযুগের কথা স্মরণ করিয়েছেন যখন এই দুই জাতি বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ ছিল। উপক্রমণিকায়, হিন্দু মুসলমান বিরোধের জন্য ইতিহাসের বিকৃতিকে দায়ী করে জাতীয় সংহতির কাজে ঐতিহাসিকের গুরু-দায়িত্বের উল্লেখ করেছেন। (৯) এখানে লক্ষণীয় যে, সুলেমান নাদভী যে

জাতীয়তার কথা বলেছেন তা কংগ্রেসের ধারণাসম্মত territorial জাতীয়তা নয়। এ জাতীয়তাবাদ হালীর ধারণাসম্মত, সেজন্য মুসলমান ও আরবের ইতিহাসকে অভিন্ন মনে করে ভারতবর্ষের সঙ্গে মুসলমানের ঐতিহাসিক ঘনিষ্ঠতা দেখান হয়েছে। অবশ্য ইংরাজ-বিরোধী মনোভাবকে দৃঢ় করতে এ ধরণের প্যান-ইসলামী জাতীয়তাবাদ অবান্তর হয়নি। এই মনোভাবের সংক্রমণ আবদুল্লাহ ইয়সুফ আলী, আই. সি. এস. এর লেখা 'অংরেজি আহ্‌দ্ মেঁ হিন্দুস্থানী তাহজীবে'ও দেখা যায়, যাতে সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে ভারতীয়দের উপর ইংরাজের অমানুষিক অত্যাচারের বিস্তারিত বর্ণনার সঙ্গে তাদের বিদ্বেষপ্রসূত বিবরণগুলির তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। উর্দুতে ইয়সুফ আলীর আরও দুইটি ঐতিহাসিক রচনা আছে। কিন্তু গবেষণারীতির দিক দিয়ে এগুলি উর্দুর ব্যতিক্রম, কারণ বিভিন্ন ভাষা ও সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ ও তুলনামূলক বিচারভঙ্গির জন্য এগুলি ইংরাজিতে লিখিত ইতিহাসেরই অন্তর্গত এবং ইংরাজি শিক্ষিত পাঠকের রুচিগ্রাহ্য করেই এগুলি লেখা।

কংগ্রেসের ধারণাসম্মত জাতীয়তাবাদের প্রতিফলন হিন্দু লিখিত উর্দু ইতিহাসেও তেমন নাই। ১৯০৫ সালে লালা লাজপত রায় দুই খণ্ডে একটি ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখেছিলেন। তাতে ভারতীয় সভ্যতায় মুসলমান অবদানের স্বীকৃতি আছে বটে, কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের এক জাতিত্ব প্রমাণের তেমন চেষ্টা নাই। সে চেষ্টা পণ্ডিত সুন্দরলালের 'হিন্দুস্থান মেঁ অংরেজী হুকমাত্' নামিত ১৯৩২ সালের দিকে লেখা বইটিতে অতি আন্তরিকতার সাথে করা হয়েছে। তবে এটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লেখা ইতিহাস হিসাবে তেমন সফল নয়; এতে ইংরাজ শাসনের কংগ্রেসী ব্যাখ্যার যাথার্থ্য প্রমাণের চেষ্টাই যেন বেশী। ভারতের জাতীয়তা ও সাংস্কৃতিক ঐক্যকে আদর্শ করে ইতিহাস রচনার আরও সফল দৃষ্টান্ত

পাওয়া যায় গত মহাযুদ্ধের সময়ে প্রকাশিত দিল্লীর জামেয়া মিল্লিয়া কলেজের অধ্যাপক আবিদ হোসেনের 'হিন্দুস্থান কি কওমী তাহজীব, নামক পুস্তকটিতে। ভারতের সংস্কৃতি গঠনে ইসলামের ভূমিকা বিচ্ছেদকারী বা স্বাতন্ত্র্যপন্থীর (disruptive or extraneous) নয়, বরং অনুপূরকের (complementray), এ কথার উপর জোর দিয়ে লেখা এই বইটি বোধ হয় আধুনিক উর্দু ইতিহাস-সাহিত্যের সবচেয়ে সার্থক রচনা। মুসলমান ইতিহাসে বিতর্কের চিরন্তন কেন্দ্র সম্রাট আওরঙ্গজেবকে এই গ্রন্থে নিন্দা বা অতি প্রশংসা কোনটাই করা হয়নি। বরং তাঁকে অশোকের ন্যায় আদর্শবাদীরূপে দেখান হয়েছে, যিনি সস্তা অপ্রিয়তা উপেক্ষা করে তাঁর নিজের বিশ্বাসমতে ইসলামের নীতিকে শুধু বাহ্যিক অনুষ্ঠানে নয়, কায়মনোবাক্যে সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অন্যান্য আদর্শবাদীর মত যাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা যুগের ক্রমবর্দ্ধমান ধর্ম নিরপেক্ষ বস্তুতান্ত্রিকতার কাছে ব্যর্থ হয়ে গেল। (১০)

উর্দুর স্বাতন্ত্রবাদী ইতিহাসবোধ পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করেছে যেমন, তেমন তার থেকে শক্তি সঞ্চয়ও করেছে। আলীগড় আন্দোলনের চিন্তাধারায় যে সব উপাদানগুলি নেপথ্যে ছিল এবং শিব্‌লী প্রমুখ ঐতিহাসিকের রচনায় যেগুলি ক্রমশঃ রূপায়িত হচ্ছিল, স্বাতন্ত্র্যবাদী ঐতিহাসিকতা তারই উপর প্রতিষ্ঠিত। 'ভারতীয় জীবনধারার সাথে মুসলমানদের মৌলিক ও দুরতিক্রম্য পার্থক্য দেখিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আত্মীয়তা প্রতিপন্ন করা এ ঐতিহাসিকতার প্রধান উপজীব্য। হিন্দু সভ্যতা বা প্রাক্ মুসলিম ভারত সম্বন্ধে এর কৌতূহল বা শ্রদ্ধা নাই। এ ঐতিহাসিক চিন্তায় অনেক ক্ষেত্রে revivalismএর সুর পাওয়া যায় এবং ইতিহাসের বিচারে (Judgement) ধার্মিকতাকে মানদণ্ড করার প্রবৃত্তি এর আর এক লক্ষণ। এ মনোবৃত্তি অনুযায়ী আওরঙ্গজেবই ভারতের শ্রেষ্ঠ মুসলমান সম্রাট এবং আকবর ও দারা শুকোহ

স্বজাতিদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক। স্বাতন্ত্র্যবাদী ঐতিহাসিকরা অবশ্য পাশ্চাত্য গবেষণারীতিতে শ্রদ্ধাশীল এবং ইয়োরোপীয় চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক মূল্যমান ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে এঁরা দ্বিধাবোধ করেন না। ১৯৫২ সালে করাচী থেকে প্রকাশিত হাশিম ফরিদাবাদীর 'তারিখ্-এ-পাক্ ও হিন্দ্' নামক রচনাটি এই স্বাতন্ত্র্যবাদী ঐতিহাসিকতার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

উর্দুর ইতিহাস-সাহিত্যে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন নাই বল্‌লেই চলে। গত মহাযুদ্ধের সময়ে লেখা গোলাম বারীর 'কোম্পানী কী হুকুমাত্ হিন্দুস্থান মেঁ' এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় হলেও আসলে এটি Lester Hutchinson এর Nababs of Indiaরই সার সঙ্কলন; নিজস্ব মননরীতির পরিচায়ক নয়।

টীকা

(১) হবিবুর রহমান শেরওয়ানি: 'ওয়াকার-এ-হায়াত'; আলীগড়, ১৯২৫, পৃঃ ৩৮২।

(২) হুসেন আলী ও কুদরত আলী সম্পাদিত 'মআসির-এ-তালিবী'; কলকাতা, ১৮১২। English tran. Charles Stewart; London 1810. এ বইটির সে সময় ফরাসী ও জার্মাণ ভাষাতেও তরজমা হয়েছিল। লেখকের বৈশাখ, ১৩৪৭ সালের 'মাসিক মোহাম্মদী'তে প্রকাশিত "ইয়োরোপে প্রথম ভারতীয়" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(৩) Butt, Abdullah: Spirit and Substance of Urdu Prose under the Influence of Sir Syed Ahmad Khan; Lahore, p.

148. Syed Ahmad Khan: The Truth About the Khilafat (English tran.) Lahore. (Revised ed.) p. 5.

(৪) 'আল-মামুন' ১ম ভাগ, পৃঃ ১৪।

(৫) জ্কাকাউল্লা : 'তারিখ-এ-হিন্দুস্থান,' খণ্ড ১০, পৃঃ ১৪—১৯ দ্রষ্টব্য।

(৬) শিবলী নোমানি : 'মাকালাত' : আজমগড়, ভাগ ৬, 'মোগল শাসনের সাংস্কৃতিক ফল' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(৭) 'মাকালাত' : ভাগ ৮ "মুসলমানোঁকা পোলিটীকাল কার্-ওয়াট্." শীর্ষক প্রবন্ধগুলি দ্রষ্টব্য।

(৮) শিবলী নোমানি : 'আওরঙ্গজেব আলমগীর পর এক নজর,' পৃঃ ৭—৮।

(৯) সুলেমান নাদ্‌ভী : 'আরব ও হিন্দকে তাআল্লুকাত'; এলাহাবাদ, ১৯৩১, ভূমিকা, পৃঃ ১।

(১০) আবিদ হোসেন :'হিন্দুস্থান কী কওমী তাহ্‌জীব,; দিল্লী, ১৯৪৬, পৃঃ ২৫৯।

আমাদের ভাষা সমস্যা

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

আমরা বঙ্গদেশবাসী। আমাদের কথাবার্তার, ভয়-ভালবাসার, চিন্তাকল্পনার ভাষা বাংলা। তাই আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। দুঃখের বিষয়, জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় এই সোজা কথাটিকেও আমাদের মধ্যে এক সম্প্রদায়কে বুঝাইয়া দিলেও তাঁহারা জোর করিয়া বুঝিতে চাহেন না। তাই মধ্যে মধ্যে আমাদের মাতৃভাষা কি কিংবা কি হইবে, তাহার আলোচনা সাময়িক পত্রিকাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। হা আমাদের সূক্ষ্ম বুদ্ধি!

মাতৃভাষা ব্যতীত আর কোন্ ভাষা কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া পরাণ আকুল করে? মাতৃভাষা ব্যতীত আর কোন্ ভাষার ধ্বনির জন্য প্রবাসীর কান পিয়াসী থাকে? মাতৃভাষা ব্যতিত আর কোন্ ভাষার কল্পনা-সুন্দরী তাহার মন-মজান ভাবের ছবি আঁকে? কাহার হৃদয় এত পাষাণ যে মাতৃভাষার অনুরাগ তাহাতে জাগে না? পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখ মাতৃভাষার উন্নতি ব্যতীত কোনও জাতি কখনও কি বড় হইতে পারিয়াছে? আরব পারস্যকে জয় করিয়াছিল। পারস্য আরবের ধর্মের নিকট মাথা নীচু করিয়াছিল, কিন্তু আরবের ভাষা লয় নাই, শুধু লইয়ছিল তাহার ধর্মভাব আর কতকগুলি শব্দ। তাই আনোয়ারী, ফারদৌসী, সাদী, হাফিজ, নিযামী, জামী, সানাই, রুমী প্রমুখ কবি ও সাধক-বুলবুল ফুলের কলতানে আজ ইরাণের কুঞ্জকানন মুখরিত। যেদিন ওয়াইক্লিফ লাটিন ছাড়িয়া ইংরেজী ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করিলেন, সেই দিন ইংরেজের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইল। যতদিন পর্যন্ত জার্মাণীতে জার্মাণ ভাষা অসভ্য ভাষা বলিয়া পরিগণিত ছিল, ততদিন পর্যন্ত জার্মাণির জাতীয় জীবনের বিকাশ হয় নাই।

বেশী দূর যাইতে হইবে না। আমাদেরই প্রতিবেশী আমাদের হিন্দুস্তানী মুসলমান ভাইগণ সংখ্যায় এত অল্প হইয়াও এত উন্নত

কেন? আর আমরা সংখ্যায় এত বেশী হইয়াও এত অবনত কেন? ইহার একমাত্র কারণ, তাহারা মাতৃভাষার প্রতি অনুরক্ত আর আমরা মাতৃভাষার প্রতি বিরক্ত। হিন্দুস্তানী আলিমগণ উর্দু ভাষায় কুরআন শরীফের অনুবাদ এবং তফসীর, ফিক্‌হা, হদীস, তসউউফ, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, কাব্য, উপন্যাস প্রভৃতি বিষয়ে বহু মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়া কিংবা এতদ্বিষয়ক আরবী, ফারসী ও ইংরাজি প্রভৃতি ভাষার গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিয়া উর্দু ভাষার সর্বাঙ্গ সুন্দর ইসলামী সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু দুই-চার জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত আমাদের মৌলভী মৌলানাগণ বঙ্গ-ভাষায় গ্রন্থ রচনা করা দূরে থাকুক, বঙ্গভাষা কাফেরী-ভাষা, তাহাতে ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ করিলে ধর্মগ্রন্থের অমর্যাদা করা হয় ইত্যাদি রূপ প্রলাপ উক্তি করিতে ছাড়েন না। বিশুদ্ধরূপে বাংলা বলা বা লেখা তাঁহারা নিন্দাজনক মনে করেন। ফলে তাঁহাদের ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা শুনিয়া সামান্য বাংলা জানা শ্রোতারা পর্যন্ত হাসিবে কি কাঁদিবে তাহা ঠিক করিতে পারে না। তাঁহাদের বাংলা ভাষায় যেমন দখল, উর্দুতেও তেমন। স্কুলের ন্যায় যে পর্যন্ত বাংলার মাদ্রাসাতেও বাংলা ভাষা অবশ্য-পাঠ্য দেশীয় ভাষা রূপে স্থান না পাইবে, সে পর্যন্ত আমাদের এ দুরবস্থা ঘুচিবে না। যে পর্যন্ত আরবী-পারসী-জানা মুসলমান লেখক বাংলা ভাষার সেবায় কলম না ধরিবেন, সে পর্যন্ত কিছুতেই বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য গঠিত হইবে না। সে দিন অতি নিকট যে দিন বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ভাষার স্থান অধিকার করিবে। বিদেশীয় ভাষার সাহায্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার মতন সৃষ্টিছাড়া প্রথা কখনও টিকিতে পারে না।

মুসলমান ছাত্রের পক্ষে কোন classical language লওয়া উচিত, ইহার উত্তরে প্রত্যেক মুসলমান একবাক্যে বলিতে বাধ্য হইবেন—আরবী। আল্লাহর শেষ প্রত্যাদেশ আরবীতে। আল্লাহর শেষ

নবী আরবী। আমরা সেই নবীর উম্মত (মণ্ডলী), সেই শেষ প্রত্যাদেশের উত্তরাধিকারী। অনুবাদে মূলের ছায়া পাওয়া যায় মাত্র। মূল্যের প্রাণ অনুবাদে থাকিতে পারে না। যদি ইসলাম ধর্মকে তাহার প্রাথমিক যুগের অনাবিল অবস্থায় বজায় রাখা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়, যদি শত দেশভেদ এবং সহস্র ভাষাভেদ সত্ত্বেও ইসলামের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখা কর্তব্য বলিয়া মনে হয়, তবে মুসলমানকে তাহার কুরআন, হাদীস মূল ভাষায় পড়িতে হইবে, পড়িয়া বুঝিতে হইবে, বুঝিয়া মজিতে হইবে। যদি মরুকে নগর করিবার, পশুকে মানুষ করিবার, অন্ধকে চক্ষুষ্মান করিবার, কাঙ্গালকে আমীর করিবার, ভীরুকে বীর করিবার অমোঘ মন্ত্র শিখিতে চাও, তবে আরবী কুরআন শিখ। যেমন প্রত্যেক খ্রীষ্টান বালক তাহার বাইবেল জানে, যে পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলমান বালক তেমনি তাহার কুরআন শরীফকে না জানিবে সে পর্যন্ত মুসলমান সমাজ জাগিবে না। সমস্ত জগতের বদলে যে মুসলমান তাহার কুরআন ছাড়িতে প্রস্তুত ছিল না, আজ দেখ, সেই মুসলমান সন্তান সংস্কৃত, পারসী, উর্দু কিংবা পালি ভাষার বিনিময়ে কিরূপে তাহার কুরআনকে বর্জন করিতেছে। হা ধিক আমাদের মৌখিক ধর্মানুরাগকে! হা ধিক আমাদের দুনিয়া-পূজাকে! আমি বলি না, মুসলমান কূপমণ্ডূক হইয়া কেবল আরবী সাহিত্যই আলোচনা করিবে। জগতে জ্ঞান-ভাণ্ডার মুসলমানেরই জন্য। ধর্মগুরু এইরূপ বলিয়াছেন যে, "বিজ্ঞান মুসলমানের হারান ধন যেখানে পাও তাহাকে গ্রহণ কর।" পুনশ্চ, "জ্ঞান অনুসন্ধান কর, যদিও তাহা চীন দেশে হয়।" আমি শুধু এইটুকু বলিতে চাই, আগে ঘরের খবর জান, পরে পরের খবর জানিও।

স্কুলের ন্যায় মাদ্রাসাতেও মাতৃভাষা, প্রধান ভাষা ও দ্বিতীয় ভাষা এই তিন ভাষার চর্চা হইবে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, দ্বিতীয় ভাষা কি হওয়া উচিত? আমি বলি ইংরেজী ভাষার সাহায্যে আমাদের

মৌলভী সাহেবগণ আধুনিক দর্শন, বিজ্ঞানের তত্ত্ব পাইবেন। যদি আমাদের আলিমকুল কুফ্রী ফৎওয়ারূপ প্রচণ্ড দণ্ড আমাদের ইংরেজী শিক্ষিত সমাজকে ভীত চকিত ও দলিত-মথিত করিয়া ইসলামের অপ্রতিহত ক্ষমতার পরিচয় দিতে না গিয়া, বাস্তবিক তাহাদের হৃদয়রাজ্যে ভক্তির আসন লাভ করিতে চান, যদি তাঁহারা ক্রমবর্ধনশীল শিক্ষিত সমাজকে ইসলামের গণ্ডী হইতে খারিজ করিয়া না দিয়া তাহাদের প্রকৃত ধর্মোপদেশক হইতে চান, তবে তাঁহাদিগকে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপক্ক হইতেই হইবে। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে বলিলে যাঁহাদের মতে অতি ভাল মুসলমানও কাফের হইয়া যায়; পৃথিবী মাছের পিঠে আছে' পৃথিবীর চারিদিকে কাফ-পাহাড় দিয়া ঘেরা ইত্যাদিরূপ বালকোচিত মত যাঁরা আজও গম্ভীরভাবে প্রচার করেন তাঁহাদিগকে তাঁহাদের সমস্ত ধার্মিকতা সত্ত্বেও শিক্ষিত সমাজ ভক্তি করিতে অক্ষম।

স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা সর্বত্রই উর্দু বা পারসী বৈকল্পিক বিষয় (optional subject) থাকিলে মুসলমান ছাত্রগণের ভাষা সমস্যার সমাধান হয়। যাহাতে উর্দু বা পারসী বৈকল্পিক বিষয় হইতে পারে, তজ্জন্য আমাদিগকে শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণকে সম্মত করাইতে হইবে।

অনেকদিন পূর্বে উর্দু বনাম বাংলা মোকদ্দমা বাংলার মুসলমান সমাজের ভিতরে উঠিয়াছিল, তাহাতে বাংলার ডিক্রী হইয়া মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া যায়। বর্তমানে আবার সেই মোকদ্দমার ছানি বিচারের জন্য উর্দু-পক্ষকে বিস্তর সওয়াল জওয়াব করিতে শুনিতেছি। কিন্তু ন্যায়বান বিচারক দেখিবেন যে উর্দু বাংলার দখল উত্যক্তে কিছুতেই খাস দখল পাইতে পারে না; দখল বাংলারই থাকিবে, তবে উর্দু বাংলার অধীনে উপযুক্ত করে ইচ্ছাধীন প্রজাই স্বত্বে কিছু ভূমি বন্দোবস্ত পাইতে পারে মাত্র।

বাংলা ভাষা চাই-ই। মুহম্মদ-ই-বখতিয়ারের বাংলা জয়ের

পরে যখন হইতে মুসলমান বুঝিল, এই চিরহরিতা ফলশস্য-পূরিতা নদ-নদী-ভূষিতা বঙ্গ-ভূমি শুধু জয় করিয়া ফেলিয়া যাইবার জিনিস নহে ; এ দেশ কর্মের জন্য, এ দেশ ভোগের জন্য, এ দেশ জীবনের জন্য, এ দেশ মরণের জন্য, তখন হইতে মুসলমান জানিয়াছে বাংলা চাই-ই। তাই বাংলার পাঠান বাদশাহগণ বাংলা ভাষাকে আদর করিতে লাগিলেন। যে ভাষা দেশের উচ্চশ্রেণীর অবজ্ঞাত ছিল, তাহা বাদশাহের দরবারে ঠাঁই পাইল। নসরৎ শাহ, পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁর নাম বাঙ্গালী ভুলিতে পারিবে না। বাদশাহের দেখাদেখি আমীর ওমরাহ বাংলার খাতির করিলেন। আমীর ওমরাহর দেখাদেখি সাধারণে বাংলার আদর করিল। গোঁড়া ব্রাহ্মণের অভিসম্পাত ও চোখরাঙ্গানিকে ভয় না করিয়া বাঙ্গালী নবীন উৎসাহে তাহার প্রিয় ধর্ম পুস্তকগুলি বাংলায় অনুবাদ করিল। কত দেশপ্রচলিত ধর্মকথা বাংলায় প্রকাশ করিল ; কত মর্মগাথা বাংলায় প্রচার করিল। মুসলমানও চুপ করিয়া থাকে নাই। হিন্দুর রামায়ণ আছে ; মুসলমানের "জঙ্গনামা" আছে। হিন্দুর মহাভারত আছে, মুসল-মানের "কাসাসোল আম্বিয়া" আছে। হিন্দুর মহাজন পদাবলী আছে, মুসলমানের মারফতী গান আছে। হিন্দুর বিদ্যাসুন্দর আছে, মুসলমানের "পদ্মাবতী" আছে।

এই পুঁথি সাহিত্যকে ঘৃণা করিলে চলিবে না। ইহাই বাঙ্গালী মুসলমানের খাঁটি সাহিত্য। সেই সময়ের কথিত ভাষার পুঁথিগুলি রচিত হইয়াছিল। তখন পারসী রাজভাষা। মুসলমানেরা বাংলা-দেশে নূতন ভাব ও নূতন জিনিস আনিয়াছিলেন এই নূতন ভাবও নূতন জিনিসের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পারসী নাম বাংলা ভাষায় ঢুকিয়া পড়িল। রাজভাষার প্রভাব কথিত ভাষার উপর হওয়া স্বাভাবিক। এখন যেমন বাঙ্গালী চলতি ভাষায় ইংরেজীর বকুনি ঝাড়েন, তখন ঝাড়িতেন পারসীর বুকনি। মুসলমান সেই পারসীর 'আমেজ' দেওআ কথিত ভাষাতেই পুঁথি লিখিতেন। হিন্দু কিন্তু

লিখিবার সময় যথাসাধ্য পারসী বর্জন করিয়া শুদ্ধ বাংলা ব্যবহার করিতেন। এখনও বাংলা ভাষায় প্রায় দুই হাজার পারসী বা পারসীগত আরবী শব্দ পারসী প্রভাবের পরিচয় দিতেছে।

গুটিকতক শিক্ষিত লোককে ছাড়িয়া দিলে এখনও এই পুঁথি-সাহিত্যই বাংলার বিশাল মুসলমান-সমাজের আনন্দ ও শিক্ষা সম্পাদন করিতেছে। পুঁথিপাঠক যখন সুর করিয়া পুঁথি পড়িতে থাকে, তখন শ্রোতৃবর্গ কখনও কারবালার শহীদগণের দুঃখে গলিয়া যায়, কখনও আমীর হামযার বা রোস্তমের বীরত্বে মাতিয়া উঠে, কখন বা হাতেমের দয়ায় ভিজিয়া যায়। বেচারাদের আহারনিদ্রার কথা, ঘর সংসারের কথা, চিরদৈন্যের কথা আর মনে থাকে না। দীনেশ বাবুর "বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যের" ন্যায় কে আমাদের এই পুঁথিসাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিবে?

যদি পলাশী ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানের ভাগ্যবিপর্যয় না ঘটিত তবে হয় ত এই পুঁথির ভাষাই বাংলার হিন্দু-মুসলমানের পুস্তকের ভাষা হইত। যাউক সে কথা। অতীতকে যখন আমরা বদলাইতে পারিব না, তখন সে কথা লইয়া বেশী আলোচনায় লাভ কি? এখন বর্তমানে আমরা বুঝিয়াছি পুঁথির ভাষা আর চলিবে না। তাহার সময় গিয়াছে। অতীত যুগের জীব-কঙ্কালের ন্যায় তাহাকে কেবল দেখিবার জন্য রাখিয়া দাও। এখন আমাদের শিক্ষিত সমাজের রুচি সাধু ভাষার দিকে। এখন এই ভাষাই চলিবে। ইহাতেই লেখাপড়া করিতে হইবে। ইহাতেই আমাদের ভাবী বাঙলার মুসলমান সাহিত্য রচনা করিতে হইবে।

আর এক কথা। মুসলমানের ধর্ম দেশগত বা জাতিগত ধর্ম নহে। তাহা সার্বজনীন ধর্ম। মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য তাহার ধর্ম তাহার প্রতিবেশীকে বুঝাইয়া দেওয়া। সাহিত্যের ভিতর দিয়া আমাদিগকে ইসলামের মহত্ব, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব, ইসলামের সৌন্দর্য প্রচার করিতে হইবে। একথা অস্বীকার করিবার জো নাই

যে, বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান ধর্ম অপেক্ষা খ্রীষ্টান ধর্মের অধিক পক্ষপাতী। সে কি খ্রীষ্টান ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে নহে? প্রচারের উদ্দেশ্যে আমাদিগকে আমাদিগের প্রতিবেশীর ভাষা গ্রহণ করিতে হইবে। যে ভাষা তাঁহাদিগের মর্ম স্পর্শ করে, সেই ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে। হিন্দুর ভাষায় ইসলামী ভাব ফুটাইতে হইবে। কবি কি সুন্দর বলিয়াছেন—

—"সুখন কয বহরে দী গোঈ চে ইবরাণী চে সুরিয়ানী।
মকা কয বহরে হক জোঈ চে জাবলকা চে জাবলসা॥"
ধর্মের তরে আছে সব বাণী কিবা সে হিব্রু কিবা সুরিয়ানী।
সত্যের তরে খোঁজ সব ঠাঁই পূর্ব-পশ্চিম কোন ভেদ নাই॥

মুসলমানী বাংলার কটমট বুলি বাংলার হিন্দুর কানে স্থান পাইবে না, অন্তরে ত নয়ই। খোদা, পয়গাম্বর, বেহেশত, দোযক, ফেরেশতা, নামায, রোযা প্রভৃতি পারসী শব্দ ব্যবহার করিতে যদি আপত্তি না থাকে, তবে ঈশ্বর, স্বর্গ, নরক, উপাসনা, উপবাস, প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারে আপত্তি কেন? পানি, চাচা, নানা, দাদা, ফুফু প্রভৃতি শব্দগুলি ত হিন্দী বা রাজপুতানী। ইহাদের জন্য এত মারামারি কেন?

মুসলমানী বাংলা দেশে প্রাদেশিক বুলির ন্যায় চলিত ভাষায় থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা সাহিত্যের ভাষা হইবে না। জলকে পথ নির্দেশ করিয়া দিতে হয় না। সে আপনার পথ আপনি চিনিয়া লয়। বাঙলার মুসলমানের মন আপনিই জানিতে পারিয়াছে কোন ভাষায় তাহাকে সাহিত্য রচিতে হইবে। এখন মৌলানা, মৌলভী, পণ্ডিত যিনিই বঙ্গ ভাষায় স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া কিছু লিখিতেছেন, তিনিই সাধু ভাষা ব্যবহার করিতেছেন। দুই একজন যদি কেহ মুসলমানি বাংলা চালাইতে চেষ্টা করেন বা তাহাতে বই লিখেন, তাহা শুধু কলমের জোরে। ইহাদেরই সমশ্রেণীর মহাত্মারা

বাঙালী মুসলমানেরা মাতৃভাষা কলমের জোরে উর্দু করিয়া দিতে চান!

এখানে এক নূতন সমস্যা উপস্থিত হইতেছে। বর্তমানে বাংলা লেখকগণের মধ্যে ভাষার রীতি (Style) লইয়া তিন দলের সৃষ্টি হইয়াছে। এক দল কলিকাতার বিভাষাকে সামান্য একটু মাজিয়া ঘষিয়া চালাইতে চান। এই দলের চাঁই "সবুজ পত্রের" সম্পাদক প্রমথ বাবু। আমি রবিবাবুকে এই দলের প্রধান বলিয়া মনে করি। ইঁহাদিগকে চরমপন্থী বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় দল সাবেক দল। ইহারা ভাষার কোনও পরিবর্তন সহ্য করিতে পারেন না। "সাহিত্য" পত্রিকা এই দলের মুখপত্র। ইহারা প্রাচীন পন্থী। তৃতীয় দল সকলের বোধগম্য সহজ সরল বাংলা প্রচলন করিতে চান। পরলোকগত অক্ষয় কুমার সরকার ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি এই মতাবলম্বী। ইহাদিগকে মধ্যপন্থী বলা যাইতে পারে। এই তিন দলের মধ্যে কোন্ দলে আমরা যাইব? এই প্রশ্নের একটি গা-জোরি উত্তর না দিয়া ধীরভাবে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক, কোন দলে আমাদের যাওয়া উচিত।

যেমন রাজনীতিক্ষেত্রে অভিজাততন্ত্র (Aristocracy) এবং গণতন্ত্র (Democracy) আছে, ভাষা ক্ষেত্রেও তদ্রূপ অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র আছে। ভারতীয় ভাষা হইতে আমি ইহার উদাহরণ দিতেছি। যে সময় ঋষিগণের মধ্যে বৈদিক ভাষা প্রচলিত ছিল, সেই সময় সাধারণ আর্যগণের মধ্যে বৈদিক হইতে কিছু বিভিন্ন লৌকিক ভাষা প্রচলিত ছিল। বৈদিক ছিল অভিজাততন্ত্রের ভাষা। লৌকিক ছিল গণতন্ত্রের ভাষা। ঋষিরা বলিলেন, "লৌকিক ভাষা অগ্রাহ্য, অকথ্য ন ম্লেচ্ছিতবৈ। নাপভাষিতবৈ। ম্লেচ্ছ ভাষা ব্যবহার করিও না। অপভাষা ব্যবহার করিও না। যদি কর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।" ঋষিরা বলিলেন, "খবরদার! ব্যঞ্জনের উচ্চারণে কিংবা স্বরের উচ্চারণে যদি এক চুল পরিমাণ এদিক ওদিক হয় তবে

আর তোমার রক্ষা নাই। দেখ না অসুরেরা 'হে অরয়ঃ হে অরয়ঃ' স্থানে 'হে লয়ঃ হে লয়ঃ' বলিয়াছিল, তাই তাহারা ধ্বংস হইয়া গেল। দেখনা বৃত্রের পিতা পুত্রেষ্টি যজ্ঞে ইন্দ্র শত্রু শব্দ বলিতে স্বরে অপরাধ করিয়াছিল। তাই বৃত্র ইন্দ্রের জেতা না হইয়া ইন্দ্রই বৃত্রের নিহন্তা হইল।" ঋষিদিগের শতসহস্র দোহাইতেও কিন্তু বৈদিক ভাষা পূজা অর্চনায় ছাড়া অন্যত্র লৌকিক ভাষার নিকট টিকিতে পারিল না। গণতন্ত্রের নিকট অভিজাততন্ত্রের পরাজয় হইল।

পরবর্তীকালে উচ্চ বর্ণেরা লৌকিক ভাষাকে মার্জিত করিয়া সংস্কৃত করিয়া লইল। সাধারণে লৌকিক ভাষা পালি ব্যবহার করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রকারেরা বলিলেন, "ন ম্লেচ্ছ-ভাষাং শিক্ষেথ—ম্লেচ্ছ ভাষা শিখিও না।" তখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দুর্দশা বৌদ্ধ ধর্ম তাহার নবীন তেজে দণ্ডায়মান। কেহ ব্রাহ্মণের কথা শুনিল না। বৌদ্ধ গণতন্ত্রের পক্ষ হইল। পালি ভাষা এক বিপুল সাহিত্যের ভাষা হইল। গণতন্ত্রের নিকট অভিজাততন্ত্রের পরাজয় হইল।

আর এক যুগ আসিল। এখন রাজশক্তি বৌদ্ধ। বৌদ্ধ এখন অভিজাততন্ত্রের দিকে। বৌদ্ধ এখন ধর্মের দোহাই দিয়া পালিকে ধরিয়া রাখিতে চাহিল; তখন কিন্তু গণতন্ত্রের পক্ষ হইল জৈনধর্ম। তখন লৌকিক ভাষা প্রাকৃত। পালি প্রাকৃতের নিকট তিষ্ঠিতে পারিল না। গণতন্ত্রের নিকট অভিজাততন্ত্রের পরাজয় হইল।

আর এক যুগ আসিল। এ-যুগ অন্ধকারময়। এ যুগে উচ্চ শ্রেণীর প্রাকৃত নিম্ন শ্রেণীর অপভ্রংশের নিকট পরাজিত হইল। এই অপভ্রংশ হইল বাংলা, উড়িয়া, আসামী, হিন্দী, গুজরাতী, মারহাঠি প্রভৃতি দেশীয় ভাষাসমূহের মূল।

তারপর আধুনিক যুগ। এ যুগে পণ্ডিতেরা সাধারণের ভাষাকে মাজিয়া ঘষিয়া সাধু ভাষা করিয়া লইলেন, বিশাল জনসাধারণের ভাষাকে ইতর ভাষা বলিয়া ফেলিয়া রাখিলেন। বর্তমানে এই

ইতর ভাষা পণ্ডিতের ভাষার উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে। পণ্ডিত তাঁহার অন্ধ-সংস্কৃতভক্তির জন্য বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের দুর্বল শিকলে বাঁধিতে চাহিতেছেন। আর ইতর ভাষা সেই শিকলকে কাটিতে চাহিতেছে। তাহার চেষ্টা ফলবতী হইবে কি? যদি ভারতের ভাষা—ইতিহাসের শিক্ষা মিথ্যা না হয়, তবে নিশ্চয় একদিন এই ইতর ভাষা সাধু ভাষাকে, যেমন লৌকিক বৈদিককে, পালি সংস্কৃতকে, প্রাকৃত পালিকে, অপভ্রংশ প্রাকৃতক ঠেলিয়া দিয়াছিল, সেইরূপে ঠেলিয়া ফেলিবে। সাধু ভাষা মৃত ভাষা রূপে পুস্তকে ঠাঁই পাইবে। যেমন, মিলটন, জনসন, প্রভৃতির লাটিন বহুল ভাষা এখন কেবল কেতাবী ভাষা হইয়া রহিয়াছে, এখনকার সাধু ভাষার অবস্থাও সেইরূপ হইবে। পরিণামে চরম পন্থারই জয় হইবে। তবে মধ্যম পন্থা বর্তমান পরিবর্তনশীল যুগ (Transitional period)-এর উপযুক্ত ভাষা বটে। একেবারে নি হইতে সা-তে সুর নামাইতে গেলে অনেকের কানে বেখাপ্পা লাগিবে নিশ্চয়ই।

ভাষা-বিজ্ঞান শিক্ষা দান করে যে, বহু প্রাদেশিক বিভাষার মধ্যে যে বিভাষায় বহু সদগ্রন্থ রচিত হয় বা যাহা রাজশক্তির আশ্রয় পায়, তাহা সাহিত্যের ভাষা হইয়া উঠে। জীব-জগতের ন্যায় বিভাষাগুলির মধ্যেও যোগ্যতমের পরিত্রাণ নীতি চলিয়া আসিতেছে। সাহিত্যিক শক্তিতে নবদ্বীপের বুলি সমস্ত বাংলার সাহিত্যের ভাষা হইয়া উঠিয়াছিল। এখন পুনরায় সাহিত্যিক শক্তিতে ও রাজশক্তির আশ্রয়ে কলিকাতার বুলি বাংলা সাহিত্যের ভাষা হইয়া উঠিতেছে। এখন বাংলার বিভিন্ন জেলার ভদ্রলোক আপোসে কথাবার্তার জন্য কলিকাতার বুলিই ব্যবহার করেন। সাহিত্যিক ভাষা হইয়া উঠিবার ইহাই সূচনা। তার পর রবিবাবু প্রমুখ কলিকাতাবাসী সাহিত্যিকগণের প্রভাবে এই বিভাষা সাহিত্যের ভাষার স্থান অধিকার করিতে চলিয়াছে।

ভাষার রীতি সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়া এ সম্বন্ধে আমার

বক্তব্য শেষ করিতেছি। এক দল অন্ধ সংস্কৃতভক্ত বাংলা ভাষার মধ্যে প্রচলিত আরবী পারসী শব্দগুলিকে যাবনিক বলিয়া বর্জন করিতে চাহেন আমি বলি আগে তাহারা বাংলা দেশ হইতে যবনকে দূর করুন, পরে ভাষা হইতে যাবনিক শব্দগুলি দূর করিবেন। যখন সংস্কৃত ভাষা হোরা, কেন্দ্র, জামিত্র দীনার, প্রভৃতি গ্রীক শব্দ এবং ইক্কবাল, ইন্দুবার মুকাবিলা প্রভৃতি আরবী শব্দ গ্রহণ করিয়াছে, তখন বাংলা ভাষার বেলায় আপত্তি কেন? এই সকল আরবী-পারসী শব্দ বাংলা ভাষার অস্থিমজ্জাগত হইয়াছে। ভাষা হইতে ইহাদিগকে তাড়ান সহজ ব্যাপার হইবে না। দোয়াত, কলম, কাগজ, জামা, কামিজ, কমর, বগল প্রভৃতি আইন-আদালতে প্রচলিত সর্বসাধারণের সহজবোধ্য হাজার খানিক্ শব্দ ত্যাগ করিয়া নূতন শব্দ গড়িলে তাহা নামের জোরে পুস্তকে চলিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা ভাষায় চলিবে না। বাংলা ভাষায় আরবী-পারসী-তুর্কী, ইংরেজী, ফরাসী, পর্তুগীজ প্রভৃতি যে কোনও ভাষার শব্দ বেমালুম খাপ খাইয়া গিয়াছে, তাহারা নিজেদের দখলী স্ববলে বাংলা ভাষায় থাকিবে। তাহাদিগকে তাড়াইতে গেলে জুলুম করা হইবে।

প্রতিভাবানের প্রতীক্ষায়

আবুল কাসেম ফজলুল হক

চীন বিপ্লবের আগে চীনের সমাজ যখন আমাদের দেশের এখনকার সমাজের মতই এক ক্রান্তি-কালের মধ্য দিয়ে বিকশিত হচ্ছিল, তখন পিকিংএর এক সুধী সমাবেশ বক্তৃতা দানকালে ১৯২৪ সালে লুসুন বলেছিলেন, "···যে অভাবটি সম্পর্কে বর্ত্তমানে চীনের শিল্পী-সাহিত্যিকগণ সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠে রব উঠিয়েছেন, তা হল একজন প্রতিভাবানের অভাব। এ থেকে দুটো বিষয় প্রমাণিত হয়ঃ প্রথমত, এই মুহূর্ত্তে চীনে কোন প্রতিভান নেই; দ্বিতীয়ত আমাদের আধুনিক শিল্পকলা প্রত্যেককেই এখন রুগ্ন ও ক্লান্ত করে তুলেছে। সত্যই কি কোন প্রতিভাবান নেই? থাকতে পারেন কিন্তু আমরা তাঁর সাক্ষাত পাইনি, অন্য কেউও পায়নি। কাজেই যা আমরা চোখে দেখছি ও কানে শুনছি, তার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি, কোন প্রতিভাবান নেই। কেবলমাত্র প্রতিভাবানই যে নেই তাই নয়, প্রতিভাবানের জন্ম দিতে পারে তেমন জনসাধারণও নেই।"

পূর্ব বাঙলার এখানকার সৃজনশীল অঙ্গনের দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখতে পাব, ১৯২৪ সালের চীন সম্পর্কে লুসুন যে কথাগুলো বলেছিলেন, এই দশকের পূর্ব বাংলা সম্পর্কেও যেন সে কথা গুলো হুবহু প্রযোজ্য। রাজনীতি সাহিত্য, শিল্পকলা, বিজ্ঞান, দর্শন যে দিকেই তাকাই না কেন, সর্ব ক্ষেত্রেই পূর্ব বাংলা আজ শূন্য, সত্যিকার অর্থে কোথাও একজন প্রতিভাবানকেও আমরা দেখতে পাচ্ছিনা শুনতেও পাচ্ছিনা কারও কথা। চারদিকে আজ যা আমরা দেখছি ও শুনছি, তা হল হাহাকার আর হতাশা-সংশয় আর আত্ম-বিশ্বাসের অভাব। জনসাধারণ ভুগছে এই হতাশায়। যাঁরা জন-সাধারণের অভিভাবকের আসন দখল করে আছেন তাঁরাও হতাশায়

আচ্ছন্ন, এবং জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন ভাবে হয় তাঁরা কেবলমাত্র হতাশাই প্রচার করেছেন, না হয় এমন সব কাজ করেছেন যাতে জনসাধারণ আশা করার মত কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না।

সত্যই কি আমাদের সমাজে এমন কোন প্রতিভাবান নেই যিনি আশার আলো ছড়াতে পারেন? হয়তো আছেন, কিন্তু তাঁর পরিচয় এখনও আমরা পাইনি—যেমন চীনের জনগণ সেদিন লুস্থনের মত প্রতিভারও পরিচয় পায়নি, পরিচয় পায়নি মাও সেতুংএরও। অথচ এই দুই শ্রেষ্ঠ প্রতিভা সেই অন্ধকার যুগের চীনেই আলো ছড়াবার সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। আমাদের সমাজে কোন প্রতিভাবানের সাক্ষাত আজও আমরা পাইনি বলেই এক জন প্রতিভাবানের জন্য আমাদের এত উৎকণ্ঠা।

প্রতিভাবানের আবির্ভাব কি কোন আকস্মিক ব্যাপার? প্রতি-ভাবান কি প্রকৃতির খেয়ালী সৃষ্টি? এ সম্পর্কে লুস্থনের বক্তব্য, "প্রকৃতির কোন উদ্ভট খেয়ালে প্রতিভাবান আপনিতেই কোন অরণ্যে কিংবা নির্জন প্রান্তরে আবির্ভূত হননা। এক বিশেষ ধরনের জনসাধারণই প্রতিভাবানের জন্ম দান করে এবং তাকে লালন করে। তেমন জনসাধারণ ছাড়া প্রতিভাবানের উদ্ভব সম্ভব নয়। আল্‌পস্‌ পর্বত অতিক্রমনের সময় নেপোলিয়ন বলেছিলেন 'আমি আল্‌প্‌সের চেয়েও উঁচু।' কী বীরত্বপূর্ণ উক্তি! কিন্তু আমাদের ভুললে চলবে না, তাঁর পশ্চাতে ছিল এক বিপুল সৈন্য বাহিনী। এই বিপুল সৈন্য বাহিনী না থাকলে হয় তিনি শত্রুদের হাতে ধরা পড়তেন, না হয় শত্রুরা তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে যেত অন্য দিকে। আর তা হলে তার ঐ আচরণ বীরত্বব্যঞ্জক মনে না হয়ে, মনে হত নিছক পাগলামী বলে। এ জন্যই মনে করি, একজন প্রতিভাবানের আবির্ভাব আশা করার আগে আমাদের কর্তব্য এমন একটি জনসাধারণ গড়ে তোলা, যে জনসাধারণ প্রতিভাবানের জন্মদানে সক্ষম হবে। আমরা যদি সুদর্শন বৃক্ষ ও সুন্দর পুষ্পের

জন্ম দিতে চাই, তাহলে প্রথমে অবশ্যই তৈরী করতে হবে ভাল মাটি। প্রকৃত পক্ষে ফুল ও গাছের চেয়ে মাটিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মাটি ছাড়া কোন কিছুরই জন্ম হতে পারে না। নেপোলিয়নের পশ্চাতে বিপুল বাহিনী যেমন অপরিহার্য ছিল তেমনি ফুল ও গাছের জন্য ও যে প্রয়োজন অপরিহার্য তা হল মাটি।'

'প্রতিভাবানের প্রতিক্ষায়' শীর্ষক বক্তৃতায় লুসুন যখন এসব কথা বলছিলেন সম্ভবত তখনও তিনি চীনের শিল্পী সাহিত্যিকদের মহলে সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য প্রতিভা বলে স্বীকৃতি লাভ করেননি। অথচ আজকের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের তরঙ্গস্নাত চীনে বিপুল জনগণ তাঁকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাচ্ছে এই বলে যে তিনিই ছিলেন সাংস্কৃতিক বিপ্লবে তাদের অগ্রযাত্রী। বলাবাহুল্য জীবিত কালেই লুসুন জনগণের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন।

লুসুনের পূর্বোক্ত কথাগুলো থেকে আমরা আজ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। প্রতিভাশূন্য (?) এই পূর্ব বাংলায় আমরা যদি সত্য সত্যই আজ প্রতিভাবানের সাক্ষাত লাভ করতে চাই, তাহলে আমাদের প্রথম ও প্রধান বক্তব্য, পূর্ব বাংলার জনগনকে এমন ভাবে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করা যেন তারা প্রতিভাবানের জন্ম দিতে পারে। জনগণকে কেমন করে গড়ে তুলতে হয়, তার দৃষ্টান্তও আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমরা দেখতে পাই। সে দৃষ্টান্তকে সৃজনশীল উপায়ে কাজে লাগিয়ে পূর্ব বাংলার অন্তঃস্থিত সম্ভাবনাকে বিকশিত করে তোলাই আমাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব। কিন্তু পূর্ব বাংলার সৃজনশীল অঙ্গনে আজ আমরা যে সব প্রবণতা লক্ষ্য করছি, তাতে কি আমরা প্রতিভাবানের জন্ম দানের প্রকৃত প্রয়াস দেখতে পাই?

প্রথমত, সৃজনশীল রাজনৈতিক অঙ্গনের কথাই ধরা যাক, কারণ রাজনীতিই সমাজের সমস্ত কাজের মুল পরিচালিকা শক্তি।

যাঁরা আজ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, স্পষ্টত তারা সৃজনশীল অঙ্গনের

চতুঃসীমার বাইরে। তাদের ভূমিকা দেশে সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের একটুও অনুকুল নয়। যাদের উদ্দেশ্যে আমার এই আলোচনা, তাঁরা তাদের ভূমিকা সম্পর্কে অবগত; তাই তাদের সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

যারা ক্ষমতায় নেই, বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত। জনগণকে গড়ে তোলার কাজে পরিপূর্ণ গুরুত্বের সঙ্গে বলতে গেলে, কোন দলই আজও যায়নি। জনগণকে গড়ে তোলার জন্য যা অপরিহার্য তা হল জনগণের সঙ্গে থেকে জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে গিয়ে, জনগণের কাছ থেকে তাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে গভীর-ভাবে অবহিত হয়ে, তারপর জনগণকে সুশিক্ষিত ও সুসংগঠিত করে গড়ে তোলা। তা না করে প্রায় প্রত্যেকটি বিরোধী দলের প্রত্যেক নেতাই আজও আশা করেন, জনগণ তাঁদের দু একটি বক্তৃতা শুনেই মুগ্ধ হবে এবং তাদেরকে নেতৃত্বের মহিমান্বিত আসনে অধিষ্ঠিত করবে। বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত এবং জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন প্রায় সব নেতাই এখন ঐক্যফ্রণ্ট গঠনের কথা বলছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য, ঐক্যফ্রণ্ট গঠন করে তারা জনগণের কাছে যাবেন এবং স্বার্থ হাসিল করে আবার জনগণের কাছ থেকে দূরে সরে আসবেন। কিন্তু ঐক্যফ্রণ্ট গঠন করাও হচ্ছেনা, আর জনগণের কাছে যাওয়াও তাদের হচ্ছেনা—উদ্দেশ্য হাসিল করা তো দূরের কথা। তাদের উদ্দেশ্য যদি সত্যই মহৎ হয়, তাহলে দেশের এই দুর্দিনে তাদের এত দল উপদলে বিভক্ত থাকার কারণ কি? সকল দল ভেঙ্গে দিয়ে সকলে মিলে একদল গঠন করলেই তো পারেন? কিন্তু তা কি তাদের পক্ষে সম্ভব? তাদের কার্য্যকলাপ প্রমাণ করে, তা কখনও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তারা এখন গণতন্ত্রের খেলা খেলছেন, গণতন্ত্রের জন্যই তো অনেক দলের প্রয়োজন হয়। আর দল বেশী না থাকলে তো খেলা জমেনা ভাল। তাই দিন দিন তারা নিজ নিজ দলকে কেবল ভেঙ্গেই চলছেন।

পুরনো কলঙ্কের কালি গায়ে মেখে এবং রক্তে পুরনো পুঁজের ধারা বহন করে যখন তারা নিজেদের দলকে দ্বিধাবিভক্ত করেন, তখন সেগুলো নতুন দল হয় না। নতুন দল হতে পারে সম্পূর্ণই নতুন লোক নিয়ে কিংবা সম্পূর্ণই নতুন নেতৃত্বে। যারা আজ ঐক্যফ্রন্ট গঠনের জন্য পরস্পরের প্রতি কপট আহ্বান জানিয়ে চলছেন এবং দিন দিন কেবল বিভক্ত হয়ে চলছেন, হয়তো তারা এখন একটি ঐক্যফ্রন্ট গঠন করতে পারেন; কিন্তু তাদের ঐক্যফ্রন্ট নিতান্তই অকেজো হবে—আর সে ঐক্যফ্রন্টের টিকে থাকারও কোন সম্ভাবনা নেই। ঐক্যফ্রন্ট ১৯৫৪ সালে ও ৬৪ সালেও এ দেশে গঠিত হয়েছিল। কিন্তু সেগুলো ঘৃণাজনক ভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিল। বিভিন্ন দলের কিছু সংখ্যক নেতা একত্রিত হলেই কি ঐক্যফ্রন্ট গঠিত হয়? ঐকফ্রন্টের পূর্ব সর্ত হচ্ছে একটি সাধারণ লক্ষ্য, এবং সেই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য ঐক্যফ্রন্টের অর্ন্তভুক্ত সকলের আন্তরিক আগ্রহ। অতীতের ঐক্যফ্রন্টগুলোর ব্যর্থতার কারণ, সেগুলোর প্রকৃতপক্ষে কোন সাধারণ লক্ষ্য ছিলনা এবং ছিলনা কোন কর্মসূচী বাস্তবায়িত করার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা। কোনও কর্মসূচীতে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকলেও তার প্রতি সকলে বিশ্বস্ত ছিলেন না। তাই কর্মক্ষেত্রে নেমেই তারা সেই কর্মসূচীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন ও কপটতার আশ্রয় নিয়ে স্ব স্ব চক্রের স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করেছেন। জনগণের কল্যাণ সাধনের সাধারণ লক্ষ্য না নিয়ে ঐক্যফ্রন্টের নেতারা চেষ্টা করেছেন হীন ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের জন্য। ফলে নিজেদের মধ্যে স্বার্থ নিয়ে সংঘাত দেখা দিয়েছে এবং ঐক্যফ্রন্ট ব্যর্থ হয়েছে। কাজেই অতীতের অভিজ্ঞতাই প্রমাণ করে, কয়েকজন নেতা কিংবা কয়েকটি রাজনৈতিক দল একত্রিত হলেই ঐক্যফ্রন্ট গঠিত হয়না। আর যে যে নেতারা একবার বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়েছেন, দীর্ঘদিনের পরীক্ষায় তাদের সততা প্রমাণিত না হলে তাদেরকে কখনও কোন প্রগতিশীল

ঐক্যফ্রণ্টের নেতৃত্বে কোন অংশ দান করা উচিত নয়। অথচ যাঁরা এখন ঐক্যফ্রণ্ট গঠনের কথা বলছেন, তারা একথা একটুও ভাবছেন না। ক্রান্তিকালীন সমাজে ক্রান্তিকালের অবসান ঘটিয়ে নতুন সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রগতিশীল রাজনীতিবিদেরা যখন নিজেদের আদর্শ ভিত্তিক সংগঠনের একক নেতৃত্বে বিপুল শোষিত শ্রমজীবি জনগণকে সুশৃংখল, সুশিক্ষিত ও সুসংগঠিত করে গড়ে তুলতে পারেন এবং জনগণ একটি সুনিপুণ বাহিনীর মত কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করে, তখন একাধিক সংগ্রামী বিরোধী দলের অস্তিত্ব থাকলে সেগুলোর সংগে ঐক্যফ্রণ্ট গঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু আমাদের এখানে দেখতে পাই, জনগণের দ্বারস্থ হওয়ার দুরূহ পথ সযত্নে পরিহার করে মুখে প্রগতির লাল রং মেখে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত মুষ্টিমেয় স্বঘোষিত নেতা ঐক্যের বুলি আওড়াচ্ছেন।

বিভিন্ন বিরোধী দলে যে সব নেতাকে আমরা দেখছি এবং যাদের কথা আমরা শুনছি, তারা প্রতিভাবান? তারা জন্ম দেবেন প্রতিভার? তাদের মধ্যে ভাল লোক নিশ্চয়ই থাকতে পারেন। হয়তো আছেনও। আমার তা জানা নাও থাকতে পারে। এখানে কাউকে ভাল বলা বা মন্দ বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি শুধু তাদের কাজ সম্পর্কেই বলছি। তাদের কর্ত্তব্য, সুদীর্ঘ কালের তাড়নায় ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে দেশের জনগণকে সুশিক্ষিত ও সুসংগঠিত করে গড়ে তোলা; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদের কার্যকলাপ প্রমাণ করে তারা নিজেরাই আজও সুশিক্ষিত ও সুসংগঠিত হতে পারেননি—হতে পারেননি ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতারও অধিকারী। তারা অনেকেই পূর্ব বাংলার সমাজকে সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর করার কথা বলেন, কিন্তু সমাজতন্ত্রের আদর্শকে আত্মস্থ করে তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হতে পেরেছেন—এটা তাদের কার্য্যকলাপ দ্বারা কোথাও প্রমাণিত হয়না। তাদের কার্যকলাপ বরং এটাই প্রমাণ করে যে

তাদের মন সম্পূর্ণই বিশুষ্ক মরুভুমিতে পরিণত হয়েছে—কোন আদর্শকে আত্মস্থ করার কিংবা আদর্শের অনুসন্ধানে এগিয়ে চলার ক্ষমতা ঐ মনের নেই তারা নিঃস্বার্থভাবে জনগণের জন্য কাজ করার কথা বলেন, অথচ সামান্য হীন স্বার্থ নিয়েও তারা ভাগাড়ের প্রাণীর মত কড়াকড়ি করেন। এইতো তাদের জনসেবার নমুনা। কাড়াকাড়ি করে তাদের কেউ হয়তো নেতার আসন দখল করেন মাত্র, প্রকৃত নেতা হতে পারেন না। তাছাড়া দল ভেঙ্গে নতুন নতুন দল গঠন করে তারা নতুন নতুন নেতার আসন তৈরী করেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেগুলো কি নেতার আসন? কখনও নয়। কারণ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে যত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক আছেন এবং কেন্দ্রীয় সংসদের যত সদস্য আছেন, অন্তত তারাও যদি সকলেই এক হতে পারতেন তা হলে দেশে আজ নেতৃত্বের অভাব থাকত না। আজকের অবস্থা এমন যে সমগ্র রাজনৈতিক অঙ্গনে একজন লোককেও দেখা যাচ্ছেনা যার নেতৃত্বের উপর—সততা ও যোগ্যতার উপর জনগণ পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে পারে। বিরোধী দলগুলোর কাজের পদ্ধতি ও ক্ষমতাসীনদের কাজের পদ্ধতিতেও কোন পার্থক্য দেখা যায় না। শহর কেন্দ্রীকতা, সভা, বিবৃতি ইত্যাদি প্রথাসিদ্ধ উপায় ছাড়াও যে রাজনৈতিক সংগঠন ও আন্দোলনের ভিন্ন কোন প্রক্রিয়া হতে পারে, তা তাদের ধারনায় আছে বলে মনে হয় না। পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে একথা বলার এখন সময় হয়েছে যে এই ধরণের রাজনৈতিক পরিবেশ ও এই পদ্ধতির রাজনৈতিক কার্যকলাপ কোন প্রতিভার আবির্ভাব ঘটাতে পারবেনা। প্রতিভার আবির্ভাব ঘটাতে হলে সৃষ্টি করতে হবে ভিন্নতর পরিবেশ এবং অবলম্বন করতে হবে সম্পূর্ণই পৃথক কষ্টসঙ্কুল ও দুরূহ এক পদ্ধতি। প্রতিভাবান তরুণেরাই কেবলমাত্র সেই অভীষ্ট পরিবেশ ও পদ্ধতির সূচনা করতে পারে। আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা আশি ভাগেরও বেশী লোক

গ্রামে বাস করে। দেশে যে কোন প্রকার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন সাধন করতে হলে এই গ্রামীন জনগণের পরিপূর্ণ সক্রিয়তা ছাড়া তা সম্ভব হতে পারেনা। বর্তমান রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে পূর্ব বাংলার গ্রামীন জনগণকে সুশিক্ষিত সুসংগঠিত ও জাগ্রত করে তোলাই কেন্দ্রীয় দায়িত্ব। এই দায়িত্ব সম্পাদনের পথে যাদেরকে আজ অগ্রসর হতে দেখা যাচ্ছে, তাদের দ্বারাই পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে নতুন পদ্ধতির সূচনা হচ্ছে এবং তাদের মধ্য থেকেই ঐদিন যথার্থ প্রতিভাবানের আবির্ভাব ঘটবে বলে আমার বিশ্বাস।

শিল্প সাহিত্যের অংগনের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাওয়া যায় একই রকম কুৎসিত চিত্র। সেখানেও কারও জনগণের কাছে যাওয়ার জনগণের মধ্যে থেকে জীবন সংগ্রামের বহু বিচিত্র রূপকে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপলব্ধি করার এবং জনগণের জীবন থেকে শিল্প সাহিত্যের কাঁচা উপাদান সংগ্রহ করার কোন প্রয়াস নেই। ফেরিওয়ালা সুলভ ছল চাতুরীর মাধ্যমে আমাদের শিল্পী-সাহিত্যিকরা জনগণের শ্রদ্ধা অর্জন করতে চান। প্রকৃত পক্ষে জনগণ অনেক আগেই তাদের বর্জন করেছে। এখন তারা যত কৌশলের আশ্রয়ই গ্রহণ করুন না কেন, তাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে ঐক্যফ্রন্টের প্রশ্নটা আসে একটু অন্যভাবে। তারা বিভিন্ন দল গোত্রের চিন্তার সমন্বয় সাধনের কথা বলেন। প্রকৃতপক্ষে যেখানে সমস্ত চিন্তাই বিগত যুগের— সামন্তবাদী, পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী যুগের এবং যেখানে নব-যুগের উপযোগী নতুন চিন্তা ও নতুন মূল্যবোধ বিকাশ লাভ করেনি, সেখানে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা প্রকৃতপক্ষে একই অন্ধকার আবর্তে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ধরণের সমন্বয় সাধনের সংকীর্ণ ও অদূরদর্শী চেষ্টার ফলেই বছরের পর বছর ধরে এখানে একই প্রশ্নে বিতর্ক চলে—সমাজের সংস্কৃতিক মান বছরের পর

বছর ধরেই থেকে যায় একই স্তরে পূর্ব বাংলায় এখন চিন্তার সমন্বয় সাধনের সময় নয়। এখানকার সময়টাতে প্রয়োজন আপোষ-হীন ভাবে নতুন চিন্তা প্রকাশের—সাহসিকতার সঙ্গে নতুন বক্তব্য বলার এবং সেই চিন্তা ও বক্তব্যকে বিপুল জনগণের মধ্যে প্রচার করার। একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, চিন্তার সমন্বয় সাধনের যে প্রচেষ্টা আজ আমাদের সাহিত্যাঙ্গনে দেখা যাচ্ছে তাও প্রকৃতপক্ষে কোন আন্তরিক প্রচেষ্টা নয়। সে সমন্বয় প্রচেষ্টার লক্ষ্য আসলে চিন্তার সমন্বয় সাধন নয়, তার লক্ষ্য প্রকৃতপক্ষে স্বার্থের সমন্বয় সাধন, অর্থাৎ আদমজী, দাউদ ও সরকারের করুণা লাভের জন্য সকলের এক প্লাটফরর্মে দাঁড়িয়ে প্রতিযোগিতা করা। আদমজী, দাউদ আর বর্ত্তমান সরকারের ভূমিকা আমাদের জানতে বাকী নেই; সুতরাং যারা তাদের করুণা লাভের জন্য লালায়িত এবং যারা তাদের করুণা লাভের লোভে নিজের অন্তঃস্থিত শিল্পানুসন্ধিৎসা, সত্যানুসন্ধিৎসা ও সৌন্দর্যচেতনার মৃত্যু ঘটাতে পারেন এবং তাদের করুণা লাভ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, তাদের চরিত্র ও সহজেই অনুমান করা যায়। কায়েমী স্বার্থবাদী প্রতিক্রিয়াশীলেরা কখনও চায় না যে, প্রগতিশীল নতুন কোন চিন্তার বিকাশ ঘটুক কিংবা প্রগতিশীল নতুন কোন আদর্শের প্রচার হোক। এই জন্যই তারা বিভিন্ন প্রকার ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছে। তাদের উদ্দেশ্যে লেখক-লেখিকারা তাদের ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে শিল্প সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান ধারণা প্রচার করুন—যাতে তাদের কায়েমী স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে। প্রগতিশীল লেখকেরা যাতে স্বাধীনভাবে কিছু করতে না পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তারা এ সব করছে। লেখক লেখিকাদের মধ্যে যারা সততার সঙ্গে স্বাধীন ভাবে কিছু করতে চান, তাদের কাজ প্রতিমুহূর্ত্তে এই সব ষড়যন্ত্র দ্বারা বিঘ্নিত হয়। কোন আত্মসম্মান সম্পন্ন ব্যক্তিরই উচিত নয় নিজেকে এইসব ষড়যন্ত্রে

জড়িত করা। সকল প্রচার মাধ্যম ও প্রতিষ্ঠানই আজ কায়েমী স্বার্থবাদী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হস্তগত হয়ে আছে। প্রগতিশীল বক্তব্য, চিন্তা ও আদর্শকে প্রচার করার জন্য কোন মতেই সেগুলোকে পাওয়া যাবে না।

তাই আজ সৃষ্টি করতে হবে বিকল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রচার মাধ্যম। আমাদের দেশের বর্ত্তমান অভিজাত শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করে ইতিপূর্বে একটি প্রবন্ধে বলেছিলাম 'উনিশ শতকে এই ভূখণ্ডের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে যে শিক্ষিতেরা ছিল সমাজের উজ্জীবনী শক্তি—দেড় শতাধিক বৎসরের ব্যবধানে বিকাশের চূড়ান্ত সীমা অতিক্রম করার পর তারা আজ ক্ষয়িষ্ণু—মুমূর্ষু শক্তিতে পরিণত হয়েছে এবং বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থানে তাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে—এখন ইতিহাসের মঞ্চ থেকে তাদের বিদায় নেবার পালা। তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পৃষ্ঠপোষকদেরও বিদায়ের ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সিফিলিসাক্রান্ত বারবনিতাদের মতই পদলেহী সুবিধালোভী আত্মবিকৃতি বন্দীবিবেক বুদ্ধিজীবিরা আজ সমাজ প্রগতির পথে আবর্জনা। স্বার্থলোভী চরিত্রহীন রাজনীতিকেরা ও স্বর্ণলোভী ধনিকেরা যেমন আজ সমাজ প্রগতির সকল পথ বন্ধ করে দিয়ে কেবলমাত্র শ্রেণীস্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত, তেমনি সুবিধালোভী শিক্ষিতেরাও আজ তাদের মানবিক অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে কেবলমাত্র ধনিকদের উচ্ছিষ্ট লাভের আশায় প্রতিমুহূর্ত্তে লালায়িত। ব্যধিগ্রস্ত বারবনিতাদের মতই তাদের মন শুকিয়ে মরে গেছে—দেহ শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। ওই মন আজ সম্পুর্ণ বন্ধ্যা, ওতে আবাদ করতে চাইলে চেষ্টা ব্যর্থ হবে। ওতে ফসল ফলবেনা, ফুল ফুটবেনা, ফল ধরবেনা। ওই মনে কোন প্রকার জীবন-জিজ্ঞাসা, নীতি-জিজ্ঞাসা, সৌন্দর্য-জিজ্ঞাসা ও মূল্য-জিজ্ঞাসাই আজ আর অবশিষ্ট নেই। সুতরাং ওর উদ্দেশ্যে যত উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করেই আবেদন জানানো হোক

না কেন, সকল আবেদন ব্যর্থ হতে বাধ্য। সর্বাপেক্ষা অধিক আন্তরিকতা নিয়ে যিনি আবেদন জানাতে যাবেন, তার কাছেও এক সময় মনে হবে 'আমার জীবন যেন সীমাহীন অরণ্যে রোদন'। প্রাণহীন, হৃদয়হীন, বুদ্ধিহীন, আবেগ অনুভূতিহীন, চরিত্রহীন, পদলেহী, উচ্ছিষ্টলোভী, সুবিধালোভী, মেরুদণ্ডহীন, আত্মবিক্রীত, অন্তঃসারশূন্য তথাকথিত বুদ্ধিজীবিদের জন্য সাহিত্য রচনা করতে গেলে লেখককেও অবশ্যই প্রাণহীন, বুদ্ধিহীন,—হতে হবে এবং সকল প্রকার সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা, জীবন জিজ্ঞাসা, নীতি জিজ্ঞাসা ও মূল্যবোধ মন থেকে মুছে ফেলে দিয়ে 'আর্ট ফর আর্টস সেক'-এর শ্লোগান তুলতে হবে। কেবলমাত্র শিল্প সাহিত্যের বেলাই নয়, রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেও আমাদের দেশের. সন্ত-বুর্জোয়া—মুতসুদ্দি-আমলারা ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাহীন উভয় অংশই আজ এক সার্বিক ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে—এই শ্রেণীর সামনে আজ আর কোন ভবিষ্যত নেই।

দ্বন্দ্বমুলক বস্তুবাদী দর্শনের এই সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয়, তা হলে পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে আজ একথা বলা যায় যে, আমাদের দেশের সামন্ত বুর্জোয়া-মুতসুদ্দি আমলাদের নিয়ে গঠিত যে শ্রেণী তাও নিশ্চয়ই অচিরেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং শোষিত, নির্যাতিত শ্রমিক কৃষকেরা বিজয়ের গৌরব অর্জন করবে। এটাই যদি সত্য হয় তা হলে আজ আমাদের বক্তব্য, এই শ্রেণীর শুভবুদ্ধি উদয়ের আশা পরিত্যাগ করে এর উপর থেকে সম্পূর্ণরূপে সকল প্রকার মোহ বিসর্জন দিয়ে এর বিরুদ্ধে আপোষহীন প্রস্তুত হওয়া। যে শ্রেণী বিজয়ের গৌরব অর্জন করবে, সংগ্রামে সমাজের সেই শ্রেণীর উপরই বিজয়ের জন্য নির্ভর করতে হবে। সে শ্রেণী হল শ্রমজীবি মানুষের শ্রেণী, শ্রমিক কৃষকেরাই উপভোগ করতে পারেন, পড়ে সময় কাটাতে পারেন। সাহিত্য পাঠ করে সময় কাটানোর কথা বলাতে কথাটি অশোভন মনে হতে পারে। কিন্তু সাহিত্যকে

পদদলিত করার চাইতে সাহিত্য নিয়ে সময় ক্ষেপন করা অত্যন্ত ভাল।

অবশ্যই প্রতিভাবানের সঙ্গে ভূমির তুলনা হতে পারে না। কিন্তু অধ্যবসায়ের সঙ্গে কষ্ট সহ্য করে কাজ না করলে ভূমি হওয়াও সম্ভব নয়। সব কিছুই মানুষের চেষ্টার উপর নির্ভর করে, স্বর্গ প্রেরিত কোন প্রতিভাবানের অপেক্ষায় কাল ক্ষেপনের চাইতে চেষ্টার মধ্য দিয়ে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা অনেক বেশী। এতেই ভূমির শক্তি, বিপুল সম্ভাবনা ও পুরস্কার নিহিত। যখন মাটি থেকে একটি সুন্দর পুষ্পের জন্ম হয় তখন যেই তা দেখে সেই আনন্দ লাভ করে, মাটিও আনন্দিত হয়। যদি মাটিরও একটা প্রাণসত্তা থাকে তা হলে নিজের প্রাণসত্তাকে অনুভব করার জন্য নিজেরই একটি পুষ্পে পরিণত হওয়ার প্রয়োজন নেই। মাটিতে প্রাণসত্তা সব সময়ই নিহিত থাকে।

আজ যখন পূর্ব বাংলায় প্রতিভাবানের শূন্যতা দেখা দিয়েছে এবং চারদিকে হতাশা দেখা দিয়েছে তখন লুসুনের এই কথাগুলোকে হৃদয়ঙ্গম করে পূর্ব বাংলার অন্তঃস্থিত সম্ভাবনার দিকে তাকিয়ে আমাদের আশার আলো অন্বেষণ করা প্রয়োজন। আমরা আজ এক অন্ধকার যুগে রয়েছি, এক গৌরবময় নতুন যুগের জন্মদানের সুস্পষ্ট লক্ষ্য নিয়ে আজ আমাদের সমস্ত কাজ পরিচালিত হওয়া উচিত। নতুন যুগ সৃষ্টির কাজের পদ্ধতিও অবশ্যই হবে নতুন। *

---

*প্রবন্ধটি ১৯৬৮ সালের আগষ্ট মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। আইয়ুব রাজের সেই শেষ দিনগুলোতে সারা দেশে বিরাজ করছিল এক গভীর হতাশা। বিরোধী দলগুলোর অধিকাংশই তখন 'মৌলিক গণতন্ত্র পদ্ধতিতে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার জন্য ঐক্যফ্রন্ট গঠনের কথা আলোচনা করছিল এবং ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে তারা গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি (ডি, এ, সি) নামে এক সর্বস্ব ঐক্যফ্রন্ট গঠন করেছিল। সে ঐক্যফ্রন্টের ব্যর্থতা প্রমাণিত হয় যখন ১৯৬৮

আবুল কাসেম ফজলুল হক

সালের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে পল্টন ময়দানে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী নির্বাচন বর্জন করে আন্দোলন আরম্ভ করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান এবং পরদিন থেকেই সারা পূর্ব বাংলা জুড়ে ব্যাপক ঘেরাও আন্দোলন ও গণ অভ্যুত্থানের সূচনা হয়। তারপর যদিও অনেক ঘটনাই ঘটে গেছে তবু এ প্রবন্ধের আবেদন এখনও শেষ হয়ে যায়নি। এ প্রবন্ধের বক্তব্যটি আরও প্রচারিত হওয়া উচিত এই বিবেচনায় এটি এখানে পুনর্মুদ্রিত হল। পুনর্মুদ্রনের আগে লেখক তার বক্তব্য পরিশোধন করেছেন।
—সম্পাদক—ফসল।

লালন শাহের জীবন-কথা

এস্. এম্. লুৎফর রহ্মান

লালন শাহ্ বাঙলার লোক-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম দিকপাল। প্রায় পৌণে শতাব্দী পূর্বে এই কালোত্তর প্রতিভার তিরোভাব ঘটেছে। তথাপি তাঁর জীবনীর কোন নির্ভরযোগ্য আলোচনা আজো লিপিবদ্ধ হয়নি। কারণ তাঁর দীর্ঘ-জীবনের কাহিনী-রচনায় প্রয়োজনীয় উপকরণ খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম গীতিকবি চণ্ডীদাসের মতই লালন শাহ্ সারা-জীবন আত্মলোপের সাধনা করে গিয়েছেন। কোথাও তিনি নিজের পরিচয় রেখে যাননি। মধ্যযুগের ঐতিহ্যবাহী কবি হয়েও লালন শাহ্ তাই মধ্যযুগীয় কবিদের থেকে এ-ব্যাপারে আশ্চর্যরকম পৃথক। বাঙলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর রচিত কয়েক হাজার গান সংগৃহীত হয়েছে। সে সবের মধ্যে এমন একটি রচনাও পাওয়া যায়নি—যার মধ্যে লালন-জীবনীর সুস্পষ্ট তথ্য-নির্দেশ বিধৃত। নিজের সম্পর্কে তাঁর এ-নির্লিপ্তি প্রায় সীমাহীন। আত্ম-পরিচয় দানে লালনের সামান্যতম আগ্রহও ছিলনা। বরং গভীর বিতৃষ্ণা থাকায় সমকালে জীবিত লালনের প্রতিবেশীরাও তাঁর সম্পর্কে খুব কমই জ্ঞাত ছিলেন। জাতিগোত্র-বংশ ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর বিতৃষ্ণার সাক্ষ্য লালন-গীতির মধ্যেই পাওয়া যায়। যেমন,

> ···লালন বলে হাতে পেলে
> 'জাতি' পোড়াতাম আগুন দিয়ে॥

এ জন্যে লালন শাহের অন্তরঙ্গ শিষ্য-বৃন্দও তাঁর জন্মস্থান, জাতি, গোত্র, বংশ প্রভৃতি বিষয়ে অবহিত ছিলেন না। ফলে, লালন শাহের পূর্ণাংগ ও প্রামাণিক জীবন-কথা রচনা করা আয়াস-সাধ্য।

পূর্ণ জীবন-কাহিনী সংবলিত লালন শাহের কোনো আত্ম-

জীবনীমূলক রচনার সন্ধান পাওয়া না গেলেও তাঁর প্রিয়তম শিষ্য দুদ্দু শাহের স্বহস্ত-লিখিত লালন-জীবনী-বিষয়ক একটি পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। উক্ত পাণ্ডুলিপিতে লেখক জানিয়েছেন—

"ধন্য ধন্য মহামানুষ দয়াল লালন সাই
পতিত জনার বন্ধু তাঁর গুণ গাই ॥

আমার দয়াল মুরশীদ কৃপা প্রকাশিয়া
তাঁর আত্মকথা কিছু গিয়াছে বলিয়া।

....

বহুদিন সেই কথা রাখিনু ঢাকিয়া
সাইজীর ছিল মানা নাহি প্রকাশিবা।
নাহি জানি কবে আমি যাইব চলিয়া
তাঁর আত্মকথা যাইবে গোপন হইয়া।
এ কারণে শেষকালে লঙ্ঘি তাঁর বাণী
একান্ত বিনয়ে লিখি তাঁর জীবনী ॥ (১)

এই পাণ্ডুলিপি, সমকালীন অন্যান্য লিখিত বিবরণ, জনশ্রুতি এবং বর্তমানকালের লেখক-গবেষকগণের আলোচনাই বক্ষ্যমান প্রবন্ধ-রচনার মূল উপকরণ। এ-গুলোর কোন একটিতেই লালন শাহের সম্পূর্ণ জীবনের সন্দেহাতীত তথ্যবিন্যাস নেই। তুলনায়, দদ্দু শাহের পাণ্ডুলিপিটি অধিক নির্ভরযোগ্য। কিন্তু উক্ত 'জীবনী'তে বিবৃত সকল ঘটনাই অসংশয়ে গ্রহণ করা যায়না। রচনাটিও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

১। দুদ্দু শাহ্, লালন-জীবনী (পাণ্ডুলিপি), পৃঃ ১।
পাণ্ডুলিপি-পরিচিত পরিশিষ্টে প্রদত্ত হোল।

২

ক. জন্মকাল ॥

লালন ফকীরের গান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীমতিলাল দাশ লিখেছেন—"তাঁহার জন্মবর্ষ ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ"। (২) এ সিদ্ধান্তে পৌছতে গিয়ে তিনি কুষ্টিয়া বা টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক 'হিতকরী' পত্রিকার একটি ছিন্নপত্রের উল্লেখ করে বলেছেন—"ইহাতেই পাই, লালন ১৭ই অক্টোবর শুক্রবার দেহত্যাগ করেন, তখন তাঁহার বয়স ১১৬ বৎসর ছিল। 'হিতকারী'তে তারিখ দেওয়া নাই, কাজেই কোন সালের কাগজ বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু অন্যত্র হইতে পাই যে, তিনি১৮৯১ খৃষ্টাব্দে মারা যান, তাহা হইলে তাঁহার জন্মবর্ষ ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতেছে।"(৩) উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়, শ্রীমতিলাল দাশ ঠিক 'হিতকরী' অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। অথচ সুনির্দিষ্ট কোন সূত্র থেকে তিনি লালনের মৃত্যুর নিশ্চিত তারিখটি পেয়েছেন তারও কোন উল্লেখ নেই। কাজেই লালন শাহের যে মৃত্যু-বর্ষটি তিনি সঠিক মনে করেছেন, তা' নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নেওয়া যায় না। আর তার ফলেই ১৭৭৫খ্রীষ্টাব্দে লালন শাহের জন্ম এই সিদ্ধান্ত গুরুত্বহীন।

অন্যদিকে আধুনিক কালের প্রথিতযশা বাউল-দর্শন-গবেষক

২। শ্রীমতিলাল দাশ, "লালন ফকিরের গান," মাসিক বসুমতী (১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩শ বর্ষ—শ্রাবণ, ১৩৪১), পৃঃ ৬২৮।

৩। ঐ, পৃঃ ৬৩৮।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লালন শাহের জন্মকাল নির্ণয় করিতে গিয়ে বলেছেন—"তাঁহার (লালনের) জন্ম হয় বাংলা ১১৮১ সালে, ইংরেজী ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে।" (৪) এ তারিখটিই বর্তমানে সর্বাধিক প্রচলিত। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, (৫) মুহম্মদ মনসুর উদ্‌দীন, (৬) ডঃ আনিসুজ্জমান (৭) প্রভৃতি বিদগ্ধ-জন এ-তারিখটিই যথার্থ বলে মনে করেন। এঁদের মধ্যে মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ব্যতীত অন্যান্য সবাই শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের "বাংলার বাউল ও বাউল গান"-গ্রন্থটিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের-ই পোষকতা করেছেন। কিন্তু মুহম্মদ মনসুরউদ্‌দীন সাহেবের মতামত একটু বিচিত্র। তিনি ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দকে লালন শাহের জন্ম-তারিখ বলে উল্লেখ করেছেন। (৮)

৪। শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাংলার বাউল ও বাউল গান, ২য় খণ্ড (কলিকাতা, দীপান্বিতা—১৩৬৪), পৃঃ ৮।

৫। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ডঃ মতিলাল দাশ ও শ্রীপীযুষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, লালন-গীতিকা (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১৯৫৮), ভূমিকা পৃঃ।/.।

৬। মুহম্মদ মনসুরউদ্‌দীন, (i) হারামণি—৫ম খণ্ড (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-১৯৬১), ভূমিকা পৃঃ ১।।৵.।
— ——(ii) হারামণি—৭ম খণ্ড (বাঙলা একাডেমী, ঢাকা-১৩৭১), পৃঃ ১৮। — ——(iii) "লালন সঙ্গীতের সূচীপত্র," লোক-সাহিত্য—৩য় খণ্ড (বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, আষাঢ় ১৩৭১), পৃঃ ২০২।

৭। আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (লেখক সংঘ প্রকাশন।, ঢাকা- ১৩৭১), পৃঃ ২০২।

৮। মুহম্মদ মনসুর উদ্‌দীন, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ২য় খণ্ড (ঢাকা, ১৩৭১), পৃঃ ১৭।

অথচ আলোচনা দ্বারা এই তথ্যকে প্রতিষ্ঠিত করার কোন চেষ্টাই করেননি। আবার 'সাহিত্য পত্রিকা'' হয় বিনা আলোচনায় তিনি ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দকে লালন শাহের জন্মবর্ষ বলে নির্দেশ করেছেন।(৯) তথ্য প্রাপ্তির ও কোনো উৎস নির্দেশ নেই। বিশেষ লক্ষণীয় যে, ১৩৬৫ সালে "সাহিত্য পত্রিকা"-য় তিনি লালন শাহের জন্ম ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ বলে উল্লেখ করলেও ১৩৭১ সালে বাঙলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত "লোক-সাহিত্য" পত্রিকায় লালন শাহের জন্ম ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর এ মত-পরিবর্তনের সুস্পষ্ট কারণ কোথাও লিপিবদ্ধ হয়নি। কিংবা এ পরিবর্তনের কোনো ধারাবাহিকতাও নেই। সেজন্যেই মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন সাহেবের নিজস্ব অভিমত বলে কোনো বছরকেই চিহ্নিত করা সম্ভব নয়।

তাছাড়া, বাংলার "বাউল ও বাউল গান-" গ্রন্থে শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন—"হিতকরী" পত্রিকাতে লালনের মৃত্যু সম্বন্ধে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। ঐ সংবাদটিতে আছে যে, লালন ১৭ই অক্টোবর শুক্রবার দেহত্যাগ করেন।......'হিতকরী' ১২৯৭ সালের বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইয়া চৈত্র পর্যন্ত কুষ্টিয়াতে ছিল। তাহার পর বৎসর মীর মোশাররফ হোসেনের কর্মস্থল টাঙ্গাইলে উহা স্থানান্তরিত হয়।......লালনের মৃত্যু-সংবাদ সংবলিত অংশটুকু ঐ ১২৯৭ সালের 'হিতকরী'রই অংশ তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।" (১০) 'হিতকরী'র এই প্রকাশকাল নির্ধারণে শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচিত 'বাংলা সাময়িক পত্র' গ্রন্থের আশ্রয় নিয়েছেন। পত্রিকাটি সম্পর্কে ডক্টর কাজী

৯। —— — "লালন ফকীরের গান", (সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৫), ৯৭।

১০। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭।

আবদুল মান্নান লিখেছেন—"'হিতকরী' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা ১৮৯০ সালের প্রথম দিক থেকে 'কুমারখালী মথুরানাথ যন্ত্রে' শ্রীরজনীকান্ত ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত" এবং কুষ্টিয়া লাহিনীপাড়া, শ্রীদেবনাথ বিশ্বাস কর্তৃক প্রকাশিত হচ্ছিল। পত্রিকার অতি জীর্ণ যে কটি সংখ্যা আমি পেয়েছি তার একটি প্রকাশ হয়েছিল ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বরে প্রথম ভাগ—১৭শ সংখ্যা হিসাবে। কাজেই অনুমান করি, ঐ বছরের এপ্রিল থেকে পত্রিকাটি প্রকাশ হতে থাকে।" (১১) এই বক্তব্যর সঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশিত 'হিতকরী'র প্রকাশকালগত ঐক্য আছে। (১২) তাহলে 'হিতকরী'র ১৭ই অক্টোবর যে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দেরই ১৭ই অক্টোবর সে সম্পর্কে সন্দেহ করা অসমীচীন। অতএব লালনের বয়স ১১৬ বছর এই সিদ্ধান্ত যথার্থ হলে, তাঁর জন্মবর্ষ সম্পর্কে শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের নির্দেশিত তারিখটি স্বীকার করতে হয়।

কিন্তু মৌলভী আবদুল ওয়ালী সাহেব তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন, "...he (Lalan Shah) died some ten years ago." (১৩) উল্লেখযোগ্য যে, যদিও জনাব ওয়ালী সাহবের প্রবন্ধটি ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের নৃতত্ত্ব-সমিতির মুখপত্রে প্রকাশিত হয়, তথাপি "লেখাটি

১১। কাজী আবদুল মান্নান, আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ১ম খণ্ড (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৬৮ সাল) পৃঃ ২৫২।

১২। উদ্ধৃত শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকৃত প্রগুক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৭।

১৩। Maulavi Abdul Wali. "On Curious Tenets and practices of a Certain Class of Faqirs of Bengal." The Journal of the Anthropological Society of Bombay (Vol. V, No 4, Bombay, 1900), p. 217.

উল্লিখিত সোসাইটির সাধারণ সভায় পঠিত হয়েছিলো ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর, বুধবারে।" (১৪) তাহলে দেখা যায়, মরহুম ওয়ালী সাহেবের সাক্ষ্যে লালন শাহের মৃত্যুবর্ষ ১৮৮৮খ্রীষ্টাব্দ, বাঙলা ১২৯৫ সাল। লালন-শিষ্য দুদ্দু শাহের বর্ণনায়ও এই তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায়। দুদ্দুর রচনাটিও মরহুম আবদুল ওয়ালী সাহেবের রচনার পূর্ববর্তী। দুদ্দু শাহ্ লিখেছেন,

> বারশত পঁচানব্বই বাঙ্গালা সনেতে
> ১লা কার্ত্তিক শুক্রবার দিবা অন্তে ॥
> সবারে কাঁদায়ে মোর প্রাণের দয়াল
> ওফাৎ পাইল মোদের করিয়া পাগল। (১৫)

দুদ্দু শাহ্ লালনের সর্বাপেক্ষা প্রিয় শিষ্য ছিলেন। স্নেহাধিক্যবশত তিনি তাঁকে 'বাবা' বলে ডাকতেন। লালন শাহের ওফাতের সময় দুদ্দু শাহ্ তাঁর মৃত্যু-শয্যাপার্শ্বে বিদ্যমান ছিলেন। তাছাড়া পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, দুদ্দু শাহ্ লালন শাহের মুখ থেকে তাঁর জীবন-কথা শুনে তা, লিপিবদ্ধ করেছেন। সর্বোপরি দুদ্দু শাহ্ লালন শাহের যে জীবন-কালের উল্লেখ করেছেন তা'ও 'হিতকরী'র উল্লেখের সঙ্গে অভিন্ন। অথচ তিনি 'হিতকরী' বা অন্য কোনো পত্রিকার সহায়তায় লালন-জীবনী রচনা করেননি। এমতাবস্থায় দুদ্দু শাহের উল্লিখিত মৃত্যু বর্ষটিই সঠিক মনে হয়। অর্থাৎ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর শুক্রবার তথা বাঙলা ১২৯৫ সালের ১লা কার্তিক লালন শাহের জীবনাবসান ঘটে।

১৪। মোহাম্মদ শরীফ হোসেন, "লালন শাহের জন্মস্থান" দৈনিক ইত্তেফাক, রবিবাসরীয় সংখ্যা, ৮ই মাঘ, ১৩৬৭। ইনিই প্রথম প্রবন্ধটির প্রতি সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

১৫। দুদ্দু শাহ্ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪।

তাহলে তাঁর জন্মবর্ষ সম্পর্কে শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের নির্দিষ্ট তারিখ গ্রহণ করা যায় না। কারণ লালন শাহের আয়ুষ্কাল ১১৬ বছর—এই তথ্য অভ্রান্ত হলে তার জন্মবর্ষ নিরূপিত হয় (১৮৮৮–১১৬=) ১৭৭২ খ্রীঃ। দুদ্দু শাহের উল্লিখিত জন্মবর্ষের সঙ্গেও এই হিসেবের ঐক্য আছে। তিনি স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন,

এগারশো উনআশী কার্ত্তিকের পহেলা।
হরিষপূর গ্রামে সাইর আগমন হইলা॥ (১৬)

অর্থাৎ দুদ্দু শাহের বর্ণনা-অনুসারেও ১৭৭২ খ্রীঃতেই লালন শাহের জন্ম হয়।

অবশ্য অপর লালন-জীবনী রচয়িতা অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম বলেছেন, লালন শাহের জীবনকাল ১২৪ বছর এবং তাঁর "জন্ম-তারিখ ১৭৬৮।" (১৭) এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে তিনি লিখেছেন—"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন যুবক তখন তাঁর সাথে লালন শাহের পরিচয়। লালন শাহের বয়স তখন একশ বছরেরও বেশী। ...রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন ইং ১৮৬১ সালে অর্থাৎ লালন ফকিরের জন্মের প্রায় ৯৪ বছর পরে। রবীন্দ্রনাথ যখন কুষ্টিয়ায় জমিদার হিসাবে আসেন তখন তিনি পূর্ণ যুবক। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় এবং মনসুরউদ্দিন সাহেবের যুক্তি অনুযায়ী আমরা দেখি লালন শাহ্ ১১৬ বছর জীবিত ছিলেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয় লালন শাহের ৮৭ বৎসর বয়সে। বিভিন্ন সাহিত্যিক লালনের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে এমন মনগড়া তথ্য পরিবেশন করেছেন তাতে সব কিছু জটিলতর আকার ধারণ

১৬। ঐ, পৃঃ ১।
১৭। অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম, বাউল কবি লালন শাহ্ (সাহিত্য নিকেতন, কুষ্টিয়া, ১৯৬৩), পৃঃ ১৪।

করেছে। যা'হোক আমাদের হাতে কোন দলিল না থাকায় আমরা কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারছিনা। তবে মোটামুটি ভাবে এই বলা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছু বছর ধরে লালন শাহের সাহচর্যে ছিলেন। এমতাবস্থায় যদি রবীন্দ্রনাথের জন্মের ২৯ বৎসর পর লালন শাহের মৃত্যুদিন ধরি তবে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ খুব বেশীদিন তাঁর সঙ্গ পাননি। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে এ ধারণা ঠিক নয়। এ অবস্থায় আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন ৩৫ বৎসর তখন তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। যাহোক ১৭৬৬ থেকে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের যে কোন এক সালকে আমরা লালন শাহের জন্মের সাল হিসাবে ধরে নিতে পারি। মৃত্যুর তারিখ নিয়ে উপরোল্লিখিত সুধীবর্গের মধ্যে খুব বেশী অমিল নেই। সুতরাং আমরা তাঁর মৃত্যুর সাল ১৮৯২ ইং হিসেবে ধরে নিতে পারি। তাহলে লালন শাহের জন্মতারিখ ১৭৬৮ এবং মৃত্যুর তারিখ ১৮৯২ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। এই হিসাবে লালনের বয়স ১২৪ বৎসরের কাছাকাছি পড়ে। লালন শাহের অনেক শিষ্যের মতও এই।" (১৮)

বলা বাহুল্য, লালন শাহের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ নির্ধারণ করতে গিয়ে অধ্যাপক সাহেব উপরোক্ত যুক্তি-তর্কের অবতারণা করে যে পণ্ডশ্রম করেছেন, তা ভিত্তিহীন। কারণ তিনি রবীন্দ্রনাথ ও লালন শাহের কাল্পনিক ও অবাস্তব সাক্ষাৎকারের উপর জোর দেওয়ায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম লালনের প্রকৃত জন্মতারিখ নির্ধারণ করতে গিয়ে রবীন্দ্র-লালন-সাক্ষাৎ-বৃত্তে পড়ে এমনি ভাবে লক্ষ্যচ্যুত হয়েছেন যে, হিতকরী পত্রিকায় প্রদত্ত তথ্যকেও শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও

১৮। অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩-১৪

জনাব মনসুরউদ্দীন সাহেবের মনগড়া তথ্য বলতে দ্বিধা করেননি। অথচ রবীন্দ্র-লালন সাক্ষাৎকারের যে কেন্দ্রে তিনি এত নির্ভর করেছেন তার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লালন শাহের কখনো সাক্ষাৎ হয়নি। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে অল্প কিছুদিনের জন্য প্রথম ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে (বাঙলা ১২৯৪ সাল) আগমন করেন। তারপর স্থায়ীভাবে তিনি শিলাইদহে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ (বাঙলা ১২৯৮ সাল) থেকে অবস্থান করা শুরু করেন। লালন শাহ্ তার তিন বছর পূর্বে পরলোক প্রাপ্ত হন।

তাহলে, লালনের জীবৎকাল ১২৪ বছর, এ তথ্য নিশ্চিতই ভুল। তৎ নির্দিষ্ট —জন্ম-মৃত্যুর তারিখও সঠিক নয়। কারণ অধ্যাপক সাহেবের প্রদত্ত জন্ম-মৃত্যুর কোনো তারিখের সঙ্গেই প্রত্যক্ষদর্শী দুদ্দু শাহের প্রদত্ত বিবরণের কিংবা হিতকরী'র উল্লেখের কোন ঐক্য নেই। তিনি নিজেও তাঁর বক্তব্যকে যথেষ্ট শক্তিশালী ভিত্তি দান করতে পারেননি।

প্রগুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাঙ্লা ১১৭৯ সালের ১লা কার্তিক (১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর) শুক্রবার লালন শাহ্ জন্মগ্রহণ করেন এবং বাঙ্লা ১২৯৫ সালের ১লা কার্তিক (১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর) শুক্রবারে তাঁর মৃত্যু হয়। লালনের প্রকৃত আয়ুষ্কাল ১১৬ বছর।

খ. জন্মস্থান॥

লালন শাহের জন্মস্থান সম্পর্কে শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন—পূর্বতন নদীয়া জেলার (বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত কুমারখালি থানার অধীন কুষ্টিয়া হইতে চার-পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব কোণে গোরাই নদীর তীরবর্তী ভাঁড়ারা গ্রামে লালনের জন্ম হয়।" (১৯) সম্ভবত বর্ণনাটি তিনি শ্রীবসন্তকুমার

লালন শাহের জীবন কথা
পালের "ফকির লালন সাহ" শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে সংগ্রহ করেছেন। কারণ লালন-জীবনী রচনা করতে গিয়ে শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লালন শাহ্ "সম্বন্ধে লোকমুখে যাহা শোনা যায়" তার সঙ্গে ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটিয়েছেন বলে স্বীকার করেছেন। (২০) আর শ্রীবসন্তকুমার পাল বলেছেন—ভাঁড়ারা বা ভাণ্ডারিয়া গ্রামে যে স্থানে দুঃখী সেখ চৌকিদার বাড়ী করিয়া আছে, ঠিক সেই স্থানেই সাঁইজির জননী শেষ-জীবন অতিবাহিত করিয়া যান।...সাঁইজি যে এই গ্রামেরই লোক তাহা প্রায় সকলেরই জানা আছে।" (২১) এ থেকে বোঝা যায় লালন শাহ্ এক সময় কুষ্টিয়া জেলার ভাঁড়ারা গ্রামে দীর্ঘদিন অবস্থান করেছেন। কিন্তু দীর্ঘদিন কোনো স্থানে বসবাস করলেই যে সেটি নিঃসন্দেহে জন্মস্থান বলে গ্রহণ করতে হবে—এমন নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে শ্রীবসন্তকুমার পাল ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মূল বক্তব্যের সঙ্গে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন (২২), আনিসুজ্জামান (২৩), মুহম্মদ আবদুল হাই (২৪), ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত (২৫) প্রভৃতি খ্যাতনামা প্রায় সকল পণ্ডিত একমত। বাউলদের বিষয়ে আলোচনার অন্যতম পথিকৃৎ

২০। ঐ, পৃঃ ৬।

২১। শ্রীবসন্তকুমার পাল, "ফকির লালন সাহ" প্রবাসী (১ম, খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, ২৫শ ভাগ, শ্রাবণ ১৩৩২), পৃ ৪৯৮।

২২। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, বা-সা-সা, পৃঃ ১৭।

২৩। ওানিসুজ্জামান, প্রগুক্ত, পৃঃ ২০২।

২৪। মুহম্মদ হাই ও সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ, শরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা ১৩৭১, পৃঃ ।০

২৫। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ভূমিকা, পৃষ্ঠা ।/০

ক্ষিতিমোহন সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত লীলা-বক্তৃতায় বলেছিলেন—"লালনের স্থান ছিল কুষ্টিয়ার নিকট।" (২৬) অবশ্য এই "স্থান" জন্মস্থান না কর্মস্থান সে বিষয়ে তিনি স্পষ্টতঃ কিছু বলেননি। কাজেই এ বক্তব্য অস্পষ্ট। আর শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সিদ্ধান্ত যদি মৌলিক হয় তবে তা সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্যভিত্তিক না হওয়ায় অসংশয়ে বিশ্বাস করা চলে না। কারণ অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম বলেছেন—"হরিশপুরের ১২০ বৎসর বয়স্ক আহাদ আলী মণ্ডল, মুন্শী আবদুল আজিজ প্রভৃতি প্রবীণদের উক্তিতে জানা যায় লালনের বাড়ী হরিশপুরে।" (২৭) লোক-বিশ্বাস ব্যতীত এ-ধারণার সমর্থনে তিনিও দ্বিতীয় কোনো তথ্য বা যুক্তির অবতারণা করেননি। এমন একটি ধারণা যে লালনের কোনো কোনো শিষ্য পোষণ করতেন তার প্রমাণ শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের গ্রন্থেও পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন—"সিরাজ সাঁই সম্বন্ধে ও সেই সঙ্গে লালনের সম্বন্ধে অন্য অঞ্চল হইতে আর একটি কথাও শোনা যায়। সিরাজ যশোহর জেলার ঝিনাইদহ মহাকুমার অন্তর্গত হরিশপুর গ্রামের পাল্কী বাহক ছিলেন।" (২৮) শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এ-তথ্যকে যাচাই করে দেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। বরং বলেছেন, "নানা কারণে এই বিবরণটি মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।" (২৯) কারণগুলো তিনি উল্লেখ করেননি। হয়তো লোক-শ্রুতি বলেই এ-তথ্যকে

২৬। ক্ষিতিমোহন সেন, বাংলার বাউল (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় —১৯৫৪), পৃঃ ৫৬।

২৭। অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২।

২৮। শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯।

২৯। ঐ, পৃঃ ৯।

তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিশ্লেষণ করতে ইচ্ছা করেননি।

কিন্তু লোক-বিশ্বাসের ঊর্দ্ধে, ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম বর্তমান প্রবন্ধকার কর্তৃক আবিষ্কৃত বাউলগানের অতিপুরাতন একটি খাতায় লিপিবদ্ধ লালন পরিচিতির মধ্যে এ-তথ্যের লৈখিক সমর্থন পাওয়া যায়। উক্ত পরিচিতির পরিচয় দান করতে গিয়ে মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন সাহেব তাঁর 'হারামণি', ৭ম খণ্ডের খ-পরিশিষ্টের পাদটীকায় লিখেছেন—"সম্প্রতি বাঙলা একাডেমীর লোক-সঙ্গীত সংগ্রাহক··· লুৎফর রহমান···একটি খবর সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন।···এই খবর অনুযায়ী পাওয়া যায় "লালন শাহ্ ফকির" সাকিন হরিশপুর, জেলা যশোহর"···। আশা করা যায়, গবেষকগণ এই খবরের সত্যাসত্য বিচার করিয়া দেখিবেন।" (৩০) এই বিচারে দেখা যায় পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত দুদ্দু শাহের পাণ্ডুলিপিতেও বলা হয়েছে,

এগার শো উনআশী কার্ত্তিকের পহেলা।
হরিষপুর গ্রামে সাইর আগমন হইলা॥
যশোহর জেলাধীন ঝিনাইদহ কয়
উক্ত মহকুমাধিন হরিষপুর হয়॥ (৩১)

মরহুম মৌলবী আব্দুল ওয়ালী সাহেবের প্রবন্ধেও পাওয়া যায়,

Another renowned and the most melodious versifier, whose "dhuyas" are the rage of the lower classes, and sung by boatmen and others, was the far famed "Lalan shah". He was a disciple of "Siraj shah" and both were born at the Village Harishpur, Sub-division Jhenidah, District Jessore." (৩২)

৩০। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, হা. ম.—৭ম খণ্ড, পৃঃ খ-পরিশিষ্টের-'খ'।

৩১। দুদ্দু শাহ্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১।

৩২। Maulavi Abdul Wali, ibid., p. 217

তাছাড়া হরিশপুর গ্রামে লালন শাহের একজন বংশধর এখনও জীবিত রয়েছেন। ইনি ছবিরণ নেছা বিবি ওর্ফে 'ক্ষেপুর মা'। এই 'ক্ষপুর মা' লালন শাহ্‌দের বংশের চতুর্থ সিঁড়ির কন্যা। (৩৩)

অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায়, লালন শাহের জন্মভূমি যশোহর জেলার ঝিনাইদহ মহাকুমার হরিশপুর গ্রাম। অধ্যাপক আফসার উদ্দীন সেখ-এর মতে লালন শাহ্‌ এই গ্রামের "উত্তর পাড়ায়" জন্মগ্রহণ করেন। (৩৪)

গ. 'জাতি' ও বংশ-পরিচয় ॥

কিন্তু তিনি কোন্‌ জাতি বা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত সে বিষয়ে লালন শাহের জীবৎকালেই প্রশ্ন উঠেছিল। একাধিক লালন-গীতিতে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিদ্যমান। সমকালীন জনসাধারণের এ-কৌতূহলকে কেন্দ্র করে লালন শাহ্‌ তাঁর জাতি-ধর্ম-বর্ণ সম্পর্কে স্বমত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু কোথাও পরিষ্কাররূপে আত্মোন্মোচন করেননি। কারণ বিশ্ব-মানবতার প্রবক্তা লালন শাহ্‌ মানব-জাতির অন্য কোনো বিভাগ-উপবিভাগের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন না। গোত্র-বর্ণ-সম্প্রদায় সম্পর্কে তাঁর এ শ্রদ্ধাহীনতা নিছক ভাবাবেগের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলনা। জনসাধারণের আজন্ম শ্রদ্ধেয় এসব সংস্কার ও তার আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত যুক্তি-সংগত-ভাবেই ন্যায়ারোপণ করে বলেছেন,

> সব লোকে কয়
> লালন কি জাত সংসারে।

৩৩। অধ্যাপক আফ্‌সার উদ্দীন সেখ, "লালন জীবন জিজ্ঞাসার এক অধ্যায়," কুষ্টিয়া কলেজ বার্ষিকী (কুষ্টিয়া, ১৯৬৪), পৃঃ ১১৯।

৩৪। ঐ, পৃঃ ১২০।

লালন বলে জাতির কি রূপ
দেখলাম না তা,—নজরে ॥
ছোন্নত দিলে হয় মুসলমান
নারী লোকের কি হয় বিধান
বামন চিন পৈতা প্রমাণ
বাম্‌নি চিনি—কিসে রে ॥
কেউ মালা কেউ তস্‌বি গলে
তাইতে কি জাত ভিন্ন বলে
আসা কিম্বা যাওয়ার কালে
জাতির চিহ্ন রয় কি রে ॥
জগৎ বেড়ে জাতির কথা
জাতির গৌরব যথা-তথা
লালন বলে জাতির 'ফাতা'
ডুবিয়েছি—সাধ্‌-বাজারে ॥

উদ্ধৃতকবিতায় লালন শাহ্‌ হিন্দু-মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যমূলক আচার-অনুষ্ঠানের অসারতার প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশ করেছেন। সেজন্যে লালন শাহ্‌ "জাতির ফাতা" ফোতা (<পতাহ্‌=ঠিকানা) "সাধ-বাজারে" অর্থাৎ ইচ্ছে করেই লুপ্ত করে দিয়েছেন।

কিন্তু এ জবাবেও তিনি রেহাই পাননি। বারে বারে তাঁকে এ-প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। জবাব দিতে হয়েছে। তিনিও একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নটির মীমাংসা করেছেন। যেমন,

জাতির উৎপত্তি কোথায় ?
সকলে শুধায়—
বললে কবে লালন ফকীর
কড়া কথা কয় ?
আদিকালে আদমগণ
নানান জায়গায় করত ভ্রমণ

ভিন্ন আচার ভিন্ন বিচার
তাইতে সৃষ্টি হয়।
জানত না কেউ কারো খবর
ছিলনা এমন কলি জবর
এক এক দেশে ক্রমে শেষে
গোত্র সৃষ্টি পায়।
জ্ঞানী-দ্বিগ্বিজয়ী হোল
নানা রূপ সব দেখতে পেল
দেখে নানা রূপ সব হোল বেকুব
এরূপে জাতির পরিচয়॥
খগোল ভূগোল নাহি জানত
যার যার কথা সেই বলিত
লালন বলে কলিকালে
জাত বাঁচানো দায়॥

এ কবিতায় লালন শাহ্ ঐতিহাসিক-নৃতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে জাতিতে-জাতিতে ভেদাভেদ ও আচার-অনুষ্ঠানের বিভিন্নতার বিচার করেছেন। ন্যায়ারোপণের এই অবরোহ পদ্ধতিতে তিনি 'জাতি'-তত্ত্বের বিশ্লেষণ করে মানুষের সংকীর্ণ জাত্যাভিমান- (Racial Chauvenism) কে কূপমণ্ডুকের অহমিকা বলে নির্দেশ করেছেন এবং এর ভবিষ্যৎ-বিনাশের প্রতিও ইঙ্গিত দান করেছেন।

কিন্তু লালন শাহ্ নিজে এসব ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি আস্থাশীল না হলেও এসবে যাঁরা আস্থাবান তাঁদের কোনো এক বংশেই তাঁর জন্ম—এমন নিশ্চয় হতে পারে। আর সে দিক থেকে বিচার করতে গেলে লালন শাহের জন্মগত-উত্তরাধিকার কোন্ জাতির তা নির্ধারণ করা সম্ভব। অতএব এদিক থেকে লালনের নিজের বক্তব্য কি এ-প্রসঙ্গে তা জানা আবশ্যক। লালন বলেছেন,

সবাই শুধায় লালন ফকীর
কোন জাতির ছেলে।
কারে বা কি বলব আমি
দিশা না মেলে॥
হয় কেমনে জাতির প্রমাণ
হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্ট-যবন ?
'জাত' বলিতে কি হয় বিধান
শাস্ত্রে খুঁজিলে ? ॥
স্বেদ-অণ্ড-জরায়ু ধরে
এক-একেশ্বর সৃষ্টি করে
আগম-নিগম চরাচরে
তারে ভিন্ন জাত বলে ?
মানুষের কি হয় জাতির বিচার ?
এক এক দেশে এক এক আচার
লালন কয় জাতির ব্যবহার
গিয়াছি ভুলে॥

এ কবিতায়ও লালন শাহ্ তাঁর জাতি বিশ্বাস সম্পর্কীয় পূর্ব ধারণাকেই অটুট রেখেছেন। কারণ পিতামাতার জাতি-পরিচয় প্রদানও এক দিক থেকে জাতি-ধর্মে আস্থা স্থাপনের পরিচায়ক। কিন্তু যিনি মানব-ধর্মে বিশ্বাসী, মানুষের কখনো জাতি-বিচার সম্ভব নয় বলে যাঁর ধারণা···তিনি এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন না। এ-কবিতায়ও তাই লালন শাহ্ ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে স্বমত ব্যক্ত করেছেন। কবিতাটিতে তিনি প্রজনন-বিজ্ঞানের যুক্তি অবতারণা করে বলেছেন রমণীর জরায়ুতে যখন একই উপায়ে শুক্রকীট ও ডিম্বাণুর সংযোগে মানব-শিশুর জন্ম হয়, তখন সে-মানুষের গোত্র-বিচার নিরর্থক।

লালন শাহের জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বাচন তাই সেকালের

ন্যায় একালেও অত্যন্ত দুরূহ। তবু অনুসন্ধান করা আবশ্যক। এ বিষয়ে শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন, "লালন জাতিতে হিন্দু কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার উপাধি ছিল কর, কেহ কেহ বলে দাস।" (৩৫) অবশ্য লালন কায়স্থ-সন্তান, শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের এই তথ্য, লালন-শিষ্য ফকীরদের নিকট থেকে সংগৃহীত। আর এ-ধারণাটি লালনের জীবিতাবস্থায়ই প্রচলিত ছিল। তার প্রমাণ মৌলভী আবদুল ওয়ালী সাহেবের প্রবন্ধেও পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন—"Here (At Siuarya) he lived, feasted, sang and worshipped and was known as Kayastha.' (৩৬) কিন্তু লোক-বিশ্বাস-নির্ভর এ-তথ্য বিশ্বাসযোগ্য নয়। এ বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে শ্রীমতিলাল দাশ তাঁর ১৩৪১ সালে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে লালনের "মুরশিদ বিনে কি ধন আর আছে রে মন এ জগতে" গানটি উদ্ধৃত করে আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেছেন, "এই কবিতায় মুসলমান ধর্ম্মের অনেক রীতি-নীতির উল্লেখ আছে—কিন্তু লালন মুসলমান ছিলেন বলিলে ভুল হইবে।...লালন ফকির হওয়ার পূর্বে হিন্দু ছিলেন এবং পরে সিরাজ সাঁই দরবেশের নিকট দীক্ষিত হন।...কিন্তু আসলে তিনি মুসলমান নন।" (৩৭) কারণ স্বরূপ শ্রীমতিলাল দাশ বলেছেন, "তাঁহার সাধনায় নামাজের স্থান নাই।" (৩৮) বলা বাহুল্য, এ অত্যন্ত দুর্বল যুক্তি। আর লালন শাহের সাধন-পদ্ধতির তিনি কোনো উল্লেখই করেননি। তাছাড়া ফকীর হওয়ার পূর্বে লালন হিন্দু ছিলেন এবং পরে মুসলমান হন—সে-সম্পর্কেও কোনো সুস্পষ্ট তথ্য-নির্দেশ করেননি।

৩৫। শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮।

৩৬। Moulavi Abdul Wali, Ibid., p. 212.

৩৭। শ্রীমতিলাল দাশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৩৮।

৩৮। ঐ, পৃঃ ৬৩৮।

লালন জন্মতঃ হিন্দু এবং পরবর্তীকালে ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করেন। এ-বক্তব্যের সঙ্গে ক্ষিতিমোহন সেন (৩৯), ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত (৪০), মুহম্মদ মনসুর উদ্‌দীন (৪১), আনিসুজ্জামান (৪২) প্রভৃতি পণ্ডিত একমত। কিন্তু এঁরা কেউ-ই এবিষয়ে কোনো মৌলিক তথ্য বা যুক্তির অবতারণা করেননি। অবশ্য মনসুর উদ্দীন সাহেব লালন শাহের বংশ-পরিচয় দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে কিছুটা ভিত্তি দেবার চেষ্টা করেছেন। বংশ-পরিচয়ের উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন—লালন শাহ্‌ হিন্দু-সন্তান। নাম লালন চন্দ্র রায়, মতান্তরে লালবিহারী দে। পিতার নাম ভস্মদাস, মাতা পদ্মাবতী।"(৪৩)

উল্লেখযোগ্য যে, লালন শাহের বংশ-পরিচয় সম্পর্কে প্রথম আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীবসন্তকুমার পাল বলেছিলেন-"সাঁইজী কায়স্থ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। ···সাঁইজীর জননীর নাম পদ্মাবতী এবং মাতামহের নাম ভস্মদাস। ···সাঁইজীর বাল্য নাম লালন দাস।"(৪৪) এখানে শ্রীবসন্তকুমার পাল ভস্মদাসকে লালন শাহের মাতামহ বলে শনাক্ত করেছেন ; কিন্তু মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সাহেব তাঁকে পিতা বলে বর্ণনা করেছেন। এবং উভয়েরই তথ্য আহরণের উৎস লালন সাঁই মতবাদী ফকীরদের জবানী। একই প্রবন্ধে

৩৯। শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬।

৪০। শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত, ভূমিকা পৃঃ ।/০।

৪১। মুহম্মদ মনসুর উদ্‌দীন, হা. ম.—৫ম খণ্ড পৃঃ ।।৶০

৪২। আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০২

৪৩। মুহম্মদ আবু তালিব, "লালন শাহ্‌" দৈনিক ইত্তেফাক (সাপ্তাহিক সাময়িকী—১লা মাঘ, ১৩৬৭)-এ উদ্ধৃত।

৪৪। শ্রীবসন্তকুমার পাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯৮।

বসন্তকুমার বাবু নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন, "সাঁইজী হিন্দু কি মুসলমান একথা আমিও স্থির বলিতে অক্ষম ; এমনকি তিনি নিজেও বলিয়াছেন—'সবাই বলে লালন ফকির হিন্দু কি যবন।' —তবে মুসলমানের হস্তে প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিতেন এই অপরাধে তাঁহাকে মুসলমান বলিয়া সাব্যস্ত করা যায়।" (৪৫) কিন্তু বসন্তবাবু লালনের উক্ত "সবে বলে লালন ফকির হিন্দু কি যবন" গানটি সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করলে এ-বিষয়ে সুনিশ্চিত একটি ইংগিত আবিষ্কার করতে পারতেন। গানটি নিম্নরূপঃ

সবাই শুধায় লালন ফকীর
হিন্দু কি যবন।
কারে বা বলব আমি
না জানি সন্ধান॥
বেদ-পুরাণে করেছে জারী
যবনের সাঁই হিন্দুর হরি
তাও তো আমি বুঝতে নারি
দুই রূপ সৃষ্টি করলেন—
তার কি প্রমাণ॥
একই পথে আসা-যাওয়া
একই পাটনী দিচ্ছে খেওয়া
কেউ খায়না কারো ছোঁওয়া
ভিন্ন জল কে কোথায় পান॥
বিবিদের নাই মুসলমানি,
পৈতে যার নাই সেও তো বামনি
(বোঝ রে ভাই দিব্যজ্ঞানী)

৪৫। শ্রীবসন্তকুমার পাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০১-৫০২।

লালন তেম্‌নি—
খাত্‌নার জাত একখান ॥

লক্ষণীয়, যে, আলোচ্য গানটির শেষ পংক্তিতে লালন শাহ্‌ আত্ম-পরিচয়ের রহস্য-উন্মোচন না করেও কিঞ্চিৎ পরিহাসের সুরে নিজেকে 'খত্‌নার-জাত' বলে উল্লেখ করেছেন। 'খত্‌না'-প্রথা একমাত্র ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যেই প্রচলিত। তাহলে কি লালন মুসলিম-সন্তান ছিলেন? অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম বলেছেন, "লালন শাহ্‌ ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। তাঁর সমগ্র জীবন ইস্‌লামের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল।" (৪৬) তাঁর এই সিদ্ধান্তের মূলে কোনো তথ্য-নির্দেশ নেই। শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের একটি উক্তির প্রতিবাদ করতে গিয়ে জনাব করিম সাহেব উপরোক্ত উক্তি করেছেন।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মূল বক্তব্যটি ছিল মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সাহেবের একটি উক্তির সমালোচনা। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সাহেব বলেছেন, লালন "স্বেচ্ছায় ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করেন।" (৪৭) এ বক্তব্যের সমালোচনা প্রসংগে শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন—"লালনের ধর্ম কি ইস্‌লাম ধর্ম? লালন-গুরু সিরাজ সাঁই মুসলমান হইলেও ধর্মে কি ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন? তাঁহাদের ধর্ম ফকিরি ধর্ম—আউল-বাউলের ধর্ম-জাতি-ধর্ম-সংস্কার নির্বিশেষে একটা নির্দিষ্ট সাধনমার্গের ধর্ম।" (৪৮) এই উক্তির সমালোচনা করে অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম বলেছেন—"উপেন বাবু ইস্‌লাম ও মুসলমান এই দুইটি শব্দের ভিতর পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন। অথচ

৪৬। অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০।
৪৭। শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২, উদ্ধৃত।
৪৮। শ্রী উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২।

এদের মধ্যে কোন পার্থক্যই নেই। স্রষ্টার নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করাই ইস্‌লাম, আর যে ব্যক্তি আত্মসমর্পণ করে সে মুসলমান। সুতরাং ইসলাম ধর্মাবলম্বী ও মুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ...ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বীদের প্রতি উপেন বাবুর আক্রোশ নিছক ব্যক্তিগত বলে আমি মনে করি"(৪৯) অতঃপর তিনি লালন শাহ্‌ ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন—এই উক্তি করেছেন।

উল্লেখযোগ্য যে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ সম্পর্কে লালন শাহ্‌ ঠিক কিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন তার প্রমাণ প্রাগুক্ত ক'টি কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে। এই সব কবিতার মূল বক্তব্যের সংগে শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের উপযুক্ত বিশ্লেষণ মোটেই অসমঞ্জস নয়। ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ডঃ ভট্টাচার্যের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ তাঁর বক্তব্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে, অধ্যাপক সাহেবের এই উক্তিও তাই গ্রহণযোগ্য নয়। 'ইস্‌লাম' ও 'মুসলমান' শব্দদ্বয়ের তিনি যে ব্যাখ্যাদান করে লালনকে ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বী বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, সেই ব্যাখ্যাও অতি-ব্যাপ্তির দোষে দূষণীয়। কাজেই লালন শাহ্‌ মুসলিম-সন্তান ছিলেন কিনা সেটাই বিচার্য, তিনি ইস্‌লামকে অনুসরণ করতেন কিনা, তা নয়। এ-বিষয়ে অধ্যাপক সাহেবের আলোচনা বিশেষ তথ্যসমৃদ্ধ নয়। তিনি লালন শাহের যে বংশ-পরিচয় প্রদান করেছেন, তা নিরাসক্ত ভাবে বিচার করে দেখেননি। তাঁর উল্লেখ ও সিদ্ধান্তের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই—লোক-শ্রুতিকে অবলম্বন করা হয়েছে। কিন্তু সে-সব বক্তব্য তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি। এজন্যে তাঁর অনেক উক্তিই নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যায়না।

অবশ্য লালন শাহ্‌ মুসলমান ছিলেন, এই উক্তির সপক্ষে

৪৯। অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯-২০।

লালন শাহের জীবন কথা

মুহম্মদ আবু তালিব সাহেব বলেছেন, "লালন শাহ্ শুধু মুস্লিম সন্তান-ই ছিলেন না তাঁরা বংশানুক্রমে মুসলমান ছিলেন"(৫০) তিনি লালন-শিষ্য দুদ্দু শাহের পাণ্ডুলিপির উল্লেখ করেই এ-উক্তি করেছেন। এবং একথা যথার্থ যে, দুদ্দু শাহের পাণ্ডুলিপিতে লালন শাহ্কে মুস্লিম-সন্তান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দুদ্দু শাহ্ লিখেছেন—

দরীবুল্লাহ্ দেওয়ান তাঁর আব্বাজীর নাম।
আমিনা খাতুন মাতা এবে প্রকাশিলাম॥(৫১)

এই উল্লেখ ব্যতীত, লালন শাহ্ মুসলিম-সন্তান ছিলেন—তার অপর প্রমাণ, উক্ত পাণ্ডুলিপিতে বর্ণিত নবদ্বীপের একটি ঘটনা। ভ্রমণ-ব্যপদেশে লালন শাহ্ নবদ্বীপ পৌঁছে।

একদিন যান এক পণ্ডিত সভায়॥
পণ্ডিত মণ্ডলী তাঁরে বিবিধ পুছিল।
সাঁইজি নাম ধাম সকলি বলিল॥
সেবার সময় হইল পণ্ডিত সভার॥
'যবন' বলিয়া দূরে সেবা দেয় তাঁর॥ (৫২)

লালন শাহ্ তাঁদের নিকট 'যবন' অর্থাৎ মুসলিম-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলে পরিচয় দেয়াতেই সাধুবাবাজীরা তাঁকে দূরে আহার্য দান করেন। অতএব এ ঘটনাও প্রমাণ করে যে লালন মুসলিম-সন্তান ছিলেন।

মৎ সংগৃহীত প্রাগুক্ত লালন-পরিচিতি অনুসারেও তিনি মুসলিম-

৫০। মুহম্মদ আবু তালিব, দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত প্রাগুক্ত প্রবন্ধ।

৫১। দুদ্দু শাহ্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১।

৫২। ঐ পৃঃ ২।

সন্তান ছিলেন। পূর্ববংগীয় বাউল সমিতির প্রাক্তন সেক্রেটারী শাহ্ লতিফ আফীআনহু সাহেব জানিয়েছেন, "একটি দানপত্রে গ্রহীতা সাঁইজীর জাতি পরিচয়ে 'মুসলমান' বলে উল্লেখ আছে। উক্ত দানপত্র এখন শুকুর শা'র আস্তানার সংরক্ষক আহ্মদ আলী শা'র নিকট রক্ষিত আছে।" লালন শাহ্ সত্যই যে মুসলিম-সন্তান ছিলেন এবং নিজেকে তিনি সকল ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ের উর্দ্ধে 'বাউল মতবাদী' বলে প্রমাণ করতে চাইলেও ইস্লাম ধর্মের উত্তরাধিকার একেবারে অস্বীকার করতে পারেননি তার প্রমাণ প্রাগুক্ত 'খতনার জাত' উক্তির মধ্যে ও তাঁর স্বরচিত গানের ভণিতা-ব্যবহারের ধারার মধ্যে লুক্কায়িত। এজন্যে তাঁকে প্রচ্ছন্ন মুস্লিম বলা চলে। লালন শাহ স্বীয় জীবনের সকল ঘটনা লোক-সাধারণের অগোচর রেখে, বংশ-পরিচয় গোপন করে এবং কোনো বিশেষ ধর্ম-বর্ণ বা সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট আচার-আচরণ ত্যাগ করেও জন্মগত ইস্লামী ঐতিহ্য ও চিন্তাধারা থেকে সম্পূর্ণ রূপে বিশ্লিষ্ট হতে পারেননি। তাই লালন শাহের রচিত গানের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভণিতা-ব্যবহারের ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—তাঁর অবচেতন-মন ইস্লামী কৃষ্টিকে বরাবরই ধারণ করে ছিল।

ভণিতা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করা আবশ্যক, হিন্দু ও মুস্লিম বাউল ফকীরদের ভণিতা-ব্যবহারের রীতি পৃথক পৃথক। হিন্দু-বাউল পদকর্তাদের ব্যবহৃত ভণিতার সঙ্গে মুসলিম-বাউল পদকর্তাদের ব্যবহৃত ভণিতার তুলনা-মূলক আলোচনা করলেই সে প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন,

১। হিন্দু-বাউল পদকর্তাদের ভণিতা ব্যবহারের ধারা।

ক) পদকর্তার নিজের ব্যবহৃতঃ—

i) গুঁসাই যাদুবিন্দুর তেলো ডুঙ্গা
ডুবে গেল সাঁঝ-বেলায়॥

ii) পাগল বিজয় বলে কর্মফলে
পেয়ে মানব দেহখান ॥

iii) খ্যাপা রসিক বলে বে-এলেমে
হবেনা ফকীরি ॥

খ) শিষ্যের ব্যবহৃত :—

i) প্রেম-অনুরাগ মহানন্দ কয়
এমন শান্তি হরির যুগল মিলন
কে কে দেখবি আয়।
গোঁসাই তারকচাঁদ কয়
এমন সময়
কেবল অশ্বিনীর অলস ভারি ॥

এই পদে শিষ্য অশ্বিনী স্বীয় গুরু তারক (পূর্ণ নাম তারকচন্দ্র কাঁড়াল)-এর উল্লেখ করতে গিয়ে গুরুর নামের পূর্বে সম্মান-সূচক 'গোঁসাই' (গোস্বামী) শব্দের উল্লেখ করেছেন।

২। মুস্‌লিম বাউল পদ-কর্তাদের ভণিতা ব্যবহারের ধারা।

ক) পদকর্তার নিজের ব্যবহৃত :—

i) কয় ফকীর মিয়াজান
আশ্চর্য এ-বিধান
মুনিব যে প্রজা
রাইয়তের হুজুরী ॥

ii) মেছের শাহ্‌ কয় দিন বয়ে যায়
এখনো তোর সময় আছে।

iii) অধীন জহর ভনে ক্ষমা দে রাই মনে
কালো রূপ বিহনে তোর মানে পড়ুক
ছাই।

খ) শিষ্যের ব্যবহৃত :—

i) ময়েজদ্দি ভেবে বলে

আবদুল শা'র চরণ তলে।

ii) দরবেশ জব্বার তাই কয়
হালিম রে তুই পাবি কোথায়
নয় দরজা বন্ধ করে
মুখে লাগাও চাবি ॥

এ দু'টি পদের প্রথমটিতে শিষ্য ময়েজ উদ্দীন তাঁর গুরু আবদুল-এর নামোল্লেখ করতে গিয়ে তৎপূর্বে সম্মান-সূচক 'শাহ্'শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং দ্বিতীয়টিতে শিষ্য-হালিম, গুরু জব্বারের নামোল্লেখ করতে গিয়ে তার পূর্বে সম্ভ্রমপূর্ণ 'দরবেশ' শব্দ যোজনা করেছেন। তাছাড়া লক্ষণীয় যে, হিন্দু-পদকর্তা গুরুর নাম ব্যতীত যে-পদের ভণিতায় শুধু নিজের নামোল্লেখ করেছেন সে-পদে নিজের নামের পূর্বে 'গোঁসাই,' 'পাগল,' 'খ্যাপা' ইত্যাদি বিশেষণ যুক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে এ-সব ক্ষেত্রে মুসলিম পদকর্তাগণ নিজের নামের পূর্বে 'ফকীর,' 'শাহ্' 'অধীন,' প্রভৃতি শব্দ যোগ করেছেন।

হিন্দু ও মুস্‌লিম বাউল পদকর্তাদের এই ভণিতা-ব্যবহারের ধারাটি মৌলিক! এই পরিপ্রেক্ষিতে লালন শাহ্ ও তদীয় শিষ্য দুদ্দু শাহের ভণিতা-ব্যবহারের ধারাটিও লক্ষ্য যোগ্য।

ক) লালন শাহের নিজের ব্যবহৃত ভণিতা :—

i) কেউ তারে জেনেছে দড়
সে খোদার ছোট নবীর বড়
ফকীর লালন বলে নড়চড়
সে-বিনে কূল পাবা না ॥

ii) লালন শাহ্ ফকীরে বলে রে
দয়াল আগে হলাম না।

iii) অধীন লালন কয় নাই ভরসা
প্রেমানলে অংগ গো জ্বলে ॥

খ) শিষ্য দুদ্দু শাহের ব্যবহৃত ভণিতা :—

i) লালন শাহ্ কয় আগম বচন
দুদ্দু সে ভেদ বুঝতে নারে ॥

ii) সারাৎসার জানি সাঁই কাদের গণি
দুদ্দু কয় লালন সাঁইর কৃপাতে ॥

iii) লালন সাঁই দরবেশের বচন
দুদ্দু সে প্রেম জানতে নারে ॥

অতএব ভণিতা-বিশ্লেষণ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, লালন শাহের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার মূলত ইস্‌লামী। যদি তিনি কায়স্থ বা অমুসলিম কোনো বংশে জন্মগ্রহণ করতেন তাহলে ভণিতায় কখনো 'শাহ্' 'ফকীর' প্রভৃতি ইস্‌লামী ঐতিহ্য-সম্মত বিশেষণ প্রয়োগ করতেন না। তাঁর দীর্ঘকালের সংগী এবং প্রিয়তম শিষ্য দুদ্দু শাহ্ও কখনো তাঁকে 'দরবেশ' বলে অভিহিত করতেন না। তাছাড়া, জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা লালন শাহের মূল চিত্রেও দেখা যায় তিনি মুসলমানের ন্যায় গুম্ফ রাখতেন।

অতএব ভণিতা-বিশ্লেষণ, দুদ্দু শাহের বিবরণ, নবদ্বীপের ঘটনা, লালন-পরিচিতির বর্ণনা, দান-পত্রের উল্লেখ, জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অংকিত চিত্রের ইংগিত, সর্বোপরি লালন শাহের স্বরচিত কবিতায় বিধৃত উক্তি থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে—লালন শাহ্ মুসলিম-সন্তান ছিলেন।

তাঁর বংশ-পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম লিখেছেন—"লালনের পিতার নাম কারো মতে দবিরুল্লাহ শাহ্, কারো মতে মলম শাহ্।" (৫৩) মুহম্মদ আবু তালিব সাহেব দুদ্দু শাহের পাণ্ডুলিপির উল্লেখ করে লিখেছেন—'লালনের দাদার

৫৩। অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২।

নাম ছিল দরীবুল্লাহ্ দেওয়ান।" (৫৪) তাঁর উদ্ধৃতি—

গোলাম কাদের তাঁর আব্বাজীর নাম।
আমেনা খাতুন মাতা এবে প্রকাশিলাম ॥(৫৫)

বলা বাহুল্য, তৎপ্রদত্ত উদ্ধৃতি নির্ভুল নয়। কারণ লালন শাহের বংশ-পরিচয় দিতে গিয়ে উক্ত পাণ্ডুলিপিতে দুদ্দু শাহ্ উল্লেখ করেছেন—

গোলাম কাদের হন দাদাজি তাঁহার।
বংশ পরম্পরা বাস হরিষপুর মাঝার ॥
দরীবুল্লাহ্ দেওয়ান তাঁর আব্বাজীর নাম।
আমিনা খাতুন মাতা এবে প্রকাশিলাম ॥(৫৬)

অতএব, গোলাম কাদির, লালন শাহের পিতা নন—পিতামহ। পিতার নাম দরীবুল্লাহ্ দেওয়ান। মাতা—আমিনা খাতুন। লক্ষণীয় যে, এ বিবরণে লালন শাহের বংশগত উপাধি স্পষ্ট নয়। 'দেওয়ান' শব্দটি উক্ত কবিতায় উপাধির দ্যোতক নয়। সম্ভবত লালন শাহের পিতা ছিলেন সাধক ফকীর। এ জন্যে 'দিওয়ানা' বা 'ঐশ্বরিক প্রেমে উন্মাদ' বলে হয়তো তাঁর একটা ব্যাপক পরিচিতি ছিল। লালন বংশ-ধরদের সংগে আলোচনা করে অধ্যাপক আফসার উদ্দীন সেখ লালন শাহের যে বংশ-তালিকা নির্ণয় করেছেন—তাতেও এ-ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি লালন শাহের পিতার নাম দরীবুল্লাহ্ দেওয়ান মেনে নিয়েও অন্য নাম 'তারণ শাহ্' বলে উল্লেখ করেছেন।(৫৭) অতএব একথা স্বীকার করা

৫৪। মুহম্মদ আবু তালিব, প্রাগুক্ত প্রবন্ধ।

৫৫। ঐ।

৫৬। দুদ্দু শাহ্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১।

৫৭। অধ্যাপক আফসার উদ্দীন সেখ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৯।

চলে যে; দুদ্দু শাহ্ হয়তো সেই লোক-প্রদত্ত বিশেষণ 'দেওয়ান' শব্দটিকেই ছন্দের খাতিরে দরীবুল্লাহ্ নামের সংগে যুক্ত করে দিয়েছেন।

এ সন্দেহের অন্যতম কারণ প্রাগুক্ত লালন-পরিচিতিতে লালন শাহের বংশগত উপাধি রূপে 'কাজীর' উল্লেখ। সমস্ত বিবরণটা নিম্নরূপ ঃ—

"শ্রী শ্রী লালন সা ফকীর
সাং হরিশপুর
কলম
জেলা যশোহর
মলম
পিতার নাম মৃত্যু
দেয়নেত্ কাজী
লালন সার পরিবারের নাম
বিসখা
নানা
সশুরের গোলাম সা।(৫৭)ক

এ-বিবৃতি অনুসারে লালন শাহের পিতার নাম 'দেয়নেত্ কাজী'। এই দেয়নেত্ নিশ্চয় দরীবুল্লা'র ডাক নাম। তাহলে তাঁর পিতার নাম কাজী দরীবুল্লাহ্ দেওয়ান। পিতামহের নাম কাজী গোলাম কাদির ও মাতার নাম আমিনা খাতুন। এবং 'কাজী' তাঁদের বংশগত উপাধি।

অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম লালন শাহের অন্যান্য ভাইদের

---

৫৭ ক। এটি মূলের অবিকল অনুলিপি। পত্রটি বর্তমানে বাঙলা একাডেমীতে রক্ষিত আছে।

নামোল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন—'কুলবেড়ে হরিশপুর গ্রামে প্রবীণ ব্যক্তি ও লালনের শিষ্যদের মতানুযায়ী আমরা জানতে পারি যে, লালন শাহের আরো দুই ভাই ছিলেন, তাঁদের একজনের নাম আলম শাহ্, আর একজনের নাম কলম শাহ্। লালনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আলম শাহ্ কলকাতায় শ্রমিকের কাজ করতেন।"(৫৮) উপর্যুদ্ধৃত বিবরণে এ সম্পর্কে কোনো বিস্তৃত তথ্য সন্নিবেশিত হয়নি। তবে বিবরণটির তৃতীয় ও পঞ্চম পংক্তিতে "কলম" ও "মলম" শব্দ দুটি যেভাবে লেখা রয়েছে, তাতে বোঝা যায়, তাঁরা দুই সহোদর। লালন-বংশধর প্রাগুক্ত ক্ষেপুর মা'র সংগে আলোচনা করে অধ্যাপক আফসার উদ্দীন সেখ লালন শাহের যে বংশ-তালিকা নির্ণয় করেছেন তাতে তিনি লালনেরা চার ভাই বলে উল্লেখ করেছেন ; আলম শাহ্, কলম শাহ্, চলম শাহ্ ও লালন শাহ্। এই তালিকায় মলম শাহের কোনো উল্লেখ নেই। তিনি চলম শাহ্ বিয়ে করেননি বলে জানিয়েছেন। চলম শাহ্ সম্পর্কে তিনি আরো জানিয়েছেন— "হরিশপুর নিবাসী সাধক পাঞ্জ শাহের মধ্যম পুত্র জনাব রফিউদ্দিন লালনের পিতার নাম দরিবুল্লাহ্ দেওয়ান লালনের ভাই চলমের অস্তিত্ব অস্বীকার এবং আলম শাহের বংশধর এখনও মুন্সিগঞ্জে জীবিত আছেন বলে আমার কাছে প্রকাশ করেন।" (৫৯) সম্ভবত চলম শাহ্ নামে লালনের কোনো ভাই ছিলনা। এবং আলম শাহের কথা প্রাগুক্ত বিবরণ-দানকারীর জানা ছিল না। তাহলে তাঁরা মোট চারি ভাই ছিলেন—আলম শাহ্, কলম শাহ্, মলম শাহ্, ও লালন শাহ্। এঁদের ভেতর "ক্ষেপুর মা, কলম শাহকে প্রথম ও লালন শাহকে

৫৮। অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২।

৫৯। অধ্যাপক আফসার উদ্দীন সেখ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৯।

দ্বিতীয় পুত্র বলে মনে করেন এবং নিজেকে কলম শাহের বংশধর উল্লেখ করেন। হরিশপুরের সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি জনাব মুন্সি আবদুল আজিজ ক্ষেপুর মাকে আলম শাহের বংশধর, চলম শাহ ও লালন শাহ বিয়ে করেননি এবং কলমের ছেলে-পিলে হয়নি বলে আমাকে বলেন।" অধ্যাপক আফসার উদ্দীন সাহেবের এই বর্ণনা থেকে দেখা যায়—ক্ষেপুর মার ধারণায় লালন শাহ্ পরিবারের দ্বিতীয় সন্তান ছিলেন। কিন্তু তা সত্য নয়। কারণ দুদ্দু শাহের বর্ণনা অনুসারে লালন শাহের অতি শৈশবে পিতৃ-মাতৃ বিয়োগ ঘটে। তাহলে তিনি পরিবারের সর্ব-কনিষ্ঠ সন্তান হিসেবেই বিবেচ্য।

ঘ. শৈশব ও কৈশোর ॥

লালন শাহের বাল্য-জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। দুদ্দু শাহ্ লিখেছেন, তিনি অতি শৈশবে পিতৃ-মাতৃ হারা হয়ে অনাথ হন। উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর জন্মের মাত্র দু'বছর আগে ঐতিহাসিক ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেখা দেয়। সম্ভবত এই মন্বন্তরে আলম ও মলম মৃত্যুমুখে পতিত হন। একমাত্র কলম জীবিত থাকেন। অতঃপর পিতামাতার মৃত্যু হলে লালন জীবিকার জন্যে বাধ্য হয়ে "হরিশপুরের দক্ষিণ পাড়ার ইনু কাজীর বাড়ীতে" (৬০) আশ্রয় নেন এবং গো-রাখালের কার্যে নিযুক্ত হন। একদিন বৈশাখ মাসের এক দুপুরে রাখাল বালক লালন, গরু চরিয়ে এসে যখন রাস্তার পাশে গাছের ছায়ায় বসে শ্রান্তি দূর করছিলেন, সে সময় পাল্কী কাঁধে নিয়ে ঐ পথ দিয়ে গৃহে ফিরছিলেন ঐ গ্রামের-ই শিরাজ শাহ্। রৌদ্র-ক্লান্ত বালকের শুষ্ক-কচি মুখ শিরাজ শাহ্‌কে

৬০। ঐ, পৃঃ ১২০।

আকৃষ্ট ও ব্যথিত করে তোলে। তিনি পাল্কী নামিয়ে বালক লালনের সংগে আলাপ করে তার দুরবস্থার কথা জানতে পারেন। শিরাজ নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি লালনকে তখন পালিত-পুত্র রূপে গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। লালন তাতে সম্মত হলে শিরাজ শাহ্ পরদিন কাজী সাহেবের নিকট থেকে লালনকে পালক পুত্র রূপে গ্রহণ করেন। এই কাজী সাহেব লালনের রক্ত-সম্পর্কে আত্মীয় ছিলেন বলে মনে হয়। কারণ লালনের নিজের বংশগত উপাধিও কাজী।

কিন্তু শিরাজ-লালন সাক্ষাৎকার সম্পর্কে শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন—"সিরাজ নামে এক মুসলমান ফকির ও তাঁহার স্ত্রী লালনকে রোগ-যন্ত্রণায় অজ্ঞান অবস্থায় পথের উপর পড়িয়া থাকিতে দেখেন। তাঁহারা দয়া পরবশ হইয়া লালনকে উঠাইয়া লইয়া সেবা শুশ্রূষার দ্বারা তাঁহাকে নিরাময় করেন...অতঃপর লালন... সিরাজের নিকট হইতে ফকিরি ধর্মে বা বাউল ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।" (৬১) বলা বাহুল্য, শিরাজ-লালন সাক্ষাৎকার প্রসংগে শ্রীভট্টাচার্যের প্রদত্ত বিবরণ সঠিক নয়। কারণ তাঁর মতে লালনের জন্মভূমি ভাঁড়ারা এবং শিরাজ শাহের বাসস্থান—"কুষ্টিয়া অঞ্চলে নয়। ফরিদপুর জেলার কালুখালি স্টেশনের নিকটে কোনো গ্রামে এক সময় তাঁহার বাড়ী ছিল।" (৬২) কুমারখালি নিবাসী শ্রীভোলানাথ মজুমদারের নিকট থেকে তিনি এ তথ্য সংগ্রহ করেন বলে জানিয়েছেন। অন্যপক্ষে, লালন ও শিরাজ শাহের বাসস্থান যশোর জেলার ঝিনেদা মহাকুমায় হরিশপুর গ্রামে বলে যে 'কথা শোনা' যায় সে বিষয়ে তিনি বলেছেন—"বিংশ শতাব্দীর প্রথম

৬১। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮।
৬২। ঐ, পৃঃ ৯।

পদ পর্যন্ত এই মতাবলম্বী (বাউল) বহু মুসলমান ফকিরের আস্তানাই এই গ্রামে বর্তমান দেখিয়াছি। সুতরাং···লালন গুরু সিরাজ সাঁই এর বাস এখানে কল্পনা করা অস্বাভবিক।" (৬৩) এ থেকে ধারণা করা যায়—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে শিরাজ শাহের বাসস্থান ফরিদপুর।

অন্যদিকে শ্রীবসন্তকুমার পাল শিরাজ শাহের বাসস্থান যশোর জেলার ফুলবাড়ী গ্রামে বলে উল্লেখ করেছেন। (৬৪) আর মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন সাহেবের বর্ণনায় তাঁর বাসস্থান ছিল নদীয়া জেলার হরিনারায়ণপুর গ্রামে। (৬৫) শিরাজ-লালন সাক্ষাৎকার প্রসংগে বসন্ত বাবু বলেছেন—লালন শাহ্ হিন্দু ছিলেন। শৈশবে গঙ্গাস্নান শেষে স্বগৃহে ফেরার পথে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। তখন মৃতকল্প লালনকে সৎকার শেষে গঙ্গায় নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু "লীলাময়ের ইচ্ছায় পতিতোদ্ধারিণীর স্নিগ্ধ লহরে অন্ত্যেষ্টিকৃত লালনের অন্তঃসংজ্ঞাশীল দেহ তীরে উঠিয়া পড়ে, এই সময় তাঁহার কণ্ঠ হইতে অস্ফুট স্বর উত্থিত হয়।" তখন তন্তুবায় জাতীয়া এক রমণী তাঁকে দেখতে পান এবং পুরুষদের সহায়তায় তাঁকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তাঁত-ঘরে রেখে শুশ্রুষা করতে থাকেন। এভাবে "লালন যখন তাঁহার জীবনদাত্রী জননীর বস্ত্র-বয়নগৃহে শায়িত, ঘটনাচক্রে সেই সময় এই দরবেশ (শিরাজ শাহ্)-ও পর্যটন করিতে করিতে এই গ্রামে আসিয়া লালনের বৃত্তান্ত শুনিতে পান এবং অচিরে তাঁহার রোগ-শয্যার পার্শ্বে আসিয়া সমাসীন হন।"(৬৬)

৬৩। ঐ, পৃঃ ৯-১০।

৬৪। বসন্তকুমার পাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০০।

৬৫। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, বা. সা. মু. সা. , পৃঃ ১৯।

৬৬। বসন্তকুমার পাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০০।

মোটামুটি এই বক্তব্যই "মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, (৬৭) আনিসু-জ্জামান (৬৮) প্রভৃতি গ্রন্থকার স্বীকার করে নিয়েছেন। এ সম্পর্কে অধ্যাপক আফসার উদ্দীন সাহেব কিছু নতুন কথা বলেছেন। তাঁর বর্ণনা থেকে জানা যায়—"লালন হরিশপুরের দক্ষিণ পাড়ার ইনু কাজীর বাড়ীতে থাকতেন ও তাঁদের গরু চরাতেন। একদিন তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হন। কি একটি কারণে সেই বাড়ীর লোকজনের উপর রাগ করে লালন সাবের আলী খাঁ নামক অন্য এক ব্যক্তির বাড়ীতে আশ্রয় নেন। সেই রাতেই লালনের গায়ে বসন্ত ফুটে বার হয়। তারপর সাবের আলীর বাড়ীর লোকজন বসন্তের ভয়ে লালনকে বাটিকামারা বিলের থানার ঘাটে রেখে আসেন। এখান দিয়ে শিরাজ শাহ্ নামক জনৈক পাল্কী বেহারার স্ত্রী দৈনিক থানার ঘাটে পানি আনতে যেতেন। যন্ত্রণাকাতর লালনকে দেখে বাড়ী ফিরে সিরাজ-পত্নী স্বামীকে সংবাদ দেন। তারপর লালনকে সিরাজের বাড়ীতে আনা হয় এবং সেখানেই সিরাজ-পত্নীর যত্নে লালন ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেন। এই সময়ে লালনের বয়স ১৭/১৮ বছর ছিল।" (৬৯) অধ্যাপক আফসার উদ্দীন সাহেব এ-তথ্য কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন তার কোনো উল্লেখ করেননি। কাজেই মনে হয়, জনশ্রুতির উপর নির্ভর করেই তিনি এ কাহিনী পরিবেশন করেছেন।

কিন্তু দুদ্দু শাহের স্বহস্ত লিখিত বিবরণের সংগে এ দু'টি কাহিনীর একটিরও মিল নেই। প্রথমত, লালন শাহের ন্যায় শিরাজ

৬৭। মুহম্মদ মনসুর উদ্‌দীন, মুহম্মদ কামালউদ্দীন সংকলিত লালন গীতিকা-১ম খণ্ড (ঢাকা-১৯৬২), ভূমিকা পৃষ্ঠা ৯।

৬৮। আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০২।

৬৯। অধ্যাপক আফসার উদ্দিন সেখ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২০।

শাহ্‌ও যে হরিশপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন—একথা তিনি সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন—

কুলবাড়ী হরিষপুরে সিরাজ সা-'র বাস।
পাল্কী টানিয়া করে জীবিকা অন্বায। (৭০)

"...পরবর্তীকালে লিখিত মৌলবী আবদুল ওয়ালী সাহেবের প্রবন্ধেও এই তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন—"... Both (Lalan Shah & Siraj Shah) were born at the village Horispur, sub-division Jhenedah, District Jessore." (৭১) অতএব শিরাজ শাহ্‌ও লালন শাহের জন্মস্থান যে একই গ্রামে একথা সত্য। দুদ্দু শাহ্‌ লালনের বসন্ত রোগে আক্রান্ত হওয়া সম্পর্কে সঠিক তথ্য নির্দেশ করতে পারেননি। তবে লালন শাহ্‌ যে বাল্যকালে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হননি একথা স্পষ্ট রূপেই ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, ৪৩ বছর বয়সে লালন শাহ্‌ খেঁতুরীর মেলায় গমন করার পর, প্রত্যাবর্তনকালে রোগাক্রান্ত হন। এবং বাল্যকালে তিনি সাধক শিরাজ শাহের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন। দীর্ঘ ২৬ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি এঁরই গৃহে অবস্থান করেন। এই বর্ণনা সম্পর্কে সন্দেহ করার কিছু নেই। কারণ এসব ঘটনা তিনি লালন শাহের নিজের মুখ থেকে গোপনে শুনেছেন বলে দাবি করেছেন।

যাহোক, দুদ্দু শাহ্‌ লিখেছেন—

শিশু কালে সাইজিরে তাঁরা (পিতামাতা) ছাড়ি গেল
অনাথ হইল চাঁদ বিধাতার খেলা॥
এমনি নিদান কালে বৈশাখ মাসেতে,

৭০। দুদ্দু শাহ্‌, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২।
৭১। Maulavi Abdul Wali. Ibid. p. 217.

আনমনে একাকী সে রহে বসে পথে।
সাইজির লীলাখেলা কে বুঝিতে পারে
সিরাজ সা দরবেশে দেখে নিল তারে ঘরে ॥ (৭২)

অতঃপর উপযুক্ত বয়সে তিনি তাঁকে মক্তবে বিদ্যাশিক্ষার জন্য ভর্তি করে দেন।

দুদ্দু শাহ্ অবশ্য এ সম্পর্কে কিছু বলেননি। অধিকাংশ ফকীরের ধারণা লালন নিরক্ষর ছিলেন। এ বিষয়ে উপন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন—"হিতকরী পত্রিকাতেও ঐরূও সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। লালনের গানগুলির মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মশাস্ত্রের যে জ্ঞান, মতবাদের উপর যে অবিচলিত নিষ্ঠা, যে সত্যদৃষ্টি ও কবিত্বশক্তি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা দেখিলে লালনকে নিরক্ষর ভাবিতে মন কুণ্ঠিত হয়।...তিনি যে নিরক্ষর ছিলেন, এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে কোনো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ নাই।" (৭৩) কিন্তু তিনি যে শিক্ষিত ছিলেন তাঁর স্বপক্ষেও উপেন্দ্রনাথ বাবু কোনো প্রমাণ দিতে পারেননি। অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম বলেছেন—"লালন ফকির শিক্ষিত ছিলেন না। তবে আরবী ভাষায় তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। কোরান শরীফের উপর তাঁর বেশ দখল ছিল।...বাংলায় তাঁর সামান্য জ্ঞান ছিল বলে ভাষার উপর তত দখল আসেনি।" (৭৪) লালন-গীতির ভাষা-ব্যবহার তথা শব্দ-সম্পদ ও ধ্বনি-মাধুর্য এবং প্রয়োগ-নৈপুণ্য সম্পর্কে করিম সাহেবের মন্তব্য সঠিক নয়। লালন-গীতির বিকৃত-পাঠ সম্পর্কে উপর্যুক্ত মন্তব্য সত্য হতে পারে, কিন্তু তার প্রকৃত পাঠ-বিচারে একথা কিছুতেই বলা চলেনা, ভাষার

৭২। দুদ্দু, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১-২।

৭৩।শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮

৭৪। আনোয়ারুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮।

উপর তাঁর দখল ছিল না। আর তাই এ মন্তব্যও এই কারণে সত্য হতে পারেনা—যে, লালন নিরক্ষর ছিলেন।

লালন শাহ্ নিজে পুঁথিগত বিদ্যা অপেক্ষা প্রকৃতি থেকে শিক্ষা গ্রহণই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন! তাই তিনি বলেছেন—

"এল্‌মে লা-ছুন্নি" হয় যার
সর্ব ভেদে মালুম হয় তার
লালন বলে ছটাকে মোল্লার
ছট্‌ফটি মিছে।

আবার দুদ্দু শাহের বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি যখন মলম শাহের কোরান পাঠে-ভুল নির্দেশ করেছিলেন, তখন—

শুনিয়া মলম ভাই পুলকিত ভারি।
মিষ্ট বচনে তবে তাহারে শুধায়
কি করে জানিলে তুমি পাঠে ভ্রান্তি হয়।
এত শুনি সাই তারে বুঝাইয়া দিল
'নাহি জানি লেখা পড়া'-ইহাই বলিল।
দয়াল মুরশীদ মোরে "লা-দুন্নি"র জ্ঞান,
কিঞ্চিৎ দিয়াছে তায় করিনু বয়ান।...(৭৫)

এখানেও লালন শাহ্ আত্মপ্রকাশ করেননি। দুদ্দু শাহের বর্ণনাও লালন শাহের অক্ষর জ্ঞানের উপর কোনো প্রত্যক্ষ আলোকপাত করেনা। তবে উদ্ধৃতি থেকে এ কথা বোঝা যায়—তিনি তখন (এ সময় লালনের বয়স চল্লিশের উর্ধ্বে) উত্তম রূপে আরবী ভাষা জানতেন। 'সহি' করে কোরান শরীফ পাঠ করতে পারতেন। ভাষাজ্ঞান তাঁর প্রখর না থাকলে নিশ্চয় ভুলপাঠের কারণ-নির্দেশ করতে পারতেন না।

৭৫। দুদ্দু শাহ্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪

এ ছাড়া দুদ্দু শাহের রচনার আরম্ভে আছে—

ধন্য ধন্য মহামানুষ দয়াল লালন সাই
পতিত জনার বন্ধু তাঁর গুণ গাই
জাতি ধর্ম্ম শাস্ত্র আদি মীমাংসা করিয়া
নবসত্য প্রকাশিল মানব লাগিয়া। (৭৬)

লক্ষণীয়, যে, এখানে শাস্ত্রাদি আলোচনা বা "মীমাংসা"-(বিশ্লেষণ ?) র কথা আছে। অশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে নিশ্চয় শাস্ত্র-বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। বিভিন্ন ভাষা ভালভাবে পড়তে, লিখতে ও বুঝতে না পারলে শুধুমাত্র অক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও নানা শাস্ত্রের তুলনামূলক বিচার সম্ভব হতে পারেনা। কাজেই লালন শাহ্ যে শিক্ষিত ছিলেন—তার একটা প্রচ্ছন্ন স্বীকৃতি উপর্যুক্ত পংক্তিতে বিদ্যমান—এ ধারণা অযৌক্তিক নয়।

লালন শাহের কবিতাতেও একটি শিক্ষিত ও কর্ষিত কবিমনের পরিচয় পরিস্ফুট। তাঁর কবিতায় বাঙ্লা, আরবী, ফারসী শব্দ এবং বাক্যাংশের নিখুঁত বিন্যাস ও সুস্থ যোজনা এই প্রতীতিকেই প্রমাণ করে।

তুলনামূলক বিচারে দেখা যায়—লালন শাহ্ ও পাগলা কানাই সমসাময়িক এবং প্রায় একই রকম প্রতিভার অধিকারী। কিন্তু পাগলা কানাইয়ের কবিতার শব্দ-চয়ন ও লালন শাহের কবিতার শব্দ-চয়নে পার্থক্য অনেক। পাগলা কানাই এর কবিতায় প্রচুর অসংস্কৃত, আঞ্চলিক, গেঁয়ো, দেশজ শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন—"আলো" (এলো অর্থে), "পাতাম" (পেতাম অর্থে), "খাঁড়ায়" (দাঁড়িয়ে অর্থে), "টানেটুনে" (টানাটানি করা অর্থে), "চাম" (চর্ম অর্থে), "ছাওয়াল" (সন্তান অর্থে),

৭৬। ঐ, পৃঃ ১

"ছ্যাম্‌ড়া" (ছোঁড়া বা ছোট ছেলে অর্থে) ইত্যাদি। কিন্তু শব্দ চয়নের এই কৃশরূপ, লালন শাহের কবিতায় বিরল। বরং এমন এমন শব্দ, বাক্যাংশ, উপমা ও রূপকের সন্ধান মেলে—যা তাঁর সুগভীর ভাষাজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। তিনি তাঁর কবিতায় অবলীলাক্রমে সন্ধি, সমাস, নামধাতু ইত্যাদির ব্যবহার করেছেন। কিন্তু কোথাও তা অপপ্রয়োগে পরিণত হয়নি। যেমন—

ক) সন্ধি ঃ—এক একেশ্বর সৃষ্টি করে। হৃদাকাশে উদয় হবে। মনাতীত অধরে চিনতে। বাগীন্দ্রিয় না সম্ভবে। যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র আদি/যোগ সাধিয়েও পায়না নিধি। গোপী ভাবাশ্রিত ইত্যাদি।

খ) সমাস ঃ—মানুষ-গুরু নিষ্ঠা যার। ভাষা-বাক্যে নাহি পারে। গুরু-নিষ্ঠ যারা। বসে থাকো ভাব-ত্রিবেণী।

গ) নামধাতু ঃ—মনের ভাব প্রকাশিতে। সব শিখে চমৎকারা। যাতে উদর শুধরে পতি। ইত্যাদি।

তাছাড়া, শুধুমাত্র বিভিন্ন ধর্ম-শাস্ত্র-সম্পর্কেই তিনি গভীর ভাবে অবহিত ছিলেন না। সেই সংগে ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, ভূগোল, খগোল, আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতি, পৃথিবীর গোলত্ব ইত্যাদি সম্পর্কেও তাঁর যথার্থ ধারণার প্রকাশ লালন শাহের কবিতায় ছড়িয়ে আছে। যেমন…

> সুধাইলে খুদার কথা
> দেখায় সবাই আসমানে।
> আছেন কোথায় স্বর্গপুরে
> কেউ নাহি তার ভেদ জানে॥
>
> পৃথিবী গোলাকার শুনি
> অহর্নিশি ঘোরে আপনি

তাইতে হয় দিবস-রজনী
জ্ঞানীগণে তাহাই মানে॥

ঊর্দ্ধ দিকে নিশি হলে
অধঃ দিকে দিবা বলে
আকাশ তো দেখে সকলে
ঊর্দ্ধ অধেঃর মানুষ গনে॥···

তাছাড়া আরবী ভাষায় বলে আল্লা
ফারসীতে হয় খোদাতা'লা
গড, বলিছে যিশুর চ্যালা
ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভাবে॥···

৩

অথবা, আগমে-নিগমে তাই কয়
গুরু রূপে দীন দয়াময়
অসময়ে সখা তার হয়
সত্য করে যে তায় ভজিবে।

৪

কিংবা, আদিকালে আদমগণ
নানান জায়গায় করত ভ্রমণ
ভিন্ন আচার, ভিন্ন বিচার
তাইতে সৃষ্টি হয়॥
জ্ঞানী দিগ্বিজয়ী হোল

নানারূপ সব দেখতে পেল
এরূপে জাতির পরিচয় ॥
খগোল ভূগোল নাহি জানত
যার যার কথা সেই বলিত
লালন বলে কলিকালে জাত বাঁচানো দায় ॥

এসব কবিতায় নিশ্চিতরূপেই লালন শাহের একটি বিদগ্ধ মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

এ রকম পরোক্ষ প্রমাণ ব্যতীত লালন শাহ্ যে যথার্থ শিক্ষিত ছিলেন, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণও বিদ্যমান। শাহ্ লতীফ আফী-আন্-হু বলেছেন—'সম্প্রতি "লালন শাহ্" নাম স্বাক্ষরিত একখানি দলিল পাওয়া গেছে। বাউল কবি মনিরুদ্দীন শাহ (লালন-শিষ্য) বলেছেন—তিনি লালন শাহের নিকট তুলট কাগজে লেখা কিছু খাতাপত্র দেখেছিলেন। সেগুলো তাঁর নিজের হাতের লেখা। মৃত্যুর কিছু পূর্বে একদিন লালন শাহ্ উক্ত খাতাসমূহ কালী গংগায় ফেলে দেন। তৎপর তিনি (মনিরুদ্দীন শাহ্) অনেক খুঁজে সে-খাতাগুলোর মধ্যে একখানি খাতা অর্ধ-বিগলিত অবস্থায় পেয়ে নিয়ে আসেন। কিছুদিন পর তাঁর নিজেরও ভাবান্তরে তিনি উক্ত খাতাটি আবার নদীতে নিক্ষেপ করে আসেন'।

ছেঁউড়িয়াতে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করার পর লালন দীর্ঘদিন আয়ুর্বেদী মতে চিকিৎসা করতেন। তখনো তাঁর খ্যাতি সুবিস্তৃত হয়নি। এ সময় থেকে বহু বছর তিনি এই চিকিৎসা চালিয়ে গিয়েছেন। ফলে তাঁর নিকট অনেক নিদানের কবিরাজী চিকিৎসা গ্রন্থ ছিল। চিকিৎসা-বিদ্যা বিষয়ে তাঁর নিজের লেখা কিছু খাতাপত্রও ছিল। এগুলো তিনি প্রয়োজন মত অধ্যয়ন করতেন।

এসব কারণে অনুমান করা যায়—বাল্যবয়সে শিরাজ শাহের আশ্রয়ে থাকা কালে তিনি স্বগ্রাম বা নিকটবর্তী কোনো গ্রামের মক্তব থেকে ভাল ভাবে আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন।

বাঙলা ভাষার সংগেও তিনি এই মক্তব থেকেই পরিচিত হন। তখন মক্তবে বাঙলা ভাষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হোত না বলে—বাল্যকালে তিনি বাঙলা ভাষা যথেষ্ট সুন্দর রূপে শিখতে পারেননি। এই অভাবটি পূর্ণ হয় তাঁর নবদ্বীপ বাসকালে। তিনি দীর্ঘ সাত বছর অবস্থান করেন এবং এখানেই বাঙলা ভাষা উত্তম রূপে আয়ত্ত করেন। পুঁথিগত, ব্যাকরণ শাসিত বিদ্যা হয়তো তাঁর প্রচুর ছিলনা। কিন্তু লালন শাহের কবিতায় তেমন স্বল্প ভাষাজ্ঞানেরও কোনো পরিচয় নেই। নবদ্বীপের নানা শ্রেণীর পণ্ডিতদের সাহচর্য তাঁর ভাষা-শিক্ষা ও জ্ঞান-চর্চার সহায়ক হয়েছিল। এ জ্ঞান তিনি অর্জ্জন করেছেন—প্রবাস-জীবনে, সাধক-পথে, গণ-সংযোগে। একেই তিনি "লা-ত্নিুর জ্ঞান" বলেছেন। লালন শাহ তাই হয়তো যথেষ্ট শিক্ষিত ছিলেন না, কিন্তু যথোপযুক্ত শিক্ষিত ছিলেন। আর এ শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল শৈশবেই।

শিরাজ শাহের অবস্থা খুব স্বচ্ছল ছিল না। তিনি লালনের উচ্চ-শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেননি। হয়তো তখন তা' সম্ভবও ছিল না। শিরাজ শাহ দরিদ্র পাল্কী-বাহক ছিলেন। পাল্কী বহন করে উপার্জিত আয় দ্বারা তিনি সংসার যাত্রা নির্বাহ করতেন। ফলে, লালনের উচ্চ-শিক্ষা দানের খরচ সংগ্রহ করার সামর্থ তাঁর ছিল না। তা'ছাড়া, উচ্চশিক্ষা লাভের উপযোগী শিক্ষায়তনও নিকটবর্ত্তী কোথাও ছিল না। বিদেশে গিয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করাও তাই লালনের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

মাদ্রাসা-শিক্ষা সমাপ্ত হলেই শিরাজ শাহ কিশোর লালনকে ফকীরি-তত্ত্বে দীক্ষা দান করেন। লালনও গুরুর নিকটতম সংস্পর্শে থেকে ক্রমে ক্রমে উক্ত তত্ত্বের পাকা বোদ্ধা রূপে গড়ে উঠেন।

মৃত্যুর পূর্বে শিরাজ শাহ তাঁর গুরু আমানত উল্যা শাহের খিলকা-ঝোলা লালনকে অর্পণ করেন এবং সাধন-তত্ত্ব সম্পর্কে

অছিয়ৎ করে যান। তাঁদের-স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যুর পর "ফাতেহা" (মৃতের কল্যাণার্থে শেষ করণীয়) শেষ করে লালনকে দেশ-ভ্রমণের নির্দেশ দান করেন। অতঃপর লালনের ২৬ বছর বয়সে ১২০৫ সালে (ইং ১৭৯৮ খ্রী) শিরাজ-দম্পতি একই দিনে পরলোক গমন করেন। লালন শাহ্ গুরু ও গুরু-পত্নীর মৃত্যুর পর কয়েকদিন হরিশপুরে অবস্থান করে তাঁদের ফাতেহা শেষ করেন। তারপর গুরু-প্রদত্ত 'খিলকা-ঝোলা' এবং 'আশা' গ্রহণ করে নবদ্বীপ অভিমুখে রওনা হন।

ঙ. দেশ-ভ্রমণ ॥

লালন শাহ্ নবদ্বীপ পৌঁছলে—

"পদ্মাবতী নামে এক বিধবা রমণী
নিজাবাসে লয়ে গেল সেহি-ক্ষত্র-ধনি ॥" (৭৭)

এই "ক্ষত্র-রমণী" পদ্মাবতীকেই পরবর্তীকালে লালন শাহ 'মা' বলতেন। ফলে জনশ্রুতিতে পদ্মাবতীই লালন শাহের গর্ভধারিণী রূপে পরিচিতা। আর লোক-বিশ্বাসকেই তথ্য-নির্বাচনে অগ্রাধিকার দেবার জন্যে—লালন-জীবনী রচনা করতে গিয়ে পদ্মাবতীকে লালন শাহের গর্ভধারিণী রূপে স্থির বিশ্বাস করে বসন্তকুমার পাল, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন প্রভৃতি পণ্ডিত ভুল করেছেন।

নবদ্বীপে এই পদ্মাবতীর গৃহে লালন শাহ দীর্ঘ সাত বছর অতিবাহিত করেন। এখানে আগমনের পর একদিন তিনি এক সাধু-সম্মেলনে যোগদান করেন। সাধু-পণ্ডিতগণ নবাগত লালন শাহের পরিচয় গ্রহণ করে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন। লালন শাহ সে-সব প্রশ্নের যথাযোগ্য জবাব দান করে সবাইকে চমৎকৃত করেন।

৭৭। দুদ্দু শাহ্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২।

যুবক লালনের প্রজ্ঞা, শাস্ত্রজ্ঞান ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁরা মুগ্ধ হন।

অতঃপর সাধুবাবাজীদের 'সেবার' (আহারের) সময় উপস্থিত হয়। সাধুরা তখন, লালন শাহ নিজেকে মুসলমান বল্লে পরিচয় দেয়ায়, তাঁকে দূরে পৃথক ভাবে অন্ন পরিবেশন করেন। আহার্য গ্রহণ করতে বসে তাঁরা গভীরতম বিস্ময়ের সংগে লক্ষ্য করেন যে, তাঁদের সংগে, প্রতি দু'জনের মধ্যে একজন করে লালন বসে আহার্য ভক্ষণ করছেন। এ ব্যাপার দেখে—

"তখনি সকলে মিলি গৌরধ্বনি করে।
করজোড়ে নত শিরে দু'টি পদ ধরে।
মিনতি করিয়া কাঁদে, দয়াল গোঁসাই।
মোদের ছলিতে এলে মোরা বুঝি নাই॥
ক্ষমা কর দীনবন্ধু পাতকী জনারে।
গড়াগড়ি যায় আর এমত ফুকারে॥" (৭৮)

তখন লালন তাঁদের—

"বিভিন্নতা করিও না জাতি-ধর্ম্ম ব'লে (৭৯)

এই উপদেশ দান করে প্রস্থান করেন। ঘটনা হিসেবে বর্ণনীয় বিষয়ের আধুনিক মূল্য অকিঞ্চিৎকর। কারণ ঘটনাটি অলৌকিক। অতএব, অবিশ্বাস্য কিংবা রূপক। কিন্তু সম্প্রদায়িকতার পটক্ষেপে লালন জীবনীর একটি তিক্ত অভিজ্ঞতাই ঘটনাটির মূল উপজীব্য। এই ঘটনার পর তিনি ধর্ম্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ের ভেদাভেদের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে অভিযান শুরু করেন। মানুষে-মানুষে সমদর্শিতা তাঁর সংকীর্ণতাদুষ্ট ছিলনা। ফলে তিনি নিজেকেও জীবনে আর কখনো

৭৮। দুদ্দু শাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২।
৭৯। ঐ, পৃঃ ৩।

কোনো ধর্ম-বর্ণ-গোত্রভুক্ত বলে প্রকাশ্যে পরিচয় দান করেননি। পূর্বে উদ্ধৃত জাতি-পরিচয় সম্পর্কে রচিত তাঁর গানে যে, তিক্ত, বিতৃষ্ণ, ব্যঙ্গপ্রবণ ও ক্রুদ্ধ মনের পরিচয় পাওয়া যায়, তার মূল, নবদ্বীপের এই ঘটনায় প্রোথিত।

লালন শাহ নবদ্বীপে বিভিন্ন শাক্ত, বৈষ্ণব, যোগী এবং তান্ত্রিক সাধু-সন্ন্যাসীদের ঘনিষ্ট সংস্পর্শ লাভ করেন। এখানে অবস্থানকালেই তিনি ভারতীয় ধ্যান-ধারণার সুপ্রাচীন লৌকিক মতবাদ 'তন্ত্র' সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তন্ত্রের সাধন-প্রণালী, পঞ্চ-রসিক এবং ষড়-গোস্বামী যাজিত বৈষ্ণব সহজিয়া সাধন-প্রণালী, শাক্ত-সাধনা, পন্থা সম্পর্কেও যথাযথ ভাবে অবহিত হন। বেদান্ত ও বৈশেষিক দর্শন, বৌদ্ধ নিরীশ্বরবাদ, কপিলের সাংখ্য মতবাদ প্রভৃতি বিষয়েও তিনি এইখানে বসে জ্ঞান লাভ করেন। পরবর্তীকালে প্রচারিত তাঁর নব্য বাউলমতবাদের উপর এসবের গভীরতর প্রভাব তাই লক্ষণীয়। তিনি কপিলের পুরুষ-প্রকৃতি-তত্ত্বকে সুফীবাদী চিন্তাধারার আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন।

নবদ্বীপে সাত বছর অতিবাহিত করে ১২১২ সালে (ইং ১৮০৫) লালন ব্যাপক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে স্থান ত্যাগ করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি কাশী, বৃন্দাবন পুরী প্রভৃতি হিন্দুদের বিখ্যাত ভারতীয় তীর্থ সমূহ পরিভ্রমণ করে মধ্য এশিয়ায় যাত্রা করেন। শোনা যায়, পায়ে হেঁটে তিনি মক্কা নগরীতেও গমন করেন। ভারতের দিল্লী লক্ষ্মৌ এবং মধ্য এশিয়ায় অবস্থান কালে লালন ইস্‌লামের অধ্যাত্মবাদ—তাসাউফ, বিশেষ করে সুফী মতবাদ ও সাধন-প্রণালী এবং মুতাযিলা দর্শন সম্পর্কে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তাই তাঁর মতবাদ ও সাধনায় এসবের গভীর প্রভাব সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

বিভিন্ন স্থানে এভাবে সুদীর্ঘ দশ বছর ভ্রমণ করার পর অবশেষে ১২২২ সালে (ইং ১৮১৫ খৃঃ) তিনি নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করেন। এবং ঐ বছর মাঘ মাসে তিনি খেঁতুরীর মেলায় যোগদান করতে

পদব্রজে রওনা হন। লালন শাহ তখনও তাঁর নিজস্ব মতবাদ প্রচারকর্মে আত্মনিয়োগ করেননি। ফলে কেউ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেনি। এমতাবস্থায় একাকীই তিনি খেঁতুরী যাত্রা করেন।

চ. ছেঁউড়িয়ায় আগমন

খেঁতুরী-ভ্রমণ লালন-জীবনীর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কারণ এই ভ্রমণের সংগেই তাঁর বসন্তরোগ. মলম শাহের সাথে সাক্ষাৎ ও কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়াতে আখড়া নির্মাণের ঘটনা জড়িত।

লালনের বসন্তরোগে আক্রান্ত হওয়া সম্পর্কে শ্রী বসন্তকুমার পাল বলেছেন, "সাঁইজী...দাস বংশের বাউলদাস নামক কোনো প্রতিবেশীর সহিত সহরে গঙ্গাস্নানে যাত্রা করেন। ...গঙ্গাস্নান সমাপণ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কালে বসন্তরোগে গুরুতর রূপে আক্রান্ত হন। ...দুরন্ত ব্যাধির প্রকোপে তিনি মৃতবৎ অসাড় হইয়া পড়েন। সঙ্গীগণ তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া যথাবিহিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া মুখাগ্নি দ্বারা গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।"(৮০) বর্ণনাটি যে কাল্পনিক অথবা জনশ্রুতি নির্ভর তা সহজেই ধারণা করা যায়। কারণ পূর্বালোচনায় দেখা গিয়েছে লালন শাহ নিশ্চিত রূপেই মুসলিম সন্তান। অতএব, বসন্ত রোগে মৃত্যু হলেও মুখাগ্নি করার কোনো প্রশ্নই উঠেনা। সর্বোপরি, বসন্তবাবু এই ঘটনাকে লালন শাহের বাল্য-জীবনের ঘটনা বলে নির্দেশ করেছেন। আর তাঁর মতে লালন শাহের জন্মভূমি কুষ্টিয়া। প্রকৃত পক্ষ লালনের শৈশবে ও কৈশোর যশোর জেলার হরিশপুর গ্রামে অতিবাহিত হওয়ায় তাঁর পক্ষে কুষ্টিয়ার

৮০। শ্রী বসন্তকুমার পাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯৮

কোনো দাস বংশের কোনো ব্যক্তির সংগে গঙ্গা স্নানে গমন করা সম্ভব নয়।

শ্রীবসন্তকুমার পালের উপর্যুক্ত বক্তব্যের সংগে মুহম্মদ মনসুর-উদ্‌দীনের বর্ণনার বিশেষ পার্থক্য নেই। তিনি শুধু বাউলদাসের পরিবর্তে "মাতৃসঙ্গে" গঙ্গাস্নানে যাত্রা করার কথা উল্লেখ করেছেন।" ৮১) তথ্যপ্রাপ্তির উৎস নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন "কথিত আছে"। কিন্তু কথিত তথ্যটি যে ভুল তা পূর্ব-আলোচনাতেই স্পষ্ট বোঝা যায়। জনশ্রুতির উপর ভিত্তি করে শ্রী উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যও বলেছেন—"প্রথম যৌবনে তিনি (লালন) হিন্দুদের অন্যতম বিখ্যাত তীর্থ শ্রীক্ষেত্রে যান···কিন্তু পথের মধ্যে তিনি বসন্ত-রোগে আক্রান্ত হন।"(৮২) কিন্তু দুদ্দু শাহের পাণ্ডুলিপিতে বলা হয়েছে—১২২২ সালে লালন শাহ খেঁতুরীর মেলায় যোগদান করেন। অতঃপর মেলা থেকে প্রত্যাবর্তন কালে—

······নৌকাযোগে ভ্রমণ কারণ
দক্ষিণ-পূর্ব দেশে করিলেন গমন॥
কি জানি কেমনে তিনি বসন্ত ব্যাধিতে
আক্রান্ত হইলে তাঁরে, ফেলায় নদীতে।
ভক্তবৃন্দ নাহি ছিল সঙ্গেতে তাঁহার।
মাঝিগণ ফেলে তাঁরে দরিয়া মাঝার॥(৮৩)

অর্থাৎ কখন এবং কিভাবে লালন শাহ বসন্ত কবলিত হন, তা দুদ্দু শাহও যথার্থ বলতে পারেন না। তবে খেঁতুরী থেকে ফিরে আসার সময়-ই তিনি রোগাক্রান্ত হন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ

৮১। মুহম্মদ মনসুরউদ্‌দীন, বা. সা. মু. সা., পৃ ১৮।
৮২। শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ ৮।
৮৩। দুদ্দু শাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩।

নেই। ধারণা করা যায়, বসন্তের পূর্ব-লক্ষণ সমূহ খেঁতুরী অবস্থান-কালেই প্রকাশ পায়। লালন শাহের পক্ষে তখন পদব্রজে গমন করা অসম্ভব মনে হওয়ায় তিনি ভাড়াটিয়া নৌকায় গড়াই-এর শাখা কালীগঙ্গা নদী দিয়ে কুষ্টিয়া অভিমুখে রওনা হন। 'পথিমধ্যে রোগের বিশেষ বাড়াবাড়ি ঘটে। তখন ভীত মাঝি-মাল্লারা তাঁকে অজ্ঞান-অবস্থায় রাত্রিকালে এক নদীর ঘাটে ফেলে রেখে চলে যায়।

দুদ্দু শাহ্ যদিও তাঁকে 'নদীর মধ্যে'ই ফেলে দেবার কথা লিখেছেন, তথাপি তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। নদীতে নিক্ষেপ-করলে মৃত-প্রায় মানবদেহ ভেসে এসে একটা ঘাটে লাগতে পারেনা। অথচ তিনি তা-ই বলেছেন। লালন শাহকে মাঝিরা লোকালয়ের নিকটে কোনো ঘাটে ফেলে রেখে যায়—এ-কথাই যুক্তিসংগত।

যাহোক, কালীগঙ্গাতীরস্থ এই স্থানটি ছেঁউড়িয়া। এই ছেঁউড়িয়া গ্রামেরই মলম বিশ্বাস কারিকর নামক এক ব্যক্তির ঘাটে তিনি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে থাকেন। সকাল বেলায় মলম বিশ্বাস স্নান করতে এসে মুমূর্ষু লালনকে নদীর কূলে পড়ে থাকতে দেখেন। সম্ভবত তখন তাঁর দেহের কিছু অংশ পানির মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। এ ব্যাপারটিই হয়তো তাঁর "অন্তর্জলি"র কথায় কিংবা 'ভেসে এসে ঘাটে লাগা'র কথায় জনশ্রুতিতে বেঁচে আছে।

তখনো লালনের দেহে জীবনের লক্ষণ অবশিষ্ট ছিল। ফলে, করুণাপরবশ হয়ে মলম বিশ্বাস তাঁকে সযত্নে তুলে আপন গৃহে নিয়ে যান। এবং

দুগ্ধ আদি নানা পথ্য দিয়া সেবা করে॥
এইরূপে একমাস গুজারিয়া যায়।
ব্যাধি মুক্ত হন তিনি খোদার কৃপায়॥ ৮৪

৮৪। দুদ্দু শাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ ৩।

কিন্তু লালন শাহের ছেঁউড়িয়ায় আগমন ও মলম বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম লিখেছেন—"কুষ্টিয়ায় ছেঁউড়িয়াতে সিরাজ সাঁই-এর কোনো আখড়া ছিল না। অবশ্য এই অঞ্চলের মলম শাহ্ কারিগর নামে এক ব্যক্তি সিরাজ সাঁই-এর শিষ্য ছিলেন। লালনের প্রতি তাঁর অদ্ভুত টান এসে যায়। তিনি সিরাজ সাঁইকে এই মর্মে অনুরোধ করেন যে, ছেঁউড়িয়াতে আখড়া করে লালনকে সেখানকার দায়িত্বভার দান করা হোক। সিরাজ সাঁই মলম শাহ্ কারিগরের অন্তরের ইচ্ছা বুঝতে সক্ষম হন। এবং লালন শাহ্‌কে ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় প্রেরণ করেন। সেই অবধি লালন শাহ্ ছেঁউড়িয়াতে বসবাস করতে থাকেন।" (৮৫) এ তথ্যের তিনি উৎস নির্দেশ করেননি।

বলা বাহুল্য, তথ্যটি নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ প্রথমতঃ মলম শাহ্ সিরাজ শাহের শিষ্য ছিলেন না; তিনি ছিলেন লালন শাহের প্রথম শিষ্য। দ্বিতীয়ত সিরাজ শাহ্ লালনকে ছেঁউড়িয়াতে পাঠাননি। লালন নিজেই ভাগ্যক্রমে ছেঁউড়িয়াতে উপস্থিত হন। তৃতীয়ত, লালন শাহ্ ছেঁউড়িয়াতে হাজির হয়েছিলেন ১২২২ সালে এবং সিরাজ শাহ্ তার সতেরো বছর পূর্বে ১২০৫ সালে ইন্‌তিকাল করেন। কুষ্টিয়ায় তাঁর কোনো আখড়া ছিল এমন কোনো প্রমাণ ও নেই। এ সব কারণে, অধ্যাপক আনোয়ারুল সাহেবের উক্তি বিশ্বাস্য নয়।

অন্যপক্ষে, লালন ও মলম শাহের পরস্পর সাক্ষাৎ এবং লালন শাহ্ কর্তৃক ছেঁউড়িয়ায় আখড়া-নির্মাণ প্রসংগে মনসুরউদ্দীন সাহেব বলেছেন, গৃহ-প্রত্যাখ্যাত (?) লালন 'সন্ন্যাসীর বেশে নানাস্থান ঘুরিতে ঘুরিতে···বর্ত্তমান মোহিনী মিলের সন্নিকটস্থ কালীগঙ্গার তীরবর্তী ছেঁউড়িয়া গ্রামের একটি বটবৃক্ষ তলে

৮৫। অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ ২৫।

অবস্থান করেন। এই গ্রামের মলম শাহ্‌ একজন গরীব মুসলমান ছিলেন। ...তিনিই তাঁহাকে ভক্তিভরে সঙ্গে করিয়া আপন গৃহে লইয়া আসেন এবং স্বামী-স্ত্রী দুইজন মিলিয়া তাঁহার খেদমত করিতে থাকেন।" (৮৬) প্রকৃতপক্ষে লালন শাহ্‌ প্রত্যাখ্যাত ছিলেন না। এবং মলম বিশ্বাস তাঁকে "বটবৃক্ষ তলে" কুড়িয়ে পাননি। এ বিষয়ে প্রদত্ত দুদ্দু শাহের বর্ণনার সঙ্গে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের প্রদত্ত বিবরণের মূলগত প্রভেদ থাকায় এবং মনসুরউদ্দীন সাহেবের তথ্য-প্রাপ্তির কোনো নির্ভরযোগ্য উৎস নির্দেশের অভাবে মলম বিশ্বাস তাঁকে নদীর ঘাট থেকে তুলে নিয়ে এসে আরোগ্য করেন, এ কথাই সত্য বলে মনে হয়।

লালনের নিকট মলম বিশ্বাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ সম্পর্কে দুদ্দু শাহ্‌ একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি হোল, একদিন ভোর বেলায় মলম বিশ্বাস কোরান তেলাওয়াত করছিলেন। সদ্য-রোগমুক্ত লালন শাহ্‌ পাশে বসে মনোযোগ সহকারে তা' শুনছিলেন। মলম বিশ্বাস কোরান শরীফের সুরা আর-রহ্‌মানের "বাইনা হুমা বারজাখুল্লা ইয়ার জিয়ান" আবৃত্তি কালে—

সাঁই (লালন) ভুল ধরি তারে করেন ফরমান॥
কি পড় কোরয়ান মিঞা এত ভুল করি।
শুনিয়া মলম ভাই পুলকিত ভারি॥
মিষ্ট বচনে তবে তাহারে শুধায়
কি করে জানিলে তুমি পাঠে ভ্রান্তি হয়॥
এত শুনি সাঁই তারে বুঝাইয়া দিল।
'নাহি জানি লেখাপড়া'—ইহাই বলিল॥(৮৭)

৮৬। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, মুহম্মদ কামাল উদ্দীন সংকলিত প্রাগুক্ত গ্রন্থ, ভূমিকা, পৃষ্ঠা ।০

৮৭। দুদ্দু শাহ্‌, প্রাগুক্ত, পৃ ৩-৪।

ক্রমে ক্রমে লালনের পাণ্ডিত্য, বিভিন্ন ধর্ম-শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ও অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেয়ে মলম বিশ্বাস তাঁর নিকট সস্ত্রীক বাইয়াৎ গ্রহণ করেন। তিনি ধনী গৃহস্থ ছিলেন। শিষ্যত্ব গ্রহণের পর তাই পৈতৃক সত্ত্বে প্রাপ্ত নিজ অংশের ৫১ বিঘা জমি লালন শাহ্কে সাধু সেবায় দান করেন এবং বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বে এক তেঁতুল গাছতলায় তাঁর আখড়া তৈরী করিয়ে দেন। তখন থেকে লালন শাহ্ দেশ ভ্রমণ ত্যাগ করে ছেঁউড়িয়াতেই স্থায়ীরূপে সাধক-জীবন শুরু করেন।

ক্রমে তাঁর সাধনার খ্যাতি সারা কুষ্টিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে। এমন কি কুষ্টিয়ার বাইরেও বিভিন্ন স্থান থেকে বহু লোক এসে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে থাকে। হিন্দু যোগী, বৈরাগী এবং বে-শরা ফকীরদের গণ্ডী অতিক্রম করে লালন শাহের প্রভাব সাধারণ জন-সমাজেও বিস্তৃত হয়। ফলে, শরীয়তবাদী মুসলিম জনসাধারণের একাংশ অবশেষে তাঁর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রচারে অবতীর্ণ হন। এবং তাঁকে নাসারা, কাফের, নেড়ার ফকীর, ভেদো ফকীর ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যায়িত করেন।

এ বিষয়ে শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের প্রতি দোষারোপ করে অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম লিখেছেন—"অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ মহাশয়···অভিযোগ করেছেন শরীয়তবাদী মুসলমান লালনকে ভালো চোখে কোনো দিনই দেখেননি এবং এই বাউলপন্থী নেড়ার ধার্মিকেরা চিরকাল ইস্লাম ধর্মাবলম্বী দ্বারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াছেন॥ কথাগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা ; এবং দুরভিসন্ধিমূলক।"(৮৮) কিন্তু শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের প্রতি অধ্যাপক সাহেবের এই দোষা-রোপ এবং কটূক্তি ভিত্তিহীন। কারণ লালন শাহ্ যে প্রকৃতই শরীয়তবাদী ছিলেন না, একথা সত্য। আর এ ব্যাপারে যে তাঁকে

৮৮। অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম, প্রগুক্ত, পৃ ১৯।

বহুবার মোল্লা-মৌলবী সাহেবদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছে দুদ্দু শাহের পাণ্ডুলিপিতে তার একাধিক ঘটনার উল্লেখ আছে। তৎকালে বাউল মতের সঙ্গে মুসলিম সমাজের আলেম শ্রেণীর ধর্মচেতনার সংঘর্ষ বোধছিল তারও ঐতিহাসিক প্রমাণ ইদানীং আবিষ্কৃত হয়েছে। মুহম্মদ আবু তালিব সাহেবের আবিষ্কৃত মুদ্রিত পুস্তক "রাউল ধ্বংস ফতোয়া" এ বিষয়ের চূড়ান্ত উদাহরণ। কাজেই বাউলমত প্রচার করতে গিয়ে লালন শাহ্‌কে যথেষ্ট বিব্রত হতে হয় এবং বহুবার বাহাছে অবতীর্ণ হতে হয়।

দুদ্দু শাহ্ লিখেছেন—

নানা দেশ হতে শেষে আসে নানা জন।
তর্ক করিতে কেহ করে আগম॥
চক্কর, ফক্কর, আর মানিক, মলম।
কোরবান, মনিরদ্দিন আসে কতজন॥ (৮৯)

উপযুক্ত মলম ও লালন শাহের উদ্ধার কর্তা মলম বিশ্বাস পৃথক ব্যক্তি। চক্কর ওর্ফে চাঁদ আলী ও ফক্কর ওর্ফে ফরাতুল্লাহ্ কুষ্টিয়া জেলার চড়াইকোলের অধিবাসী ছিলেন। মানিক শাহের বাসস্থান ছিল ছেঁউড়িয়াতে। এ অঞ্চলে তিনি পণ্ডিত বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আর কোরবান আলী ছিলেন পাবনার অধিবাসী।

এঁরা কেউ লালনকে উচ্ছেদ করতে, কেউ তাঁর মতবাদের অসারতা প্রমাণ করতে লালন শাহের সঙ্গে তর্ক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। অবশেষে পরাজিত হয়ে বাউল ধর্ম গ্রহণ করে সারাজীবন লালনের পদসেবায় রত থাকেন। মনিরুদ্দিন শাহের বাড়ী ছিল যশোর জেলার হরিণাকুণ্ডু থানায়। তিনি ঘোড়ায় চড়ে চাবুক নিয়ে লালন শাহকে বেশরা মত প্রচার করা থেকে বিরত রাখার জন্য

৮৯। দুদ্দু শাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ ৪।

শায়েস্তা করতে এসেছিলেন। কিন্তু লালনকে চাবকাতে এসে অবশেষে সে চাবুক হজরত ওমরের মত তাঁরই পদতলে রেখে বাউল মতবাদে দীক্ষা গ্রহণ করে ধন্য হন।

লালনের শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম শিষ্য দুদ্দু ওর্ফে দবিরুদ্দীন শাহ্ও এমনি ভাবে তাঁর সঙ্গে বাহাছ করতে এসে বাইয়াৎ গ্রহণ। করেন। এ বিষয়ে তিনি নিজেই লিখেছেন,

বাহাছ করিতে গিয়া বায়াৎ হইনু
আমি অতি অভাজন লালন সাঁই বিনু॥ (৯০)

শাহ্ লতীফ্ আফী আন-হু বলেছেন—"মৌলবী দবীর উদ্দীন এক মহিষের গাড়ী বোঝাই হাদিস্, দলিল ফতোয়ার কেতাব ইত্যাদিসহ বড়দরে'র হাজী হাসানকে সঙ্গে নিয়ে বাহাছ করতে আসেন। উদ্দেশ্য, লালন শাহের প্রচারিত বাউল মতবাদের অসারত্ব প্রমাণ করা এইং তাঁকে শরীয়তের পথে ফিরিয়ে আনা। শর্তস্থির হয়—যতক্ষণ বাহাছ চলবে, কেউ আহার, বাহ্য-প্রস্রাব বা স্নানের জন্য উঠতে পারবেন না। এইভাবে প্রথম সাতদিন হাজী হাসান ও পরবর্তী সাতদিন মৌলবী দবীরুদ্দীন সাহেব বাহাছ করে পরাজিত হন। পঞ্চদশ দিনে তাঁরা লালন শাহের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। লালন শাহ্ তাঁদের আরো বাহাছ চালাতে সময় দিতে সম্মত ছিলেন, কিন্তু মৌলবী সাহেব তাঁর নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করে সব দ্বন্দ্বের নিরসন করেন।"

এভাবে লালন শাহের বাউল মতবাদ প্রচারের জন্যে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে তাঁকে দীর্ঘদিন ধরে বাহাছ-সংগ্রাম চালাতে হয়। এসব বাহাছের ভিত্তিতে নাগর শাহ নামক লালন-শিষ্য কয়েকখানি বাউল মতবাদের সিদ্ধান্ত প্রনয়ন করেন। উক্ত পুস্তকগুলোর মধ্যে

৯০। দুদ্দু শাহ্, পৃ ৪।

একখানির নাম "ফকীরি জাহের বা আক্কেল নামা বা দরবেশ নামা'। পাণ্ডুলিপিটির ১৬ পৃষ্ঠায় বিধৃত বিবৃতি অনুসারে জানা যায়—হিজলা বটগ্রামের মুন্শী তোফাজ্জেল হোসেন নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে লালন শাহ্ কুষ্টিয়া শহরে বাহাছে প্রবৃত্ত হন। উক্ত তর্ক-যুদ্ধের

কয়েক ছওয়াল মুন্সী আগেতে পুছিল।

আল্লাহ্র মেহেরে ফকীর জওয়াব তার দিল॥

লালন শাহ্ কুষ্টিয়াতে স্থায়ীভাবে আখ্ড়া নির্মাণের পর আয়ুর্বেদী পন্থায় চিকিৎসা করতেন। এ সময়, তাঁর নিকট বহু কবিরাজী গ্রন্থ এবং স্বহস্ত-লিখিত খাতাপত্র ছিল—একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। চিকিৎসা থেকে যা আয় হোত তাই দিয়ে তিনি নিজের গ্রাসাচ্ছাদান করতেন। মলম বিশ্বাসের ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তির আয় তিনি বাউল মতবাদ প্রচারকার্যে ও সাধু-সেবায় অর্থাৎ বাৎসরিক শিষ্য-সম্মেলনে ব্যয় করতেন।

শেষ-জীবনে তিনি মাত্র একবার আহার করতেন। তাঁর স্বহস্তে তৈরী একটি পানের বরজ ছিল। উক্ত বরজ থেকে তিনি প্রত্যহ একশ'টি ক'রে পান গ্রহণ করতেন। বৃদ্ধ বয়সে শারীরিক ক্লেশের জন্যে তিনি ঘোড়ায় চড়ে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করতেন। তাঁর মাথায় লম্বা চুল ও একটি চক্ষু অন্ধ ছিল। বসন্ত-রোগে তাঁর এচক্ষু নষ্ট হয়েছিল—একথা সত্য নাও হতে পারে। কারণ তাঁর একটি গানে বলা হয়েছে,

মনের হোল মতি-মন্দ।

জন্মে, তাইতি হলাম 'জন্ম-অন্ধ'॥

লালন শাহ্ বাঙ্লা ১২৯৫ সালের পহেলা কার্তিক শুক্রবারে (ইং ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর) দেহত্যাগ করেন। 'হিতকরী'তে বলা হয়েছে—"মৃত্যুর প্রায় একমাস পূর্বে হইতে ইঁহার পেটের ব্যারাম হয় ও হাত পায়ের গ্রন্থি জলস্ফীত হয়। দুগ্ধ ভিন্ন পীড়িত অবস্থায় অন্য কিছু খাইতেন না। ...মরণের

পূর্ব রাত্রিতেও প্রায় সমস্ত সময় গান করিয়া রাত্রি ৫টার সময় শিষ্যগণকে বলেন, 'আমি চলিলাম।' ইহার কিয়ৎকাল পরে শ্বাসরোধ হয়। মৃত্যুকালে কোন সম্প্রদায়ী মতানুসারে তাঁহার অন্তিমকার্য সম্পন্ন হওয়া তাঁহার অভিপ্রায় ও উপদেশ ছিল না। তজ্জন্য মোল্লা বা পুরোহিত কিছুই লাগে নাই।...তাঁহারই উপদেশ অনুসারে আখড়ার মধ্যে একটি ঘরের ভিতর তাঁহার সমাধি হইয়াছে।" (৯১) তাঁর শেষ-জীবনের সাধন-সঙ্গিনী মতিবিবির কবরও এই ঘরের মধ্যেই।

লালন শাহ্ দীর্ঘ জীবনে একাধিক সাধন-সঙ্গিনী গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের একজনের নাম বিশাখা ও অপরের নাম মতিবিবি। বিশাখা ছিলেন গোলাম শাহের নাতনী। এর পিতার নাম জানা যায়না। ইনি ছিলেন লালনের সাধক-জীবনের প্রথম সাধন-সঙ্গিনী। মতিবিবিকে তিনি শেষ জীবনে কোথা হতে সংগ্রহ করেন—তা' অজ্ঞাত।

অধ্যাপক আফসার উদ্দীন যদিও লালনকে বিবাহিত বলে উল্লেখ করেছেন,(৯২) তথাপি তা সত্য নয়। লালন শাহ্ আদৌ শাস্ত্রীয় অর্থে বিবাহ করেননি। এ বিষয়ে প্রাগুক্ত লালন-পরিচিতিতে বিশাখাকে বিবাহিতা পত্নীরূপে যে উল্লেখ আছে—তাও যথার্থ নয়। হরিশপুরের সবচেয়ে বৃদ্ধ ব্যক্তি জনাব আবদুল আজিজ সাহেবও লালনকে চিরকুমার বলে উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম বাঙলার প্রায় সমস্ত প্রবন্ধকারই এ বিষয়ে একমত যে, লালন শাহ্ কমপক্ষে দু'টি পত্নীর পাণি-গ্রহণ করেন। এদের একজনকে তিনি "অল্পবয়সে" বিবাহ করেন

৯১। উদ্ধৃত, শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ ১২৬।

৯২। অধ্যাপক আফসারউদ্দীন সেখ, প্রাগুক্ত, পৃ ১২২।

এবং অন্যজনকে কুষ্টিয়ায় স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করার পর। লালনের বাল্য-বিবাহ সম্বন্ধে শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন— "তখনকার বাল্য-বিবাহের যুগে অল্প বয়সেই লালনের বিবাহ হয়।"(৯৩) ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তও এ বক্তব্য সমর্থন করেছেন।(৯৪) লালনের দ্বিতীয় বিবাহ সম্পর্কে শ্রীভট্টাচার্যের অভিমত—"গুরুর সহিত নানাস্থানে ভ্রমণের পর সম্ভবতঃ গুরুর মৃত্যু হইলে তিনি আনুমানিক ১২৩০ সালে কুষ্টিয়ার প্রান্তে গোরাই নদীর ধারে সেঁউড়িয়া নামক পল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হন।" এবং…ঐ স্থানের এক মুসলমান জোলা রমণীকে লালন নিকা করিয়া তাঁহারই বাড়ীতে বাস করেন।"(৯৫) এ বক্তব্যের সঙ্গে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ও একমত।(৯৬) মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সাহেব এ সম্পর্কে আরও বলেছেন, "ছেঁউড়িয়ার দুইটি প্রাচীন লোকের সহিত সম্প্রতি আলাপ করিয়া জানিতে পারি যে…লালন শাহের স্ত্রী পর্দানশীন ছিলেন।"(৯৭)

কিন্তু পূর্বালোচনায় জানা গিয়েছে, লালন শাহ্ শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন হয়ে যশোর জেলার হরিশপুরের অধিবাসী সিরাজ শাহের আশ্রয়ে লালিত-পালিত হন। কাজেই লালনের বাল্য-বিবাহ হলে, তা' একমাত্র শিরাজ শাহের ইচ্ছাতেই সম্পূর্ণ হতে পারত। কিন্তু শিরাজ শাহের তেমন কোনো ইচ্ছা ছিলনা। এবং লালন ২৬ বছর বয়স পর্যন্ত যে বিবাহ করেননি, তা পরবর্তী

৯৩। শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ ৮।

৯৪। শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত, ভূমিকা, পৃষ্ঠা ।/০

৯৫। শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ ১০।

৯৬। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, বা, সা, মু, সা, পৃ ১৯।

৯৭। মুহম্মদ কামাল উদ্দীন সংকলিত প্রাগুক্ত গ্রন্থ, ভূমিকা, পৃঃ ।</০

আলোচনায় প্রমাণিত হবে। লালন ছেঁউড়িয়ায় উপস্থিত হন ১২২২ সালে। তখনো তিনি ছিলেন অকৃতদার। এ ধারণা সত্য হবার কারণ এই যে, বাউল সাধনা পরকীয়া রস-রতির সাধনা। এসব সাধকদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ১৩১২ সালে শ্রীমোক্ষদা চরণ ভট্টাচার্য লিখেছেন—"এই মতের (গুরু সত্য মত বা বাউল মত) প্রধানগণ প্রায় সকলেই অকৃতদার সঙ্গীতপ্রিয় সাধক।"(৯৮) তাছাড়া দুদ্দু শাহের পাণ্ডুলিপিতেও এ বিষয়ের কোনো উল্লেখ নেই। লালন শাহ্ সত্যি বিবাহ করলে, নিশ্চয় দুদ্দু শাহ্ তার উল্লেখ করতেন।

লালন-জীবনী অনুসরণ করলে দেখা যায় শৈশবে গৃহহীন লালন পালক পিতা ও গুরু, বাউল শিরাজ শাহের স্নেহচ্ছায়ায় প্রতিপালিত হন। এই গুরুর সাহচর্যে তাঁর জীবনের সুদীর্ঘ ২৬ বছর অতিবাহিত হয়। এ সময়ের মধ্যেই তিনি বাউল তত্ত্বে পুরোপুরি ভাবে দীক্ষিত হন এবং বাউল সাধনার উপযুক্ত করে নিজেকে গড়ে তোলেন। বাউল মতে মৃত্যু দু'রকম। প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত। প্রাকৃত মৃত্যুতে দেহের বিনাশ ঘটে। অপ্রাকৃত মৃত্যুতে দেহের বিনাশ ঘটে না; কিন্তু মুক্তিলাভের পথ চিরতরে বন্ধ হয়। এই মৃত্যু স্ত্রী সম্ভোগের দ্বারা সন্তানের জন্মদান। বাউলমতে সন্তানের জন্ম হলে, উক্ত সন্তানের মাধ্যমেই পিতা জীবিত থাকে। কারণ সন্তান পিতারই নবতর আবির্ভাব। কাজেই কর্ম-চক্র থেকে, এমন অবস্থায় সাধকের মুক্তির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। তাই বাউলদের পক্ষে বিবাহ করা শুধু অধর্ম নয়, নিষিদ্ধও।

তাছাড়া গুরুর মৃত্যুকাল পর্যন্ত লালন শাহ্ খিল্‌কা-ঝোলার

৯৮। শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য, "নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা" সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (১ম সংখ্যা, ১৩১২), পৃঃ ৪৩।

অধিকারী হননি। কাজেই খিলাফত না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর পরকীয়া রস-সাধনায় নারী-সঙ্গের কোনো প্রশ্নই ওঠেনা। তথাপি তিনি যদি বিবাহিত হতেন, তাহলে শিরাজ শাহ্ তাঁকে বিদেশ-ভ্রমণের উপদেশ দান করতেন না। আর লালনও সুদীর্ঘ সতের বছর ব্যাপী দেশ-ভ্রমণ উপলক্ষে বিদেশে-বাস করতে পারতেন না। অতএব তেঁতাল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি যে বিবাহ করেননি একথা অবশ্যই সত্য।

তৃতীয়ত, বাউলের নারী-সঙ্গ গৃহীর পত্নী-গ্রহণ এক ব্যাপার নয়। বাউলেরা গৃহী নন। নারী দেহকে তাঁরা কখনো ভোগ করেন না। অন্তত তেমন কোনো বিধি নেই। আর এজন্যেই প্রকৃত বাউল, সাধন-সঙ্গিনী (সাধারণের চোখে স্ত্রী) কে 'মা' বলে সম্বোধন করেন। ছেঁউড়িয়ায় এসে লালন শাহ্ সর্বপ্রথম বিশাখাকেই সাধন-সঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করেন। অবশ্য এই সঙ্গিনী নির্বাচনেও কিছুটা বিবাহের অনুরূপ মামুলী অনুষ্ঠান করার আবশ্যক হোত—Indian Penal eode-এর ভয়ে। সেকথা মৌলভী আবদুল ওয়ালী সাহেব স্পষ্টরূপেই উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন—"Music in which they (the Faqirs) excel, and which they much practice, is one of their chief instruments of winning the hearts. Women—generally widowed, out-casted, and fallen of any pursuasion—are their next instrument." এ উক্তিরই পাদ-টীকায় তিনি লিখেছেন—"There is no marriage, but if the woman be the member of a family which do not allow her to be abducted, a kind of formal marriag ceremony is gone into, for fear of the Indian penal Code." (৯৯) অতএব অতএব লালন শাহের সাধন-সঙ্গিনী গ্রহণ যে গৃহীর পত্নীগ্রহণ নয়, তা অবশ্য স্বীকার্য।

৯৯। Moulavi Abdul Wali, ibid, p. 248.

লালন শাহ্ তাঁর সুদীর্ঘ জীবনকালে একাধিক সাধন-সঙ্গিনী গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের একজনের নাম বিশাখা; অপরের নাম মতিবিবি। এঁরা কেউ-ই তাঁর বিবাহিত পত্নী নন। অতএব লালন বিবাহিত ছিলেন, এ ধারণা একান্তই ভুল। তাঁর স্ত্রী পর্দানশীন ছিলেন, এ উক্তিও হাস্যকর। তিনি ছিলেন চিরকুমার। কারণ চির-কৌমার্য বাউল-সাধনার "লালন শাঁই মত"-এ মুক্তি ও সিদ্ধি লাভের অন্যতম অপরিহার্য শর্ত।

॥ ৩ ॥

ক. ধর্ম-জীবন ॥

লালন শাহের ধর্ম-জীবন ছিল নিষ্কলুষ ও মহান। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে মানব-প্রীতিই ছিল তাঁর সে-জীবনের মূল ভিত্তি। নবদ্বীপের সাধু সমাবেশে গোত্র-পরিচয় দান করে তিনি যে লাঞ্ছনা ভোগ করেছিলেন, তা তাঁর সারাজীবনের পাথেয় হয়ে ছিল। তিনি নিজেও এই লাঞ্ছনার জবাবে বলেছিলেন,

বিভিন্নতা করিও না জাতিধর্ম বলে ॥
আলেখ অধর সেই দয়াময় সাই।
সৃষ্টি স্থিতি জুড়ে তার জাতি গোত্র নাই।
জাতি ধর্ম কুল গোত্র মানুষের সৃজন
ভিন্ন বলে কিছু আমি দেখিনা কখন ॥
সকল জনার মাঝে একই সেই ঈশ্বর
নানা স্থানে নানারূপে করেন বিহার ॥ (১০০)

১০০। দুদ্দু শাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ ৩।

লালন শাহ্ নিজে একটি বিশেষ ধর্ম-মতের অধিবক্তা হয়েও অপর কোনো ধর্মমতকে কখনো কোনো আঘাত করতেন না। তিনি বুদ্ধের মত, যিশুখ্রীষ্টের মত, হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর মত, শ্রীচৈতন্যের মত যে কোনো স্তরের, যে-কোনো বর্ণের এবং শ্রেণীর মানুষকেই স্বীয় মতবাদে দীক্ষিত করতেন। যে-কোনো ব্যক্তির গৃহে অন্নগ্রহণ করতে তাঁর কখনো সংকোচ দেখা দেয়নি। স্বীয় মতবাদে অটল থেকেও তিনি পরমত-সহিষ্ণু ছিলেন এবং অপর ধর্মকেও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন। হৃদয়ের এই অকুণ্ঠ উদারতার জন্যই লালন শাহ্ বলতে পেরেছেন,

ধর্মের উদ্দেশ্য যদি হয় আল্লা'র নির্ণয়।
তাহা হলে সকল ধর্মেস্থ তারে পাওয়া যায়॥
তালেবুল মাওলা যে হয়
সকল ধর্মেই সে তারে পায়
আল্লা কারো একান্ত নয়
চেয়ে দেখরে এই দুনিয়ায়॥

এ জন্যই তিনি ধর্ম এবং কোনো মানুষকে কখনও অবহেলা করতেন না। হিন্দু-মুসলমান সকলকেই তিনি আপন অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই তাঁর অবাধ মেলা-মেশা ছিল। এ জন্যে জাতিবিচারকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখতেন। তাই জাত-বিচার সম্পর্কে তাঁর উক্তি,

জাত-বিচারী ব্যভিচারী
জাতির গৌরব বাড়ী বাড়ী
দেখিলাম চেয়ে।
লালন বলে হাতে পেলে
জাতি পোড়াতাম আগুন দিয়ে॥

শুধু তাই নয়—সাম্প্রদায়িক দাংগা-হাংগামাও তিনি গভীরতর বেদনার সংগে অবলোকন করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

যবন-কাকের ঘরে ঘরে
শুনে আমার নয়ন ঝরে
লালন বলে মারিস কারে
চিনলিনে মনের ধোঁকায় ॥

ধর্ম-জীবনে লালন শাহ্ উদার, সত্যবাদী, নিরহংকার ও অত্যন্ত সুরুচি-সম্পন্ন ছিলেন। নিয়মিত সংগীতের দ্বারা সাধন-ভজন করতেন। বিশেষত, রাতের শেষ প্রহরে প্রত্যহ তিনি স্ব-নির্দিষ্ট 'জিকির' করতেন। এই জিকিরের সময়ও গান চলত। এভাবে তাঁর সাধনায় গানের প্রাধান্য থাকায় শরীয়ৎবাদী মুসলমানগণ তাঁকে অত্যন্ত অশ্রদ্ধা করতেন এবং সময় সময় কটুক্তিও করতেন। এরকম কটুক্তির জবাবে লালন বলেছেন,

সাধা সোহাগিনী ফকীর
সাধে কি হয়।
তবে কে কেহ কেহ বেদাৎ কয় ॥

বার নাম সাধি সেইতো গান
কোরাণেতে পড়ে এলহান
নইলে কি আর হাদিস্ কোরাণ
পড়তে অত রাগ-রাগিনী ছায়॥
সব গান যদি বেদাৎ হতো
তবে কি গান ফেরেস্তায় গাইত?
চেয়ে দেখো মে'রাজ-পথ
নবীজিকে নাচতে গাইতে নেয় ॥

আধ-খুট্টি পৌণ-বাঙ্গালী ভাই
গানের ভাবনা জেনে গোল বাধাই
গানের ভাব-বিশেষে ফল দিবেন শাঁই
লালন ফকীর কয় ॥

এমনিভাবে গোঁড়া মুসলমানদের হাতে তাঁকে যথেষ্ট নিগ্রহ সইতে হয়েছে। তবু তিনি নিজের পথ থেকে কখনো বিচ্যুত হননি।

লালন শাহ্ স্বীয় জীবনধারণের জন্য ভিক্ষা করতেন না। মলম শাহ্ কর্তৃক ওয়াকৃফ-কৃত সম্পত্তির ফসল থেকে তাঁর নিজের ব্যয় ও বাৎসরিক সাধুসমাগম-উৎসবের খরচ নির্বাহ হোত। প্রতিবছর ছেঁউড়িয়-আখড়ায় সমাগত শিষ্যবৃন্দের নিকট তিনি উদার মানব-প্রেম ও ধর্ম-বাণী প্রচার করতেন।

শেষ জীবনে লালন শাহ্ প্রতিদিন মাত্র একবার আহার করতেন ও সর্বক্ষণ শুভ্র-পরিচ্ছদ পরিধান করতে ভালবাসতেন। বৃদ্ধ বয়সে অশ্বারোহনে তিনি দূরবর্তী শিষ্যদের সংগে সাক্ষাৎ করার জন্যে ভ্রমণে বের হতেন। 'হিতকরী'র সংবাদ থেকে জানা যায়— মৃত্যুকালে তাঁর শিষ্য সংখ্যা প্রায় দশ হাজার ছিল।

খ. ধর্মমত ॥

লালন শাহের ধর্ম-জীবনের সঙ্গে তাঁর ধর্মমত সম্পর্কেও আলোচনা বিধেয়। বিভিন্ন ধর্মমতের সংমিশ্রণ ও সমন্বয় ঘটিয়ে তিনি যে নতুন ধর্মমতের উদ্ভব ঘটান—তা-ই একালের বাউল ধর্ম। পল্লী-গ্রামে এই সম্প্রদায়ের ফকীরদের "লালন শাঁই মতের ফকীর" বলা হয়।

বাউল মতবাদ পাক-ভারতের প্রাচীনতম লোকায়ত মতবাদের সঙ্গে তন্ত্র, বৌদ্ধ শূন্যবাদ, সাংখ্যযোগ, বৈষ্ণব সহজিয়া এবং সুফীবাদী ধ্যান-ধারণার সংমিশ্রণ উদ্ভূত। এ জন্যে একে কোনো নতুন ধর্ম না বলে নতুন মতবাদ রূপে চিহ্নিত করাই সংগত।

লালন-পূর্ববর্তী কালে বাউলধর্ম বলতে বোঝাত—তান্ত্রিক সহজিয়া যোগাচার। তার ফলে, প্রাক-লালন-পর্বে রচিত কোনো গীতে বা গ্রন্থে 'বাউল' শব্দের স্থিরতর অর্থ নেই।

"বাউল" শব্দের ইতিহাস অন্বেষণ করতে গিয়ে শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' ও শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' থেকে শুরু করেছেন। এ সব গ্রন্থে ও পরবর্তী কালের সমস্ত মধ্যযুগীয় রচনায় এ শব্দটির অর্থ—পাগল বা উন্মাদ, সংসার ত্যাগী, তপস্বী, সন্ন্যাসী প্রভৃতি। লালন শাহ্‌ই সর্বপ্রথম শব্দটিকে সুনির্দিষ্ট দার্শনিক অর্থে ব্যবহার করেন। তিনি 'বাউল' শব্দের অর্থ করেছেন—'আত্মানুসন্ধানী'। পূর্বোক্ত শব্দের সঙ্গে এই শব্দটির উৎপত্তিগত প্রভেদও লালন শাহ্‌ নির্ণয় করেছেন। তিনি বলেছেন,

আমার আপন খবর নাইরে কেবল
'বাউল' নাম ধরি ॥
বেদ-বেদান্তে নাই যায় 'উল্'
শুধুই কেবল নামে মশ্‌গুল
এ জগৎ ভরি'
'খবরদার' কারে বলা যায়
কিসে হয় খবরদারি ॥
আপনার আপনি যে জেনেছে
'বা-উলে'র 'উল্' সেই পেয়েহে
সেই হুঁশিয়ারী।
কত মুনী,' ন্যাসী, যোগী, তপস্বী
খবর পায়না তারী ॥
আউল বাউল আরেফ কামেল
আত্মতত্ত্বে হয়ে ফাজেল
যে দ্বারের দারী
আমি লালন পশুর চলন
কেমনে তারি ॥

এ কবিতায় 'বাউল' শব্দটি যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাতে

'স্বরূপ-দ্বার,' চর্যার বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধকদের 'দশমী-দ্বার' এবং যোণি দ্বার—অভিন্ন।

মানুষ তত্ত্বের সাধনায় এখানে তন্ত্রের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তান্ত্রিকদের মতই লালন স্বরূপ দ্বারের বিস্তৃত ব্যাখ্যায় কুল-কুণ্ডলিণী (মূলাধার পদ্মে অবস্থিতির) জাগরণ, ষট্‌চক্রভেদ ও নানা যৌগিক ক্রিয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ,

শূন্য দেশে মেঘের উদয়
নীরদ বিন্দু বরিষণ সেথায়

'শূন্যদেশ'—অর্থাৎ মস্তকে সহস্রদল পদ্মের ঊর্দ্ধাকাশ থেকে যে বারি-বিন্দু ঋতুতে ঋতুতে বর্ষিত হয়, সেই হোল 'মহারস'। যে,

১০—

মহারস মুদিত কমলে (অর্থাৎ সহস্রদল পদ্মেঅমৃতরূপে সঞ্চিত)
প্রেম শৃঙ্গারে নাওগে খুলে
আত্ম সাবধান সে রণকালে
কয় ফকীর লালন।

আত্মসাবধানতা বলতে লালন বুঝিয়েছেন সুকঠিন সংযমের কথা। এ সংযম সহজ নয় বলে তিনি সাধককে 'জীয়ন্তে-মরা'-র উপদেশ দিয়েছেন। বলেছেন,

মর' জিন্দেগীর আগে।
দেখে শমন যাক ভেগে॥
আয়ু থাকতে আগে মরা
সাধক যে তার এমনি ধারা
প্রেমোন্মাদে মাতোয়ারা
সে কি বিধির ভয় রাখে

হায়াতের আগে মরে যে
বাঁচে সে মউতের পিছে

কারো রে মন এ সব দিশে
ফকীর লালন কয় ডেকে ॥

আত্মশুদ্ধির জন্যে এই 'জীয়ন্তে-মরা'-র সাধনা—সুফীদেরও সাধনা। তাঁদের মতে এ-মৃত্যু চার রকমের। যথা,—

(১) শ্বেতবর্ণ মৃত্যু বা উপবাসাদির সাহায্যে ক্ষুৎ পিপাসা দমন
(২) কৃষ্ণবর্ণ মৃত্যু বা স্বেচ্ছায় দুঃখবরণ ও বিপদে ধৈর্য ধারণ
(৩) রক্তবর্ণ মৃত্যু বা আত্মসংযম দ্বারা ইন্দ্রিয় বশ-করণ ও
(৪) হরিদ্বর্ণ মৃত্যু বা জীর্ণবস্ত্র ধারণ ও পার্থিব বস্তু থেকে পরিপূর্ণ রূপে নিরাসক্তি।

সুফীবাদী তাসাওয়াফের এই চারি শ্রেণীর মৃত্যুর উদ্দেশ্য সম্পর্কে কুশায়রী তাঁর 'রিসালা'য় বলেছেন—"God should cause thee to die from thyself and to live in Him." (১০১) আল্-জুনায়েদ এই 'জীয়ন্তে-মরা' (to die from thyself) এবং তাঁর মধ্যে বেঁচে ওঠা- (to live in Him) কে যথাক্রমে 'ফানা' ও 'বাক্যা' বলেছেন। (১০২) লালনও বলেছেন,

আপনার আপনি ফানা হলে
তারে জানা যাবে।

অর্থাৎ লালন শাহেরও মৃত্যুরও উদ্দেশ্য শুধু মৃত্যুই নয়, বেঁচে ওঠাও। জীয়ন্তে মরার মাঝে এভাবে বেঁচে ওঠা কিন্তু সুগভীর ও শুদ্ধ প্রেমের সম্পর্ক ভিন্ন সম্ভব নয়। মনের মানুষের সঙ্গে সাধকের এই সম্পর্ক ভয়ের নয়, ভক্তির নয়, অনন্ত প্রেমের। তাই লালনের উক্তি,

---

১০১। A. G. Arberry. Sufism—An Account of the Mystics of Islam (George Allen & Unwin Ltd., London, Second impression, 1956) p. 58.

১০২। ibdi. p. 58.

শুদ্ধ প্রেম না দিলে ভেজে
কে তারে পায় ?

কিন্তু এই "শুদ্ধ প্রেমের উপার্জন" হবে কিসে ? লালনের নির্দেশ,

মনি তুই হোস্‌নে শ্মশান-বাসী
কামলীলা কর্‌না সাধন
মনের মতন
পাবি হারাধন
পূর্ণ শশি ॥

কাম-সাধনার মধ্যে এমন শুদ্ধ প্রেমের উদ্দীপনাকে দুগ্ধ থেকে মাখন নিষ্কাশনের সংগে তুলনা করা যায়। এ সাধনা অত্যন্ত কঠিন। তাই লালন বলেছেন,

জ্যান্‌তে মরা যে প্রেম-সাধনে
তাই কি পারবি তোরা
যে প্রেমে কিশোর-কিশোরী
মজেছে দু'জন তারা ॥
ধরে যে অরুণ কিরণ
কমলিনীর প্রফুল্ল বদন
তেমনি গো তুই সাধ্‌লে রতি
রাতি আকর্ষণে যাবে ধরা ॥
কামে কাম নিষ্কামী যে হয়
আছে কামরূপে কাম-শক্তির আশ্রয়
সে প্রেমেতে যে মজেছে
সেই 'জ্যান্‌তে-মরা' ॥
শুঁসায় শোঁষে না ছাড়ে আশ
তারা উজান তরী চালায় বারো বাস
লালন ফকীর ফাঁকে ব'ল
কঠিন দিকে ধারা ॥

কিন্তু "কামে কামনিষ্কামী" হওয়া কি সম্ভব? সে বিষয়ে লালনের যুক্তি,

যে জলেতে লবণ জন্মায়
সেই জলেই লবণ গলে যায়
তেমনি আমার মন-মনোরয়
'জন্ম-পথে' ম'ল সেতো॥

কারণ, নীরে নিরঞ্জন আমার
অধর্লীলা করলেন প্রচার
হলে আপন জন্মের বিচার
সব জানা যায়॥
আপনার জন্ম-লতা
খোঁজ তার মূলটি কোথা
লালন বলে হবে সেথা
শাঁইর পরিচয়॥

লালন শাঁই-মতবাদের 'মানুষ-তত্ত্বে'র এ-ই হোল সংক্ষিপ্ত রূপ-রেখা। লালন শাহ্ যে বিপুল এবং বহু বিস্তৃত দার্শনিক বিচারের উপর তাঁর এ-মতবাদের ভিত্তি স্থাপন করেছেন ও সাধন-ভজনের পথ-পরিক্রমার নির্দেশ দিয়েছেন, সে-সম্পর্কে পূর্ণাংগ আলোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভব নয়। এখানে শুধু স্মরণীয় সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর যে আত্মানুসন্ধান যুগ যুগ ধরে নাড়ার ফকীর, কালার ফকীর, মাঁদার, সতীঘরা ও কর্তাভজা মতাবলম্বী এবং আউল-বাউল-শাঁই-দরবেশ, বৈরাগী-তান্ত্রিক-যোগী-সহজিয়া প্রভৃতি মতবাদীদের অনুপ্রেরণা যুগিয়ে এসেছে—লালন শাহের সারা জীবনের সাধনায় সেই অস্ফুট, অপূর্ণ লৌকিক ধ্যান-ধারণাই নব-কলেবরে আজ পরিপূর্ণ বিকশিত বাউল-দর্শনে রূপ লাভ করেছে।

॥ পরিশিষ্ট ॥

পরিশিষ্টে দুদ্দু শাহের রচিত লালন-জীবনী প্রকাশ করা হোল। এই ক্ষুদ্র কাব্য-পুস্তিকার মূল পাণ্ডুলিপির সাইজ ৯$\frac{৩''}{৮}$ × ৫$\frac{৩''}{৮}$ ইঞ্চি। জনাব শাহ. লতীফ আফী আন্হু সাহেব এই পাণ্ডুলিপির কথা সর্বপ্রথম শিক্ষিত জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করেন। এটি তিনি পেয়েছিলেন, নবদ্বীপের চরব্রহ্ম নগর নিবাসী রামচন্দ্র মণ্ডল নামক জনৈক বৈষ্ণব ভদ্রলোকের নিকট থেকে। রামবাবু ১৩৫১ সালের পৌষ মাসে পাণ্ডুলিপিটি যশোর জেলাস্থ কালীগঞ্জ- হাটের (ঝিনাই-দহ মহকুমা) বিষাইখালী গ্রামের জনৈক মুদীর দোকানে অন্যান্য পুরোন কাগজ-পত্রের সঙ্গে পেয়ে—হস্তগত করেন।

বন্ধুবর আফী আন্হু সাহেব পাণ্ডুলিপিটি আমাকে দেখতে ও নকল করতে অনুমতি দেন ১৩৭১ সালের মাঘ মাসে। তৎপর তিনি তা প্রকাশ করতেও অনুমতি দান করে বাধিত করেন। এ প্রসঙ্গে তাই তাঁকে ধন্য বাদ জানাই।

॥ লালন-জীবনী ॥

"মানুষ গুরু লালন সাই দরবেশের চরণ সহায়।"
ধন্য ধন্য মহামানুষ দয়াল লালন সাঁই।
পতিত জনার বন্ধু তাঁর গুণ গাই॥
জাতি ধর্ম্ম শাস্ত্র আদি মীমাংসা করিয়া
নব সত্য প্রকাশিল মানব লাগিয়া॥
আমার দয়াল মুরশীদ কৃপা প্রকাশিয়া।

তাঁর আত্মকথা কিছু গিয়াছে বলিয়া।
তাঁর মহা আত্মকথা আমি কি জানিব।
যার কথা সে যদি না কয় কিসে প্রকাশিব॥
আলম ডাঙ্গা গ্রামে শুকুর সার আশ্রমে।
আরজি করিনু আমি অতিব নির্জ্জনে॥
দয়াল দরদি সাঁই করুণা করিয়া।
কহ কিছু আত্ম-কথা এ দাসে বুঝাইয়া॥
এত শুনি দয়াল সাই মোর পানে চায়।
মৃদু হাসি এই দাসে যাহা কিছু কয়॥
বহুদিন সেই কথা রাখিনু ঢাকিয়া।
সাইজির ছিল মানা নাহি প্রকাশিবা॥
নাহি জানি কবে আমি যাইব চলিয়া।
তাঁর আত্মকথা যাইবে গোপন হইয়া॥
একারণে শেষকালে লঙ্গি তাঁর বাণী।
একান্ত বিনয়ে লিখি তাঁর জীবনী॥
মুখ-তাছার তার কিছু বর্ণনা করিব।
তাঁহার চরণমূলে ফানা হয়ে যাব॥
এগারশো উনআশী কার্ত্তিকের পহেলা।
হরিশপুর গ্রামে সাইর আগমন হইলা॥
যশোহর জেলাধিন ঝিনাইদহ কয়।
উক্ত মহাকুমাধিন হরিষপুর হয়॥
গোলাম কাদের হন দাদাজি তাঁহার।
বংশ পরম্পরা বাস হরিষপুর মাঝার॥
দরীবুল্লাহ্ দেওয়ান তাঁর আব্বাজির নাম।

---

*এ-নাম লেখক কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

আমিনা খাতুন মাতা এবে প্রকাশিলাম ॥
শিশুকালে সাইজিরে তাঁরা ছাড়ি গেলা।
অনাথ হইল চাঁদ বিধাতার খেলা ॥ [১৩৩]

এমনি নিদানকালে বৈশাখ মাসেতে।
আনমনে একাকী সে রহে বসে পথে ॥
সাইজির লীলা খেলা কে বুঝিতে পারে।
সিরাজ সা দরবেশে দেখে নিল তাঁরে ঘরে ॥
কুলবাড়ী হরিষপুরে সিরাজ সা'র বাস।
পাল্কী টানিয়া করে জীবিকার অন্বাষ ॥
কালক্রমে সাই তাঁরে বায়াৎ করিল।
মানুষ তত্ত্বাদি সব বুঝাইয়া দিল ॥
ছাব্বিশ বৎসর যবে বয়স তাঁহার।
উহারাও ছাড়ি গেল নিজ নিজ ঘর ॥
এমনিই কিশোর কালে ফকিরের বেশে।
নবদ্বীপ ধামে গিয়া আপনি প্রকাশে ॥
পদ্মাবতী নামে এক বিধবা রমণী।
নিজাবাসে লয়ে গেল সেহি ক্ষত্র ধনী ॥
পদ্মাবতীর গৃহে কিছুকাল যায়।
একদিন যান এক পণ্ডিত সভায় ॥
পণ্ডিত মণ্ডলী তাঁরে বিবিধ পুছিল।
সাইজি নাম ধাম সকলি বলিল ॥
সেবার সময় হইল পণ্ডিত সভার।
যবন বলিয়া দূরে সেবা দেয় তাঁর ॥
সাইর লীলা কিছুমাত্র বুঝা নাহি যায়।
প্রতি একজনার মাঝে লালনে দেখায় ॥
উহা দেখি পণ্ডিত গণ চমকিত হইল।

সবে ভাবে মনে মনে কোন জন আইল ॥
ছলিতে আইল বুঝি গৌরাঙ্গ সুজন।
দূরে রেখে সেবা দিনু কাহারে এখন ॥
তখনি সকলে মিলি গৌরধ্বনি করে।
করজোড়ে নত শিরে দুটী পদ ধরে ॥
মিনতি করিয়া কাঁদে দয়াল গোঁসাই।
মোদের ছলিতে এলে মোরা বুঝি নাই ॥
ক্ষমা কর দীনবন্ধু পাতকী জনারে।
গড়াগড়ি যায় আর এমত ফুকারে ॥ [২।৬৫]

তখনি দয়াল সাই বুঝাইয়া বলে।
বিভিন্নতা করিও না জাতি-ধর্ম্ম ব'লে ॥
আলেখ অধর সেই দয়াময় সাই।
সৃষ্টি স্থিতি জুড়ে তার জাতি গোত্র নাই ॥
জাতি ধর্ম্ম কুলগোত্র মানুষের সৃজন।
ভিন্ন বলে কিছু আমি দেখিনা কখন ॥
সকল জনার মাঝে একই সেই ঈশ্বর।
নানাস্থানে নানারূপে করেন বিহার ॥
এই মতে একে একে নানা মহালীলা।
কাশী বৃন্দাবন ধামে গিয়া প্রকাশিলা ॥
যুগ অবতার বলি সর্ব্বভক্তগণ।
করিতে লাগিল তাঁর চরণ-বন্দন ॥
হেনকালে একদিন খেঁতরী গেরামে।
উপনীত হইলেন ভ্রমণ কারণে ॥
তথা হইতে নৌকাযোগে ভ্রমণ কারণ।
দক্ষিণ পুর্ব্ব দেশে করিলেন গমন ॥
কি জানি কেমনে তিনি বসন্ত ব্যাধিতে।

আক্রান্ত হইলে তাঁরে ফেলায় নদীতে ॥
ভক্তবৃন্দ নাহি ছিল সঙ্গেতে তাহার।
মাঝিগণ ফেলে তাঁরে দরিয়া মাঝার ॥
ভাসিতে ভাসিতে তিনি কালীগঙ্গা তীরে।
ছেউড়িয়া গ্রামের পাশে এক ঘাট ধারে ॥
ভাসিতে ছিলেন যবে অচেতন হালেতে।
দেখি পরমাত্ম ভাই মলম নামেতে ॥
সযতনে তুলে আনে আপনার ঘরে।
দুগ্ধ আদি নানা পথ্য দিয়া সেবা করে ॥
এই রূপে একমাস গুজারিয়া যায়।
ব্যাধি মুক্ত হন তিনি খোদার কৃপায় ॥
একদা মলম মম পরমাত্ম ভাই।
অমন ভক্ত পদে প্রণাম জানাই ॥
নিজমনে তেলাওত করেন কোরান।
সাই ভুল ধরি তার করেন ফরমান ॥ [৩।৯৫]

কি পড় কোরয়ান মিঞা এত ভুল করি।
শুনিয়া মলম ভাই পুলকিত ভারি ॥
মিষ্ট বচনে তবে তাহারে শুধায়।
কি করে জানিলে তুমি পাঠে ভ্রান্তি হয় ॥
এত শুনি সাই তারে বুঝাইয়া দিল।
নাহি জানি লেখা-পড়া ইহাই বলিল ॥
দয়াল মুরশীদ মোরে লাদুন্নির জ্ঞান।
কিঞ্চিত দিয়াছে তায় করিনু বয়ান ॥
এই ভাবে দিনে দিনে দিন গত হইল।
মলম সা ভাই তারে গুরু করে নিল ॥
বাড়ীর দক্ষিণ দিকে তেঁতুল তলায়।

আস্তানা করিয়া দিল মুরশীদ সেবায়॥
স্বামী স্ত্রী দুইজনে তাহার কদমে।
হাজের হইয়া রহে হুজুরী মোকামে॥
তখন তাহার বয়স তেতাল্লিশ হইল।
চারিদিক হইতে বহু ভক্ত জুটিল॥
নানা দেশ হতে শেষে আসে নানাজন।
তর্ক করিতে কেহ করে আগমন॥
চক্কর ফক্কর আর মানিক মলম।
কোরবান মনিরদ্দিন আসে কতজন॥
কতজন ছিল মোর প্রভুর গোলাম।
কি কব তাদের পদে হাজার সালাম॥
বাহাছ করিতে গিয়া বায়াৎ হইনু।
আমি অতি অভাজন লালন সাই বিনু॥
বার শত পচানব্বই বাঙ্গালা সনেতে।
পহেলা কার্ত্তিক শুক্রবার দিবা অন্তে॥
সবারে কাঁদায়ে মোর প্রাণের দয়াল।
ওফাৎ পাইল মোদের করিয়া পাগল॥
মো অধমে বাবা বলে কে আর ডাকিবে।
আমার এই দীন মুখে চুম্বন করিবে॥
অমন মধুর বাণী কে আর শোনাবে।
আর কি ছেউড়িয়া ধামে করুণা বর্ষিবে?
চাঁদের বাজার কি গো মিলাইবে আর।
হিন্দু-মুছলমান সবে করে হাহাকার॥
আমি দীন দুদ্দু নাম দীনের অধিন।
সারা অঙ্গে আজু মোর আজারির চিন॥ [৪।১৩১]

বেলতলা হরিষপুরে জনম আলয়।

কেহ কেহ কুলবড়ী হরিপুর কয় ॥
শাস্ত্র ধর্ম্ম তীর্থ আদি সর্ব্ব প্রবচন।
সকল ছাড়িয়া দিলেন মানুষ ভজন ॥
বস্তু ছাড়া নাহি আর আল্লা কিংবা হরি।
এহি মত্ দেখ সবে নরবস্তু ধরি ॥
যাহা বুঝিয়াছি আমি তাঁহার কৃপায়।
কাহারে বুঝাব উহা অধর কোথায় ॥
রজঃ বীর্য্য এই দুই বস্তু যেবা চিনে।
লালন সাইজিকে সেই জন জানে ॥
মানুষ অবতার সাই তাহার মহিমা।
কি বলিব আমি হীন নাই তার সীমা ॥
ওলিয়ে আরেফ সাই বাঙ্গালা দেশেতে।
দীনহীন দুদ্দু ভনে তাঁহার কৃপাতে ॥
দয়াল মুরশীদ সাই আল্লাহু আলেখ্।
যারে ধরে মিলিয়াছে বরজখ্ ছালেক ॥ [৫।১৪৭]

সন ১৩০৩ সাল ১লা কার্ত্তিক
বার্ষিক অধিবাস ছেঁউড়িয়া
থানা ভালুকা জেলা নদীয়া [৫।১৪০]*

* মূল পাণ্ডুলিপির হুবহু অনুলিপি। বানান, শব্দ ব্যবহার ও অনুচ্ছেদ-বিন্যাস অবিকৃত রাখা হয়েছে।—লেখক

গ্রন্থপঞ্জী

ক· মূল গ্রন্থ

১। আনিসুজ্জামান — মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, লেখক সংঘ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৩৭১।

২। আবদুল হাই, মুহম্মদ ও সৈয়দ আলী হাসান — বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—আধুনিক যুগ, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, ১৩৭১।

৩। করিম, অধ্যাপক আনোয়ারুল — বাউল কবি লালন শাহ, সাহিত্য-নিকেতন, কুষ্টিয়া, ১৯৬৩।

৪। ভট্টাচার্য, শ্রীউপেন্দ্রনাথ — বাংলার বাউল ও বাউল গান, দীপান্বিতা, কলিকাতা, ১৩৬৪।

৫। মনসুর উদ্দীন, মুহম্মদ — বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা—২য় খণ্ড, ঢাকা, ১৩৭১।
হারামণি—৫ম খণ্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৩৬১।
হারামণি—৭ম খণ্ড, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৭১।

৬। মান্নান, কাজী আবদুল — আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা—১ম খণ্ড, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৬৮।

৭। সেন শাস্ত্রী, — বাংলার বাউল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা ১৯৫৪।

৮। Arberry, A. J. — Sufism—An Account of the Mystic of Islam, Allen & Unwin Ltd., London, 1956.

খ. সম্পাদিত-গ্রন্থ

১। কামাল উদ্দীন, মুহম্মদ লালন-গীতিকা—১ম খণ্ড, ঢাকা ১৯৬২।

২। দাশ, শ্রীমতিলাল ও শ্রীপীযুষ কান্তি মহাপাত্র লালন-গীতিকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৫৮।

গ. পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী

১। তালিব, মুহম্মদ আবু লালন শাহ্ প্রসঙ্গ, দৈনিক ইত্তেফাক, রবিবাসরীয় সংখ্যা, ১লা মাঘ, ১৩৬৭।

২। দাশ, শ্রীমতিলাল লালন ফকিরের গান, মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ, ১৩৪১।

৩। পাল, শ্রীবসন্ত-কুমার ফকির লালন শাহ্, প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৩২।

৪। ভট্টাচার্য, শ্রী মোক্ষদাচরণ নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৩১২।

৫। মনসুর উদ্‌দীন, মুহম্মদ i) লালন ফকিরের গান, সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৫।
ii) লালন সঙ্গীতের সূচীপত্র, লোক-সহিত্য—৩য় খণ্ড, আষাঢ়, ১৩৭১।

৬। সেখ, অধ্যাপক আফসার উদ্দিন লালন জীবন-জিজ্ঞাসার এক অধ্যায়, কুষ্টিয়া কলেজ বার্ষিকী, ১৯৬৫।

৭। হোসেন, মোহাম্মদ শরীফ লালন শাহের জন্মস্থান, দৈনিক ইত্তেফাক, রবিবাসরীয় সংখ্যা ; ৮ই মাঘ, ১৩৬৭।

৮। Wali, Maulavi — On Curious Tenets and Practices of a Certain Class of Faqirs of Bengal. The Journal of the anthropolgical Society of Bombay. Education Society's Press, Bombay, 1900.

ঘ· _পাণ্ডুলিপি

১। শাহ্ ছুদ্দ্ — লালন-জীবনী, মূল রচনা ১৩০৬।
সাইজ ৯ ৩/৮″ × ৫ ৩/৮″।

সাম্প্রদায়িকতা ও সংস্কৃতি

আবু আহসান

স্বাধীনতা লাভের পর সাম্প্রদায়িকতা অবাঞ্ছনীয় বলে আমার মনে হয়। (সাম্প্রদায়িকতা অর্থাৎ কোনো বিশেষ সাম্প্রদায়িকতা নয়, 'সাম্প্রদায়িকতা'।) এ অভিমত, মনে হয় আরও অনেকেরই। সাম্প্রদায়িকতার যত প্রকার বহিঃপ্রকাশ আমরা এ যাবৎ দেখেছি—তার মধ্যে নানা রকমের বর্বরতাও ধরছি—তাতে আমরা অনেকেই একমত হতে পারব যে সাম্প্রদায়িকতা বহুলাংশে মানবীয় মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির প্রতিকূল : অবশ্য একজন মুসলমান বলবেন, এ মন্তব্য একমাত্র হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কেই প্রযোজ্য ; এবং একজন হিন্দু একই কথা বলবেন মুসলিমসাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে। আত্মসমালোচনায় উভয়েই পরাঙ্মুখ এবং অপর সম্প্রদায়ের সমালোচনায় উভয়েই মুখর। তথাপি উভয়ের সমালোচনার সারাংশ ঐ সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কোথাও পৌঁছায় না।

সাম্প্রদায়িকতা তবু আমরা অনেকেই বর্জন করতে পারিনি ; বর্জন করতে চাইছি না ; এমনকি বারংবার সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যবোধের কথা বলে, এবং সেই স্বাতন্ত্র্যবোধ ব্যতীত আর সব বোধের প্রতি ভ্রূকুটি করে, সাম্প্রদায়িকতাকে আমরা সঞ্জীবিত রাখতে চাইছি প্রায় একটা ধর্মবিশ্বাসের মতো ; বিশেষ করে রাজনীতি ক্ষেত্রে।

ক্ষমতাসীন এবং ক্ষমতাকাঙ্খী রাজনীতিক একে সঞ্জীবিতই রাখতে চাইবেন, এটা বোধগম্য ; কেননা সাম্প্রদায়িকতা অপেক্ষাকৃত একটা সস্তা আবেগ অথচ রাজনীতির খুব কাজে লাগে এটা সুপ্রমাণিত ; এবং কাজে লাগবে আরও কিছুদিন, সমাজের অবস্থা তার অনুকূল আপাততঃ ; তাছাড়া অন্যান্য আবেগ, যথা সংহত

জাতীয়তাবোধের আবেগ রোধেও এর ব্যবহার সম্ভব। সাম্প্রদায়িকতা অতএব, তাঁদের কাছে প্রশস্ত নিরাপদ পথ; এমনকি রাজপথ। কিন্তু যাঁদের মহান কর্তব্য মূল্যবোধকে উঁচু রাখা এবং সমাজের চিন্তাকে পরিচ্ছন্ন রাখা,—সেই লেখক-সম্প্রদায়েরও কেউ কেউ সাম্প্রদায়িকতার এবং বিশুদ্ধ সাম্প্রদায়িকতার চর্চায় উৎসাহী।

সাম্প্রদায়িকতার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অন্যবিধ নিদান-নির্ণয় আমার লক্ষ্য নয়; যে-কারণেই উদ্ভূত হোক, নৈতিকতা সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে এর মূল্যায়নই আমার লক্ষ্য। সাম্প্রদায়িকতাকে ষোলো আনা আমি খারাপও বলছি না; সাম্প্রদায়িক অনুভূতি সেই পর্যন্ত সমর্থনীয় যে-পর্যন্ত তা ভালো অর্থে সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষার ও ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য বিকাশের অনুকূল, যে পর্যন্ত স্ব-সম্প্রদায়ের প্রতি সম্প্রীতির পরিপোষক এবং স্ব-সম্প্রদায়ের মঙ্গল-চিন্তায় অনুপ্রাণিত। অধিকন্তু স্বীকার্য যে সংস্কৃতির কিছু ফসল সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও উৎপন্ন হয়; এবং এই কারণে মুসলিম সংস্কৃতি, খৃষ্টীয় সংস্কৃতি, হিন্দু সংস্কৃতি ইত্যাদি কথাগুলি একেবারে শূন্য গর্ভ নয়; কিন্তু ঐ সংস্কৃতিগুলির দৈশিক রূপও আছে, এবং ঐ দৈশিক রূপই অধিকতর গ্রাহ্য রূপ, যেমন আরবীয় সংস্কৃতি, ইরানী সংস্কৃতি বাঙ্গালী (মুসলিম) সংস্কৃতি ইত্যাদি। আমার এখানে বক্তব্য এই উপমহাদেশের সুপরিচিত সাম্প্রদায়িকতার (সব রকম সাম্প্রদায়িকতার) যে-সব অভিব্যক্তি আমরা এ যাবত দেখেছি তাতে এই ভাবাবেগের লক্ষ্য যতোটা না সম্প্রদায়ের প্রতি সম্প্রীতি, তার চাইতে অনেক বেশী অপর সম্প্রদায়ের প্রতি অপ্রীতি যতোটা না স্নিগ্ধ হৃদয়বৃত্তি, তার চাইতে অনেক বেশী অসূয়াবৃত্তি। বস্তুতঃ অনুভবে ও ক্রিয়ায় সাম্প্রদায়িকতার মূল লক্ষ্য স্ব-সম্প্রদায় নয়, অপর সম্প্রদায়; এই কারণে সাম্প্রদায়ি-কতাবাদী সাধারণতঃ স্ব-সম্প্রদায়ের চিন্তায় ব্রতী নন, অপর-সম্প্রদায়-চেতনায় আবেগে, অবচেতনে, প্রপীড়িত; সেবা-পরায়ণ নন,

অসূয়াপ্রবণ ; স্ব-সম্প্রদায়ের জন্য তিনি ততোটা ক্রিয়াশীল নন, যতোটা অপর সম্প্রদায়ের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল। এই কারণে সাম্প্রদায়িকতার একটা লক্ষণ শুচিবায়ুগ্রস্ততা; চিন্তায় ও আচরণে।

স্বসম্প্রদায়ের হিত যদি হতো সাম্প্রদায়িকতার প্রধান লক্ষ্য সম্প্রদায়ের প্রতি প্রীতি হতো তার প্রধান প্রেরণা, তাহলে এতদিনে স্বর্ণযুগ আসতো ভারতের হিন্দুসমাজে এবং পাকিস্তানের মুসলিম সমাজেও অন্ততঃ স্বাধীনতার আমলে তার কাছাকাছি যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা সম্ভব হয়েছে কি? বরং এটাই কি আমাদের অভিজ্ঞতা নয় যে সাম্প্রদায়িকতাবাদী অনেক সময় তাঁর আহার সংগ্রহ করেন অপর সম্প্রদায়ের শরীর থেকে নয় শুধু, নিজের সম্প্রদায়ের শরীর থেকেও?

শুচিবায়ুগ্রস্ততা, অপ্রীতি, অপর সম্প্রদায়ের শরীর থেকে আহার গ্রহণ ইত্যাদি কয়েকটি প্রবৃত্তির প্রাবল্য ঘটলে বৃহত্তর সম্প্রদায়ের প্রতিবেশী ক্ষুদ্রতর সম্প্রদায় পীড়িত ও বিপন্ন বোধ করে। অন্যান্য কারণ ছাড়াও প্রধাণতঃ এই বোধ থেকে পাকিস্তান দাবী এবং পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা। এ দাবীর বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা সম্ভব এবং ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাও; তথাপি পাকিস্তান দাবী হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার থেকে আত্মরক্ষারই প্রয়াস এবং এই কারণে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

অন্ততঃ আমি ঘটনাটিকে এইভাবে বুঝি। আমরা সাধারণতঃ ভেবে দেখি না যে আমাদের নেতৃবৃন্দ সরব বক্তৃতায় যে কথাই বলে থাকুন, পাকিস্তান আন্দোলনের একটা অন্তর্নিহিত, হয়তো অবচেতন, তাৎপর্য ছিল 'সাম্প্রদায়িকতা'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। কেননা পাকিস্তান আন্দোলনের মহৎ আদর্শবাদীরা নিশ্চয়ই এমন কথা বলবেন না যে এ আন্দোলনের মূল কথাটা ছিলঃ "তোমরা সমগ্র ভারত নিয়ে এমন একটা সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গড়তে চাও যেখানে আমাদের সম্প্রদায় পীড়িত হবে, অতএব আমরা তেমন

রাষ্ট্র গঠনে সম্মত নই ; আমরা স্বতন্ত্রভাবে এমন একটা রাষ্ট্র গড়তে চাই যেখানে আমরা তোমাদের সম্প্রদায়কে নিপীড়ন করতে পারব।”

পাকিস্তান আন্দোলনের অন্তর্নিহিত কথাটা ছিল বরং এই: “তোমরা সমগ্র ভারত নিয়ে এমন একটা সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গড়তে চাও যেখানে আমাদের সম্প্রদায়ের উপর অবিচার হবে এবং এতদিন ধরে যে সাম্প্রদায়িক অশান্তি চলে আসছে তারও সমাধান হবে না, অতএব আমরা তেমন রাষ্ট্র গঠনে সম্মত নই ; আমরা চাই যে হিন্দু ও মুসলিম সংখ্যাগুরু অঞ্চল হিসাবে একাধিক রাষ্ট্র গঠিত হোক, তাহলে কোনো সম্প্রদায়ের উপরই অবিচার হবে না এবং এতদিন ধরে যে সাম্প্রদায়িক সমস্যা জনগণকে ক্ষত-বিক্ষত করে আসছে তারও সমাধান হবে। বস্তুতঃ আমরা এমন রাষ্ট্র গঠন করব যেখানে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য থাকবে না।”

আদর্শবাদকে আদর্শবাদ হতে হলে ঐ নিম্নতম লক্ষ্যটুকু তার থাকা কর্তব্য, কথায় শুধু নয় আচরণেও, যদিও একটা উত্তম আদর্শ-বাদের জন্য ঐ লক্ষ্যটুকুই যথেষ্ট নয়। বস্তুতঃ আজ হয়তো আমরা মনে রাখতে চাইছি না, কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলনের সপক্ষে আমাদের নেতৃবৃন্দ বারংবার বলেছেন (প্রতিপক্ষ আস্থা স্থাপন না করা সত্ত্বেও) যে, ভারত বিভাগই হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। সাম্প্রদায়িকতাকে সঞ্জীবিত রাখলে এবং রাখতে চাইলে সে-সমস্যার সমাধান হয় কি করে?

অবশ্য আমরা যদি রাষ্ট্র গঠনের পর অন্য ধরনের কথা বলি তা'হলে আলাদা কথা। আমরা হয়তো প্রকারান্তরে বলছি: “তোমরা অখণ্ডিত ভারতে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠন করতে, কাজেই আমরা পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠন করেছি।” কিন্তু এ হলো সুবিধাবাদের কথা, আদর্শবাদের নয়। আমরা অবশ্য আদর্শবাদের কথাই বলি, কিন্তু একটি সাম্প্রদায়িকতার পাশে আরেকটি সাম্প্রদা-য়িকতা খাড়া করলে তাকে আদর্শবাদ বলা চলে কিনা তাতে

আমি সন্দিহান। এবং তারপরেও একটা নৈতিক প্রশ্ন থাকে। হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতাকে আমরা ভালো বলি না, আমরা ভারতে হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতার সমালোচনা করি। ওদেশে সাম্প্রদায়িকতা বিলুপ্ত হলে আমরা খুশীই হব। নৈতিক প্রশ্নটা এই, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা যদি ভালো না হয়, তবে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা ভালো হতে পারে কি করে ?

উল্লেখ করেছি পাকিস্তান আন্দোলনের সময় আমাদের নেতৃবৃন্দ বারংবার বলেছিলেন ভারত বিভাগই হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। প্রকারান্তরে এ উক্তির তাৎপর্য কেবল সংঘর্ষ নিরোধ নয়, সংঘর্ষের মূলীভূত হেতু সাম্প্রদায়িকতারও বিলোপ এবং সাম্প্রদায়িকতা বিলোপের কথা বলেছিলেন স্বয়ং জিন্নাহ সাহেব। আমরা নিশ্চয়ই ভুলে যাইনি ১৯৪৭ সালের ১১ই আগষ্ট তারিখে পাকিস্তান গণ-পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর অভিভাষণ দিতে গিয়ে তিনি সেই বিখ্যাত উক্তি করেছিলের: পাকিস্তানে কালক্রমে হিন্দু হিন্দু থাকবে না, এবং মুসলমান মুসলমান থাকবে না, ধর্মীয় অর্থে নয়, রাজনৈতিক অর্থে রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে এবং ধর্ম হবে তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার।

কায়েদে আজমের এ কোনো বিচ্ছিন্ন উক্তি ছিল না, একটা নতুন রাষ্ট্রের যখন সৃষ্টি হতে যাচ্ছে তখন সে রাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারণী ভাষণে তিনি এ উক্তি করেছিলেন। তিনি বস্তুতঃ পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাকে অখণ্ডিত ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন। দীর্ঘকালব্যাপী সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পর পাকিস্তানের যখন প্রতিষ্ঠা হলো তখন সাম্প্রদায়িকতারও অবসান হলো, এই ছিলো তাঁর উক্তির তাৎপর্য। এই কারণে তিনি সাম্প্রদায়িকতাকে বিস্মৃত হতে বলেছিলেন এবং সাম্প্রদায়িকতা যে কল্যাণকর নয় এই শিক্ষা তিনি নিতে বলেছিলেন অখণ্ডিত ভারতের এবং মধ্যযুগীয় বৃটেনের সাম্প্রদায়িক হানাহানির ইতিহাস থেকে।

সাম্প্রদায়িক চেতনা তথা মুসলিম জাতীয়তাবাদের ধারণা পরিহার করে তিনি পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের কথা বলেছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব অবধি বারংবার তিনি এই কথাই বলে গেছেন।

কৌতুকের কথা এই যে কায়েদে আজমের আদর্শ এবং মতবাদের প্রতি যাঁরা শ্রদ্ধাশীল এবং নিবেদিতচিত্ত বলে দাবী করেন তাঁরও তাঁর এই উক্তিটিকে এবং অসাম্প্রদায়িক পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত তাঁর আরও অনেক উক্তিকে চেপে যেতে চান। চেপে যাচ্ছেন রাজনীতি-চিন্তায় ও রাজনৈতিক আচরণে।

এর একটা প্রমাণ সম্প্রদায়ভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠন। রাজনৈতিক দলমাত্রেরই লক্ষ্য রাষ্ট্রের প্রতি কতকগুলি কর্তব্যসাধন, কিন্তু সে-দল যদি জাতীয় চেতনায় অনুপ্রাণিত না হয়, এবং সর্ব-সাধারণের কল্যাণেচ্ছা সে-চেতনায় মিশে না থাকে এবং সর্ব সম্প্রদায়ের প্রতি সম-ব্যবহার তার লক্ষ্য না হয়, তাহলে মহৎ আদর্শের কথা না বলাই ভালো। অবশ্য সাম্প্রদায়িক দল মাত্রেই সার্বজনীন কল্যাণাদর্শের কথা বলে, এ-দেশে এবং ওদেশে। এমনকি কোনো কোনো মুখপাত্র সাম্প্রদায়িকতার এমন চমৎকার দার্শনিক ব্যাখ্যা দেন যে, জাতীয়তাবাদের চাইতে সাম্প্রদায়িকতাবাদকেই অধিকতর মোহনীয় মনে হয় এবং অসাম্প্রদায়িকতার জন্য লজ্জায় অধোবদন হতে হয়। কিন্তু এ সব ব্যাখ্যা প্রসাধনক্রিয়া এবং বহিঃসজ্জা মাত্র, মঞ্চে দর্শকসম্মুখে উপস্থাপনের জন্য। পোশাক বদলালেই প্রকৃতি বদলায় না। মঞ্চের রাজা প্রকৃত রাজা নয়।

জাতীয়তাবাদের অর্থ সমগ্র জাতির কোনো লক্ষ্য সাধনে দেশের সকল লোককে আমন্ত্রণ; সাম্প্রদায়িকতার অর্থ সেই উদ্যম থেকে স্ব-সম্প্রদায় ব্যতীত অপর সম্প্রদায়ের লোককে বহিষ্করণ। অধিকন্তু সাম্প্রদায়িকতাবাদী স্ব-সম্প্রদায় ব্যতীত অপরাপর সম্প্রদায়ের হিত-সাধনের দায়িত্বকে প্রায় সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন (কিছু মৌখিক প্রতি-শ্রুতি ছাড়া) এবং সার্বজনীন হিত-সাধনের প্রয়াস থেকে সেইসব

সম্প্রদায়ের সৃষ্টিশীল উদ্যমকে বিচ্ছিন্ন ও প্রদমিত রাখেন। এটা শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতাবাদীর নিজস্ব সম্প্রদায়ের জন্যও কল্যাণকর হয় না। কেননা সেইসব সম্প্রদায় যে-পরিমাণে নিরুদ্যম থাকে সেই পরিমাণে সেইসব সম্প্রদায়কে শুধু নয়, সাম্প্রদায়িকতাবাদীর নিজস্ব সম্প্রদায়কেও তাদের উদ্যমহীনতার ফলভোগ করতে হয়।

সাম্প্রদায়িকতাবাদী অবশ্য অনেক সময় দাবী করেন সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সম-ব্যবহারই তাঁর লক্ষ্য। কিন্তু দলের মধ্যে অন্য সম্প্রদায়ের লোককে ঢুকতে দেব না, অথচ সর্ব-সম্প্রদায়ের প্রতি সম-ব্যবহার করব, এ একটা অদ্ভুত দাবী।

রাজনীতি নয় শুধু, মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতিও সাম্প্রদায়িকতার জীবাণুতে আক্রান্ত কিয়দংশে। "রুদ্রমঙ্গল"-এ নজরুল ইসলাম বলেছেন, "মানুষের পশু-প্রবৃত্তির সুবিধা লইয়া ধর্ম-মদান্ধদের নাচাইয়া কত কাপুরুষই না আজ মহাপুরুষ হইয়া গেল।" সাম্প্রদায়িক প্রবৃত্তির সুযোগেও এ রকম ব্যাপার অনেক ঘটে। আর কিছু নয়, গরম গরম সাম্প্রদায়িক কথা বলে হাততালি লাভের চেষ্টা দুর্লভ ঘটনা নয় আদৌ। পক্ষান্তরে একজন লোক মানুষ হিসাবে যতোই উঁচু হন তিনি অনেক সময় অপ্রীতিভাজন হন সর্বমানবীয়তার কথা বলে। এর চূড়ান্ত উদাহরণ ভারতে গান্ধীহত্যা এবং গোডসে-বন্দনা এবং ভারতে ও পাকিস্তানে এটা সাধারণ ঘটনা যে একজন ব্যক্তি মানুষ হিসাবে যতোই উঁচু হন, তিনি প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের কটাক্ষ-ইঙ্গনে জর্জরিত হন শুধু এই কারণে যে তিনি যথাক্রমে মুসলমান এবং হিন্দু।

এও আমরা জানি বহু ক্ষেত্রে হিন্দু-রচিত সাহিত্য এবং মুসলিম-রচিত সাহিত্যের প্রতি বৈরাগ্য একই কারণে। অনেক হিন্দু-সমালোচক ও মুসলিম-সমালোচক, হিন্দু-রচিত এবং মুসলিম-রচিত সাহিত্যকে দু'রকম মানদণ্ডে বিচার করেন। বহুকাল যাবৎ হিন্দু-সমাজ তাঁর প্রতিবেশী মুসলমানের সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে

জানবার চেষ্টা করেননি, অথবা প্রসন্ন মনে জানবার চেষ্টা করেননি শুধু এই কারণে যে তা মুসলমানের; এবং বাঙ্গালী মুসলমান অনেক সময় বাংলাভাষা ও বাংলাসাহিত্যের চর্চায় বিমুখ হয়েছেন এই ধারণায় যে এই ভাষা ও সাহিত্য হিন্দুর, অথবা এতে হিন্দুর প্রাধান্য।

অনুভবে ও চিন্তায় সাম্প্রদায়িকতা অনৌদার্য এবং বদ্ধমানসিকতার লক্ষণ। এ হচ্ছে সমষ্টি-চেতনা বিকাশের একটা অপেক্ষাকৃত অপরিণত স্তরবিশেষ। আমি যতটা বুঝি মানব-সমাজের সমষ্টি-চেতনা, বিকাশের এই কয়েকটি প্রধান স্তর: গোত্র-চেতনা বা উপজাতীয় চেতনা, সম্প্রদায়-চেতনা, জাতীয় চেতনা, এবং সর্বমানবীয় চেতনা। পৃথিবীময় সর্বমানবীয় চেতনা এখনো অবিকশিত; রক্তের সূত্রে গোত্র-চেতনা বা উপজাতীয় চেতনা বিলুপ্তিমান— অনুন্নত দেশগুলিতেও; জাতীয় চেতনাই এখন অধি-কাংশ দেশে, এবং সকল উন্নত দেশে, সার্বভৌম—ভাষার ভিত্তিতে অথবা দেশের ভিত্তিতে; ধর্মবিশ্বাসসূত্রে সম্প্রদায়-চেতনা হচ্ছে অধিকতর অপরিণত স্তর এবং সমষ্টি-চেতনা বিকাশের দ্বিতীয় স্তর। সমস্ত সুপরিণত জাতিই যে-স্তর অতিক্রম করে এসেছে অনেকদিন আগে (ইউরোপের দেশগুলি মধ্যযুগে); কিন্তু আমাদের মধ্যে এখনো কেউ কেউ বলেন, এমনকি চিন্তানায়কও বলেন—আমাদের চেতনা আবদ্ধ থাকা উচিত সমষ্টি-চেতনা-বিকাশের চারটি স্তরের অপেক্ষাকৃত অপরিণত ঐ দ্বিতীয় স্তরে।

সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

সাহিত্য কি? আমি মনে করি, যেখানে আনন্দহারা আনন্দ পায়, ব্যথিতের ব্যথা জুড়ায়, হতাশের ভরসা জাগে, তাপিত আরাম পায়, দুঃখী সুখের খবর শোনে, প্রেমিক স্বর্গের সৌরভ শোঁকে, সে-ই সাহিত্য।

সাহিত্যিক বিশ্বমানবের স্বজাতি। কাজেই তিনি অসাম্প্রদায়িক। শেক্‌সপীয়ার ভেনিসের ইহুদি সওদাগর শাইলক ও মুসলমান ওসমান আলীর (Othello) প্রতি কম সহানুভূতি দেখাননি। শরৎচন্দ্র বেচারা গফুর ও লাঠিয়াল আকবর সর্দারের চিত্র কি দরদের সঙ্গে এঁকেছেন! রমনীহৃদয়ের সমস্ত প্রীতি শেখ আব্দুর জন্য উথলে পড়েছে। এই সহ-অনুভূতিই সাহিত্যের প্রাণ।

যেখানে রাজনীতি ছোট বড় তাঁবু গেড়ে তার দোরে সঙ্গীনধারী সান্ত্রী খাড়া ক'রে লিখে দিয়েছে—সাধারণের প্রবেশ নিষেধ, সেখানে সাহিত্য তার আনন্দমেলা খুলে বসেছে। তার গেটে বড় বড় হরফে লেখা আছে—স্বাগত। সেখানে বড় ছোট, আমীর গরীব, বামন চাঁড়াল, হিন্দু-মুসলমান সকলের জন্য অবাধ প্রবেশ। ঝগড়া, বিবাদ, সঙ্কীর্ণতা, ঘৃণা, বিদ্বেষের ঠাঁই সেখানে নেই।

আমার ভাষাতাত্ত্বিক বন্ধু ডক্টর সুনীতিকুমার তাঁর কুমিল্লার অভিভাষণে সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার নিন্দা করেছেন। আমি তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে একমত। কিন্তু যেখানে তিনি সাম্প্রদায়িকতা আবিষ্কার ক'রেছেন, সেখানে আমি সাম্প্রদায়িকতা খুঁজে পাই না। সুনীতি বাবু বলেন, এক শ্রেণীর মুসলমান লেখক হিন্দু-বিদ্বেষের বসে বাংলা ভাষায় দেদার আরবী পারসী শব্দ আমদানী করছে। আরবী পারসী শব্দের আমদানী যদি সাম্প্রদায়িকতা হয়, তবে সাধারণের দুর্বোধ্য অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারকে আমরা কি বলব না মুসলমান-বিদ্বেষের বশে হিন্দুর সাম্প্রদায়িকতা?

প্রথমে দেখুন কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যদেবের প্রতি কাজীর উক্তিতে লিখেছেন—

"গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা।
দেহ সম্বন্ধে হৈতে হয় গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা॥
নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা।"

(চৈতন্য-চরিতামৃত)

কেউ কি বল্‌বেন যে হিন্দু-বিদ্বেষের বসে কবিরাজ মহাশয় মুসলমানী চাচা, নানা শব্দ ব্যবহার করেছেন? আরবী পারসী শব্দের উপযুক্ত ব্যবহার অনেক হিন্দু লেখকই করেছেন। মধ্যযুগের দু'জন প্রসিদ্ধ কবির লেখা থেকে নমুনা দেখাচ্ছি। মুকুন্দরাম কবিকঙ্কন চক্রবর্তী তাঁর চণ্ডীমঙ্গলে লিখেছেন—

"আইসে চড়িয়া তাজি সৈয়দ মোগল কাজী
খয়রাতে বীর দেয় বাড়ী।
পুরের পশ্চিমপটী বোলায় হাসন হাটী
এক সমুদয় গৃহবাড়ী॥
ফজর সময় উঠি বিছায়্যা লোহিত পাটী
পাচ বেরি করয়ে নামাজ।
ছিলি মিলি মালা ধরে, জপে পীর পেগাম্বরে,
পীরের মোকামে দেই সাঁজ॥
দশ বিশ বেরাদরে বসিয়া বিচার করে
অনুদিন কিতাব ও কোরাণ।
সাঁজে ডালা দেই হাটে পীরের শিরণী বাঁটে,
সাঁজে বাজে দগড় নিশান॥
বড়ই দানেশমন্দ কাহাকে না করে ছন্দ,
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।
ধরয়ে কাম্বুজ বেশ, মাথে নাহি রাখে কেশ,

বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি ॥

* * * *

বসিল অনেক মিয়া আপন তরফ লৈয়া,
কেহ নিকা কেহ করে বিয়া।
মোল্লা পড়ায়্যা নিকা দান পায় সিকা সিকা,
দোয়া করে কলমা পড়িয়া ॥
করে ধরি খর ছুরি কুকড়া জবাই করি
দশ গণ্ডা দান পায় কড়ি।
বকরি জবাই বৃথা মোল্লারে দেই মাথা,
দান পায় কড়ি ছয় বুড়ি ॥
যত শিশু মুসলমান তুলিল মক্তব খান,
মকদুম পড়ায় পঠনা।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিল বন্ধ
গুজরাট পুরের বর্ণনা।”

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর তাঁর যুবজনমনোহারী অন্নদামঙ্গলে বাদ্‌শাহ ও মানসিংহের কথাবার্তা প্রসঙ্গে লিখেছেন—

“পাতশা কহেন শুন মানসিংহ রায়।
গজব করিলা তুমি আজব কথায় ॥
লস্করে দু’তিন লাখ আদমী তোমার।
হাতী ঘোড়া উঠ গাধা খচর যে আর ॥
এ সকলে ঝড় বৃষ্টি হৈতে বাঁচাইয়া।
বামন খোরাক দিল অন্নদা পূজিয়া ॥
সয়তান দিল দাগা ভূতের পূজায়।
আলো চাউল বেড়ে কলা ভুলাইয়া খায় ॥
আমারে মালুম খুব হিন্দুর ধরম।

কহি যদি হিন্দুপতি পাইবে সরম ॥
সয়তানে বাজি দিল না পেয়ে কোরাণ।
ঝুটমুট পড়ি মরে আগম পুরাণ ॥
গোঁসাই মর্দ্দের মুখে হাত বুলাইয়া।
আপনার নুর দিলা দাড়ী গোঁপ দিয়া ॥
হেন দাড়ী গোঁপ সাঁই দিল তারে ॥
আর দেখ পাঁঠা পাঁঠী না করি জবাই।
উভ চোটে কাটে বলে খাইল গোসাঁই ॥
হালাল না করি করে নাহক হালাক।
যত কাম করে হিন্দু সকাল নাপাক ॥
ভাতের কি কব পান পানির আয়েব।
কাজী নাহি মানে পেগাম্বরের নায়েব ॥

* * * *

বন্দেগী করিবে বন্দা জমিনে ঝুকিয়া।
করিম দিয়াছে মাথা করম করিয়া ॥
মিছা ফান্দে পড়ে হিন্দু তাহা না বুঝিয়া।
যারে তারে সেবা দেয় ভূমে মাথা দিয়া ॥
যতেক বামন মিছা পুঁথি বানাইয়া।
কাফের করিল লোকে কোফর পড়িয়া ॥
দেবী ব'লে দেয় মিছে ঘড়ায় সিন্দুর।
হায় হায় আখের কি হইবে হিন্দুর ॥
বাঙ্গালীরে কত ভাল পশ্চিমার ঘরে।
পান পানি খানা পিনা আয়েব না করে ॥
দাড়ী রাখে বাঁদী রাখে আর জবে খায়।
কান ফোঁড়ে টিকি রাখে এই মাত্র দায় ॥"

আরবী পারসী শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে দুই জন সাহিত্য-মহারথীর মত উদ্ধৃত করছি। রবীন্দ্রনাথ বলেন "পার্সি আরবি শব্দ চলতি ভাষা বহুল পরিমাণে অসংকোচে হজম করে নিয়েছে। তারা এমন আতিথ্য পেয়েছে যে তারা যে ঘরের নয় সে কথা ভুলেই গেছি। "বিদায়" কথাটা সংস্কৃত সাহিত্যে কোথাও মেলে না। সেটা আরবি ভাসা থেকে এসে দিব্যি সংস্কৃত পোষাক প'রে বসেছে। "হয়রান ক'রে দিয়েছে" বললে ক্লান্তি ও অসহ্যতা মিশিয়ে যে ভাবটা মনে আস, কোনো সংস্কৃতের আমদানি শব্দে তা হয় না। অমুকের কণ্ঠে গানে "দরদ" লাগে না, বললে ঠিক কথাটা বলা হয়, ও ছাড়া আর কোনো কথাই নেই। গুরু চণ্ডালির শাসনকর্ত্তা যদি দরদের বদলে সংবেদনা চালাবার হুকুম করেন, তবে সে হুকুম অমান্য ক'রলে অপরাধ হবে না।" (বাংলা ভাষা পরিচয়, ৫২, ৫৩ পৃঃ)

দীনেশ বাবু বলেন, "বর্তমান কালে গোঁড়া হিন্দুরা দিবা রাত্র যে সকল উর্দ্দু কি ফারসী শব্দ জিহ্বাগ্রে ব্যবহার করিয়া থাকেন, লেখনী মুখে তাহা বদলাইয়া তৎস্থলে সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করেন, এইরূপে "হজম" স্থলে "পরিপাক" বা "জীর্ণ"। "খাজনা" স্থলে "রাজস্ব" "ইজ্জৎ" স্থলে "সম্মান" "কবর" স্থলে "সমাধি," "কবুল" স্থলে "স্বীকার," "আমদানি" স্থলে "আনয়ন" বা "সংগ্রহ করিয়া আনা," "খেসারৎ" স্থলে "ক্ষতিপূরণ," "জামিন" স্থলে "পদ-প্রতিষ্ঠা" ইত্যাদি কথার প্রয়োগ করেন। একটু কাগজ লইয়া টুকিয়া দেখিবেন, বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ বিদেশী শব্দ কত প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে আমাদের ভাষার জাতি যায় নাই। পরের জিনিষ আত্মসাৎ করিবার শক্তি সতেজ জীবনের লক্ষণ। শব্দগুলি বাদ সাদ দিয়া ভাষা শুদ্ধ করিয়া ইহাকে তুলসী-তলা করিয়া রাখিলে হিন্দু মুসলমানের উভয়ের মাতৃভাষাকে

আমরা খণ্ডিত ও দুর্বল করিয়া ফেলিব।" (প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান, ৯৮ পৃঃ)

মোট কথা বাংলা ভাষায় জবরদস্তি ক'রে যেমন অপ্রচলিত অনাবশ্যক আরবী পারসী শব্দের ব্যবহার অসঙ্গত, তেমনি অপ্রচলিত অনাবশ্যক সংস্কৃত ব্যবহার করাও অসঙ্গত। বে-দরকারে ইংরেজীর মিশ্রচার করাও তেমনি আমার অসহ্য। আমি এসব নিন্দা করি; কিন্তু যা বাংলায় এসে গেছে, যা বাংলার হাড়ে মাসে ঢুকে গেছে, তা আরবী, পারসী, তুর্কি, পর্তুগীজ, ডচ, ফরাসী, ইংরেজী, আর্য্য, বা অনার্য্য যা হোক, তাতে আমি আপত্তি করি না। আমি বাংলা ভাষাকেই চাই, তাকে শুদ্ধি বা খতনা করবার পক্ষপাতী নই।

সে যাই হোক, সাহিত্য সাম্প্রদায়িকতা বলতে আমি বুঝি সাহিত্যের ভিতর দিয়ে অন্য সম্প্রদায় বা ধর্ম বিশেষের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা চালান, কোনও জাতির ঐতিহাসিক চরিত্রকে বা কোনও ধর্মাবলম্বীর সম্মানিত পুরুষদের হীন বিকৃত করা। দেশের সাম্প্রদায়িক বিবাদের মূলে এই সাম্প্রদায়িক সাহিত্য। দুঃখের সঙ্গে আমি বলতে বাধ্য যে বাংলার হিন্দু লেখকেরা এর সূত্রপাত করেন। তারপর মুসলমান লেখকেরা গালির বদলে গালি শুরু করেন। এর জন্য অবশ্য ব্রিটিশের ভেদনীতি ছিল আনেকটা দায়ী। আমরা পূর্বপাকিস্তানে সাম্প্রদায়িকতা-বিষবর্জিত "পাক সাফ" সাহিত্য চাই—দেশের মঙ্গলের জন্য, দশের মঙ্গলের জন্য। সাহিত্য যদি সত্য ও শিব হয়, তবে তা সুন্দর হবেই। নয়ত সে সাহিত্যই হবে না, হবে একটা অপসাহিত্য। আমরা যদি বাংলা ভাষা থেকে এই অপসাহিত্য দূর করতে পারি, তবে প্রকৃত সাহিত্যের সেবা হবে, সত্য-শিব- সুন্দরের অর্চনা হবে, পাকিস্তানের মঙ্গল হবে।

লেখক পরিচিতি

বর্তমান প্রবন্ধ সংগ্রহে পূর্বপাকিস্তানের লেখকবৃন্দের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন ছিল। অনেক চেষ্টা করেও আমরা সকলের পূর্ণ পরিচয় সংগ্রহ করতে পারিনি। যে কয়েকজনের বিষয় কিছু তথ্য পেয়েছি তা এখানে দেওয়া হল। পরবর্তী সংস্করণে পরিচয় পত্র সম্পূর্ণ করা যাবে আশা করি।

মুহম্মদ আব্দুল হাই :

জন্ম ঃ মরিচা মুর্শিদাবাদ ২৬, ১১, ১৯১৯ ইং

মৃত্যু ঃ ঢাকা, ট্রেন দুর্ঘটনায় জুন মাসে ১৯৫২ ইং

কৃতী ছাত্র হিসাবে মুহম্মদ আব্দুল হাই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা অর্নাস ও এম এ তে সর্ব প্রথম তিনিই প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ভাষা ও ধ্বনি তত্ত্বে ডিষ্টিংটন সহ এম এ পাশ করেন (১৯৫২)।

কর্মজীবন ১৯৪৩ থেকে সুরু হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগ দেন ও শেষে বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ হন।

বাংলা ভাষা ও ধ্বনি তত্ত্বের গবেষণার সূত্রপাত বর্তমান শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথ সুরু করেন তারপর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় সুকুমার সেন এবং মহম্মদ শহীদুল্লাহ এ বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা করেছেন। কিন্তু বাংলা ধ্বনি তত্ত্ব নিয়ে অধ্যাপক মুহম্মদ হাই যে গবেষণা করেছেন তা মৌলিক এবং ব্যাপক। বাংলা ভাষার ধ্বনি প্রবাহের অন্তর্নিহিত নিয়ম শৃঙ্খলাকে আবিষ্কার ও তাকে সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞাবদ্ধ করার কৃতিত্ব অনেকাংশে ওঁরই প্রাপ্য। সাহিত্য ক্ষেত্রে অধ্যাপক হাই প্রধাণত ধ্বনিতত্ত্ববিদ্, সমালোচক ও প্রবন্ধকার

হিসেবে পরিচিত। মুহম্মদ হাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'সাহিত্য পত্র' নামে পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন। এই পত্রিকার এক একটি সংখ্যা এক একটি গবেষণা গ্রন্থ হিসাবে গণ্য হবার যোগ্য। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে এ ধরণের পত্রিকার পশ্চিম-বাংলায় কোনো তুলনা নাই। ইংরেজি ও বাংলায় নানা বিষয়ে রচিত তার গ্রন্থগুলির কয়েকটির নাম এখানে উল্লেখ করা গেল :—

বাংলা—ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (গদ্যাংশ) বিলাতে সাড়ে সাতশ দিন, তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা, ভাষা ও সাহিত্য। ধ্বনি বিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ব।

ইংরাজি :—A phonetic and phonological Study of Nasals and Nasalisation in Bengali, The Sound Structures of English and Bengali, Trditional Culturers in East Pakistan.

বদরুদ্দিন ওমরঃ—

বিভাগপূর্ব বঙ্গীয় মুসলীম লীগের সেক্রেটারী বর্তমান পূর্বপাকিস্তান মুসলিম একাডেমির ডিরেকটর মিঃ আবুল হাসেম ও অবিভক্ত বাংলার বর্দ্ধমান জেলার বিখ্যাত মুসলিম জননেতা স্বর্গত আবুল কাশেম সাহেবের দৌহিত্র। বৎসরাধিক কাল পূর্ব পর্যন্ত তিনি রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের একজন অধ্যাপকের পদ অলংকৃত করেছিলেন। সে পদে কোন অজ্ঞাত কারণ বশত ইস্তফা দিতে বাধ্য হন। সম্প্রতি তাঁর বিখ্যাত বই 'সংস্কৃতির সংকট ও এর-ই অনুপূরক একখানি গ্রন্থ পূর্বপাকিস্তান সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। পূর্ব পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সংস্কৃতিবান ব্যক্তিরা এই বাজেয়াপ্তর বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ করেন।

লেখক পরিচিতি

আবুল ফজল :

জন্মঃ কেঁওচিয়া, চট্টগ্রাম ; ১. ৭. ১৯০৩ ইং

শিক্ষাঃ বি. এ. (১৯২৮), বি. টি. (১৯৩০)—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এম. এ (১৯৪০), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

কর্মজীবন: ইস্কুল ও মাদ্রাসায় শিক্ষকতা (১৯২৯ থেকে)। বাংলার অধ্যাপক কৃষ্ণনগর কলেজ (১৯৪১-৪৩) চট্টগ্রাম কলেজ (১৯৪৩-৫৮)।

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে আবুল ফজল যে-উদার চিন্তা অংগীকার করেছিলেন—তাঁর সমগ্র সাহিত্য কর্মে তার বিচিত্র রূপায়ন ঘটেছে। বাঙালি মুসলমানের অতীতমুখী গতানুগতিক চিন্তধারায় সংঘবদ্ধ ভাবে প্রথম বারের মতো আঘাত হানলেন ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজ তথা 'শিখা গোষ্ঠী'। 'জ্ঞানের দিগন্তকে প্রসারিত করা বুদ্ধি ও যুক্তির নির্দেশ কে প্রতিষ্ঠা করা এবং ধর্মভীরুতার বদলে মনুষ্যত্ব বোধকে লালন করা ছিল এই সমাজের লক্ষ্য।' মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রতিষ্ঠার সময় আবুল ফজল ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। পরে তিনি সমাজের সক্রিয় সদস্য হয়েছিলেন। অন্ধ বিশ্বাস নয়, যুক্তিতর্ক সাপেক্ষ জীবনবোধ এঁদের আদর্শ ছিল। আবুল ফজলের সাহিত্য সাধনার পশ্চাতে এ বলিষ্ঠ বিশ্বাস ও জীবন্ত অনুভূতিই ক্রিয়া করেছে।"

নিজের সাহিত্য জীবনের লক্ষ্য ও স্বরূপ সম্বন্ধে লেখক বলেছেন, 'আমাদের সমাজের ও দেশের শ্রীহীন চেহারাটা একদিন আমার যৌবনকে কাঁদিয়ে ছিল। তাই হয়ত সেদিন কলম নিয়ে বসে পড়েছিলাম। ইচ্ছে ছিল খোঁচায় খোঁচায় সমাজ-মনকে জাগ্রত করে তুলব।" লেখকের সমাজ সচেতনতার সঙ্গে শৈল্পিক বোধ মিলে পরিণত কালের রচনা গুলো শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে পাংক্তেয় হয়েছে।

লেখক ১৯৪০ সালে ওঁর রচিত 'চৌচির' 'মাটির পৃথিবী' ও

বিচিত্রকথা' নামক তিনখানা বই রবীন্দ্র নাথের কাছে পাঠান। বই পড়ে রবীন্দ্র নাথ রোগ-শয্যা থেকে এক দীর্ঘ পত্রে লেখেন 'আপনার চৌচির গল্পটি আমার দৃষ্টিকে ক্লিষ্ট করে পড়েছি। আমার পক্ষে এ গল্প ঔৎসুক্য জনক। আধুনিক মুসলমান সমাজের সমস্যা এ সমাজের অন্তরের দিক থেকে জানতে হলে সাহিত্যের পথ দিয়েই জানতে হবে—এই প্রয়োজন আমি বিশেষ ভাবে অনুভব করি। আপনাদের মতো লেখকের হাত থেকে এই অভাব যথেষ্ট রূপে পূর্ণ হতে থাকবে আশা করে রইলুম।' রবীন্দ্রনাথের আশা ব্যর্থ হয়নি। আবুল ফজলের মধ্যে আমরা যথার্থ বড়ো সাহিত্যিককে পেয়েছি যাঁর দৃষ্টি প্রশস্ত ও স্বচ্ছ, প্রকাশ ক্ষমতাও সুন্দর এবং রচনা শৈলী ঋজু ও আকর্ষণীয়।

'রাঙা প্রভাত' উপন্যাসটির জন্য লেখক রাষ্ট্রীয় পুরস্কার (প্রেসী-ডেন্ট অ্যাওয়ার্ড) পেয়েছেন কয়েক বছর আগে। ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি বাংলা একাডেমীর পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৬১—৬২ সালে।

প্রকাশনাঃ চৌচির; জীবন পথের যাত্রী; রাঙা প্রভাত; কায়েদে আজম; একটি সকাল; আলোক লতা; মাটির পৃথিবী; বিচিত্র কথা; সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবন; সপ্তপর্ণা; রেখাচিত্র ইত্যাদি।

রেখাচিত্র আত্ম জীবনী মূলক গ্রন্থ; তার মধ্যে লেখকের বিস্তারিত জীবন কথা লভ্য।

আসাদ চৌধুরী—তরুণ লেখক। ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার কলেজে অধ্যপনা করেন। সাময়িক পত্র পত্রিকায় লেখেন।

(ক) ডক্টর আহমেদ শরিফ:

চট্টগ্রামের স্বর্গত আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদের ভ্রাতুষ্পুত্র

লেখক পরিচিতি

বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যপনা কাজে রত আছেন। বিভিন্ন পত্র পত্রিকার লেখক, সম্প্রতি 'বিচিত চিন্ত নামক একখানি প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। মৌলিক চিন্তাধারার জন্য প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর সাহিত্য সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা পূর্ব পাকিস্থানে সুধী মহলে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে।

মুখলেসুর রহমান—অধ্যক্ষ বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি মিউজিয়াম রাজশাহী

ডঃ সারওয়ার মুর্শিদ :

ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইংরেজি বিভাগের প্রধান। বাড়ি কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবেড়িয়ায়। তাঁর পিতা মিঃ আলি আহাম্মদ খান একজন প্রধান রাজনীতিবিদ। মুর্শিদ সাহেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করে তিনি 'নিউ ভ্যালুজ' নামক একখানি সংস্কৃতি মূলক ত্রৈমাসিক পত্রিকা সম্পাদন করেন।

(১) জিল্লুর রহমান সিদ্দিক :—

সুকবি ও সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ বর্তমানে রাজসাহী বিশ্ববিদ্যা-লয়ের ইংরাজি বিভাগের প্রধানের পদ অলংকৃত করছেন। অক্স-ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে B. A (Hons) পাস করেন। তিনি বলিষ্ঠ চিন্তাধারার অধিকারী—।

কাজী মোতাহার হোসেন :—

জন্ম পাংশা ফরিদপুর ১৮৯৭ ইং

এম. এ. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ; পি. এইচ. ডি. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। কর্মজীবনে তিনি ১৯২১ সাল থেকে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। বর্তমানে ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিট্যুটের অধিকর্তা।

কাজী মোতাহার হোসেন বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও ওঁর খ্যাতি সাহিত্যিক হিসাবেই। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের প্রারম্ভে ঢাকাতে প্রাগ্রসর মুসলিম যুবকরা মিলে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এই প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্র 'শিখা পত্রিকাকে' কেন্দ্র করে যে আন্দোলন এঁরা পরিচালনা করেন তাঁর নাম ওঁরা দিয়েছিলেন 'বুদ্ধির মুক্তি' ; সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থেকে মনকে মুক্ত করে তাকে ঔদার্য ও মানবিকতায় পূর্ণ করাই ছিল ওঁদের সাধনা। এই সাধনায় সমধর্মী ছিলেন কাজী আব্দুল ওদুদ, আবুল ফজল, আবুল হোসেন, মোতাহার হোসেন চৌধুরী প্রভৃতি।

আকাদেমি প্রকাশিত ওঁর গণিত শাস্ত্রের ইতিহাস একটি উল্লেখ যোগ্য গ্রন্থ। সঙ্গীত সাহিত্য ও বিজ্ঞান এই সমস্ত বিষয়েই তিনি দক্ষতার সঙ্গে প্রবন্ধ লেখেন। স্বদেশে ও বিদেশে সুধীজনের নিকট উচ্চ প্রশংসা লাভ করেন।

মুহম্মদ হবিবুল্লাহ—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐস্লামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যক্ষ। ইতিহাস বিষয়ে ইনি একাধিক মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন।

মহম্মদ শহীদুল্লাহ :—

জন্ম ঃ পেয়ারা, ২৪ পরগণা ; ১০, ৭. ১৮৮৫ ইং। মৃত্যু ঃ ১৯২১ ইং। শিক্ষা জীবনে আশ্চর্য্য প্রতিভার অধিকারী মহম্মদ শহীদুল্লাহ। তখনকার দিনের একজন মুসলমানের পক্ষে যা অস্বাভাবিক, শহী-দুল্লাহ সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃতে অর্নাস নিয়ে বি, এ পাশ করেন।

কিন্তু হিন্দু পণ্ডিতগণ নাকি তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়াতে অস্বীকার করেন। তাই তিনি ভাষাতত্ত্বে এম. এ. পড়েন (১৯১২)। তারপর প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি, লিট ও ধ্বনিতত্ত্বে ডিপ্লোমা লাভ করেন। তাছাড়া কঠোর সাধনা বলে শিখেছেন দেশ বিদেশের অনেক ভাষা।

বাংলার মুসলমানদের কাছে ওঁর নাম রূপকথার মতো। তিনি যে যুগে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা বিপুল অধ্যবসায় নিয়ে চর্চা করেছেন ও স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন তখন বাঙ্গালী মুসলমানগণ এদিকে মোটে পা বাড়ায়নি। আজ বহু মুসলমান গুণী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছেন এবং তাকে অংলকৃত করেছেন, কিন্তু পথিকৃৎ হিসাবে শহীদুল্লাহ সাহেবের যে-কৃতিত্ব তা অনতিক্রম্য ও অবিস্মরণীয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রথমে অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি শতাব্দীর এক পাদের চেয়ে বেশি সময় কাজ করেছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ রূপেও তিনি কাজ করেছেন।

মহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রধানত পণ্ডিত। পাক ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাতত্ত্ববিদ্ তিনি। তবু নানা গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে তিনি সাহিত্য সাধনাও করেছেন। ওমর খৈয়াম ও বিদ্যাপতির অনুবাদে তাঁর এই কবি মনের পরিচয় সুস্পষ্ট। প্রকাশনা: বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত (ভাষাতত্ত্ব); ভাষা ও সাহিত্য (প্রবন্ধ); বাংলা সাহিত্যের কথা, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (সাহিত্যের ইতিহাস); পদ্মাবতী; বিদ্যাপতি শতক (সম্পাদনা); ওমর খৈয়ম অনুবাদ।